বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন ও বাংলাদেশের গ্রাম

নজরুল ইসলাম

Pathak Shamabesh
Since 1987
Bangabandhur Swapna
4851002
Tk. 250.00
9 789849 238386

বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন ও বাংলাদেশের গ্রাম

নজরুল ইসলাম

EASTERN ACADEMIC

বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন ও বাংলাদেশের গ্রাম

নজরুল ইসলাম



Northern University * Bangladesh *
NUB Library

বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন
ও
বাংলাদেশের অগ্রগতি

নজরুল ইসলাম

EASTERN
ACADEMIC

88-02-9669555
পাঠক সমাবেশ কেন্দ্র
Dhaka Bangladesh
Establish 2014
pathak@bol-online.com

EASTERN
ACADEMIC

বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন ও বাংলাদেশের গ্রাম

গ্রন্থস্বত্ব © নজরুল ইসলাম

প্রথম প্রকাশ ২০১৭

প্রকাশক: ইস্টার্ন একাডেমিক
(জ্ঞানচর্চা ও বিস্তৃতির লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত অবাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান
ইস্টার্ন একাডেমিক সেন্টারের একটি প্রকাশনা উদ্যোগ)
এইচ- ৮৪/৯ নতুন বিমানবন্দর সড়ক
বনানী, কাকলি, ঢাকা ১২১৩, বাংলাদেশ
ই-মেইল: *eastern.academic@gmail.com*

পরিবেশক: *দ্যু প্রকাশনী*
১৫ কনকর্ড এমপোরিয়াম শপিং কমপ্লেক্স (নীচতলা)
ড. কুদরত-এ-খুদা সড়ক, কাঁটাবন, ঢাকা ১২০৫
টেলিফোন: ৯৬১২৭৮৩, ০১৬১১-০৩৩৩৯৩
ই-মেইল: *dyupub@gmail.com*
ফেইসবুক: *fb.com/dyupub*

প্রচ্ছদ: মোস্তাফিজ কারিগর

মুদ্রক: মাটি-আর-মানুষ, ১১০ ফকিরাপুল, ঢাকা ১০০০

মূল্য: ৳ ২৫০
US$ 25

এই গ্রন্থের অংশবিশেষ জ্ঞান প্রচারের অ-বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে, এবং লেখক, প্রকাশক, এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক স্বত্বাধিকারীর প্রতি যথযথ স্বীকৃতি প্রদান সাপেক্ষে, অনুলিপিকৃত এবং প্রচারিত হতে পারে। কিন্তু বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে এই গ্রন্থের কোনো অংশের অনুলিপিকরণ নিষিদ্ধ।

ISBN: 978-984-92383-8-6

NUB LIBRARY
ACCESSION NO. 9848276
ACCESSION DATE
PROGRAM, CAMPUS

উৎসর্গ

জাতির জনক
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের
স্মৃতির প্রতি

সূচিপত্র

মুখবন্ধ	ix
১. ভূমিকা	১
২. ১৯৭৫ সনে বঙ্গবন্ধুর সমবায়ী গ্রামের ঘোষণা	৭
৩. বঙ্গবন্ধু এবং সমাজতন্ত্র	৯
৪. বঙ্গবন্ধুর সমবায়ী গ্রাম ঘোষণার আন্তর্জাতিক প্রেক্ষিত	১৫
৫. বাংলাদেশের কৃষক প্রশ্নের ইতিহাস	১৮
৫.১ বৃটিশ আমল	১৮
৫.২ পাকিস্তান আমল	২৩
৫.৩ স্বাধীনতার পর – বঙ্গবন্ধু আমল	২৪
৬. ভূমি সংস্কারের পক্ষে যুক্তিসমূহ	২৭
৭. ভূমি সংস্কারের পথে জমি-স্বল্পতার সমস্যা	৩০
৭.১ স্বল্প-পরিধিতে জমির পুনর্বিতরণ	৩২
৭.২স্বল্প-পরিধিতে যৌথচাষ	৩৩
৭.৩ গ্রামের পরিধিতে যৌথচাষ	৩৫
৮. ভূমি সংস্কারের রাজনৈতিক সমস্যা	৩৭
৯. বঙ্গবন্ধুর সমবায় প্রস্তাব এবং রাজনৈতিক আপোষ	৪১
৯.১ সমবায় প্রস্তাবের মধ্যে আপোষ	৪১
৯.২ আপোষের বৃহত্তর যৌক্তিকতা	৪২
১০. পরিবর্তিত আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি	৪৪
১০.১ চীনের অভিজ্ঞতা	৪৫
১০.২ ভিয়েতনামের অভিজ্ঞতা	৪৭
১০.৩ প্রাক্তন সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রসমূহ এবং পূর্ব-ইউরোপের অভিজ্ঞতা	৪৮
১১. পরিবর্তিত জাতীয় পরিস্থিতি	৫০
১১.১ সাধারণ রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক পরিবর্তন	৫১
১১.২ ভূমি মালিকানা পরিস্থিতি	৫২
১১.৩ পুনর্বিতরণমূলক ভূমি সংস্কারের অব্যাহত প্রয়োজনীয়তা এবং প্রতিবন্ধকতা	৫৩
১১.৪ বর্গার রূপের পরিবর্তন – ভাগচাষ থেকে চুক্তি প্রথা	৫৪
১২. সমবায়ী গ্রামের অব্যাহত প্রয়োজনীয়তা	৫৭
১২.১ নিয়োজন এবং বিনিয়োগ বৃদ্ধি	৫৭
১২.২ নদ-নদী এবং জলাশয়সমূহের সংস্কার ও উন্নয়ন	৫৯
১২.৩ নদ-নদী পরিচর্যা এবং আন্তগ্রাম সহযোগিতা	৬০

১২.৪ সমবায়ী গ্রাম এবং বিকল্প নদী কৌশল ৬১
১২.৫ জলবায়ু পরিবর্তন এবং সমবায়ী গ্রাম ৬৪
১২.৬ নিয়োজন এবং বিনিয়োগের অন্যান্য ধারা ৬৭
১২.৭ আন্তখাত সংযোগ, শিল্প, এবং বৃহত্তর গ্রামীণ অর্থনীতি ৬৭
১২.৮ জনসংখ্যা উত্তরণ ৬৮
১২.৯ গ্রামের স্বস্থান ভিত্তিক নগরায়ন ৬৯
১২.১০ সমবায়ী গ্রামের অন্যান্য সম্ভাবনা ৭১
১৩. সমবায়ী গ্রাম ও স্বেচ্ছামূলক ভূমি সংস্কার ৭১
১৪. সমবায়ী গ্রাম ও গ্রাম তহবিল ৭৫
১৫. সমবায়ী গ্রাম কর্মসূচি বাস্তবায়নের বিভিন্ন ইস্যু ৭৮
১৫.১ অভ্যন্তরীণ সক্ষমতা ৭৮
১৫.২ পর্যায়ক্রমতা ৮০
১৫.৩ বৈচিত্রের স্বীকৃতি ৮০
১৬. "গ্রাম পরিষদ" গঠন – সমবায়ী গ্রামের লক্ষ্যে প্রথম পদক্ষেপ ৮১
১৬.১ প্রাক ঔপনিবেশিক আমল ৮২
১৬.২ বৃটিশ আমল ৮৩
১৬.৩ পাকিস্তান আমল ৮৭
১৬.৪ বঙ্গবন্ধু আমল ৮৮
১৬.৫ জিয়াউর রহমান আমল ৮৯
১৬.৬ এরশাদ আমল ৯০
১৬.৭ খালেদা জিয়া সরকার (১৯৯১-১৯৯৫) ৯০
১৬.৮ শেখ হাসিনা সরকার (১৯৯৬-২০০০) ৯১
১৬.৯ খালেদা জিয়া সরকার (২০০১-২০০৬) ৯১
১৬.১০ ১/১১ সরকার (২০০৭-২০০৮) ৯২
১৬.১১ শেখ হাসিনা সরকার (২০০৯-বর্তমান) ৯২
১৬.১২ গ্রাম পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো বিষয়ক বিভিন্ন প্রস্তাবের তুলনা ৯২
১৭. গ্রামের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো সম্পর্কে অন্যান্য দেশের অভিজ্ঞতা ১০০
১৭.১ ভারত ১০০
১৭.২ চীন ১০৩
১৮. সমবায়ী গ্রামের রাজনৈতিক সম্ভাব্যতা ১১০
১৯. উপসংহার ১১৪
পরিশিষ্ট-১ : স্বনির্ভর সরকার বিধিমালা, ১৯৮০ ১১৯
পরিশিষ্ট-২ : স্থানীয় সরকার (গ্রাম পরিষদ) আইন, ১৯৯৭ ১৩৭
পরিশিষ্ট-৩ : গ্রাম সরকার আইন, ২০০৩ ১৪৩
টীকা ১৫৫
তথ্যসূত্র ১৬৫

মুখবন্ধ

নগরায়ণের সাম্প্রতিক বৃদ্ধি সত্ত্বেও বাংলাদেশের জনগোষ্ঠীর মূল অংশ এখনও গ্রামেই বসবাস করেন। যারা শহুরে হয়েছেন, তাদেরও অনেকের নাড়ির টান গ্রামেই রয়ে গেছে। সে কারণে ঈদের সময় এখনও রাজধানী ঢাকা শহর ফাঁকা হয়ে যায়! গ্রামের জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন না এনে বাংলাদেশের সামগ্রিক উন্নয়ন অর্জন কঠিন। সুতরাং, গ্রামের প্রশ্ন এখনও জাতীয় মনোযোগের দাবি করে।

এই প্রেক্ষিতে দুঃখজনক যে, গ্রাম পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়ার বিষয়টি এখন অনেকটা চাপা পড়ে গেছে। সাম্প্রতিককালে ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, এবং জেলা পরিষদের নির্বাচন হয়েছে এবং হচ্ছে; কিন্তু স্থানীয় সরকার কাঠামোকে গ্রাম পর্যন্ত প্রসারিত করার আর কোনো উদ্যোগ পরিলক্ষিত হচ্ছে না।

অথচ, ঐতিহাসিকভাবে অর্থনৈতিক স্বয়ংসম্পূর্ণতা এবং ব্যবস্থাপনাগত স্বশাসন ভারতীয় উপমহাদেশের, এবং সে সুবাদে বাংলাদেশের, গ্রামের মৌলিক বৈশিষ্ট ছিল। এই স্বশাসন পরিচালনার জন্য গ্রাম পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো বিরাজ করতো। লৌহযুগের অর্থনৈতিক স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের আগেও – তথা বৈদিক আমল থেকেই – এই উপমহাদেশের সমাজ গ্রামের ভিত্তিতে সংগঠিত ছিল, এবং গ্রাম পর্যায়ের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো (গ্রাম সভা, গ্রাম পঞ্চায়েত, ইত্যাদি যে নামেই হোক না কেন) এই সমাজের প্রাতিষ্ঠানিক গঠনের মৌল উপাদান হিসেবে কাজ করেছে। গ্রামের অভ্যন্তরের বিষয়াবলীর দেখাশোনা এবং বহিস্থ প্রতিষ্ঠানাদির – বিশেষত উর্ধতন রাজনৈতিক বা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার প্রতিভূদের – সাথে গ্রামের সদস্যদের লেনদেন এই প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর মধ্যস্থভূমিকার মাধ্যমেই সম্পাদিত হতো।

দুর্ভাগ্যজনকভাবে, চিরস্থায়ী (জমিদারি) বন্দোবস্তের মাধ্যমে বৃটিশরা বাংলায় বুর্জোয়া জমি মালিকানা প্রতিষ্ঠার যে উদ্যোগ গ্রহণ করে তার ফলে গ্রাম পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর এই ঐতিহাসিক ও ঐতিহ্যপূর্ণ ভূমিকা অস্বীকৃত হয়। সেই থেকে বাংলাদেশে গ্রাম পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর অবক্ষয় শুরু হয়। পরবর্তীতে বৃটিশেরা "ইউনিয়ন" নামে এক নতুন ভৌগোলিক-সামাজিক এককের সূচনা করে। এক পর্যায়ে গ্রামগুলো ইউনিয়নের ওয়ার্ড হিসেবে গণ্য হয়। এর ফলে সমাজের একক হিসেবে গ্রামের চিরায়ত মৌল ভূমিকার প্রতি যে উপেক্ষা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে সূচিত হয়েছিল, তা যেন পাকাপোক্ত হয়।

এরূপ পটভূমিতেই ১৯৭৫ সনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রতি গ্রামে সকলকে অন্তর্ভুক্ত করে সমবায় গঠনের কর্মসূচি ঘোষণা করেন এবং তার মাধ্যমে গ্রাম পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়ার করণীয়র প্রতি দৃষ্টি ফিরিয়ে আনেন। তিনি "ইউনিয়ন পরিষদের টাউটদের বিদায় করার" কথা বলেন এবং সকল প্রাসংগিক রাষ্ট্রীয় সম্পদ সমবায়ী গ্রামের মাধ্যমে পরিচালনার ঘোষণা দেন। এক কথায়, তিনি গ্রামকেই বাংলাদেশের সমাজের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর মৌল উপাদান হিসেবে পুনর্প্রতিষ্ঠিত করতে সচেষ্ট হন।

বঙ্গবন্ধু অবশ্য আরও এগিয়ে যান। তিনি জমি মালিকানা অক্ষুণ্ন রেখেই গ্রামের সকল জমির যৌথচাষের প্রস্তাব করেন। তিনি উৎপাদিত ফসল তিন অংশে ভাগের প্রস্তাব করেন। একভাগ জমি মালিকানার ভিত্তিতে বিতরণের জন্য; একভাগ শ্রমের ভিত্তিতে বিতরণের জন্য; আর একভাগ "গ্রাম তহবিলে"র জন্য। এভাবে তিনি গ্রামের সমষ্টিগত কার্যাবলীর জন্য গ্রামের অভ্যন্তর থেকেই সম্পদ আহরণের একটি পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন। লক্ষ্যণীয়, উপরিল্লিখিত উপায়ে গ্রাম তহবিল গঠনের ফলে জমি মালিকানা অক্ষুণ্ন থাকা সত্ত্বেও গ্রামের জমি ও অন্যান্য বস্তুগত সম্পদের সাথে গ্রামের শ্রমজীবিদের একটি সম্পৃক্তি প্রতিষ্ঠিত হয়, যা এই উভয় ধরণের সম্পদের আরও উত্তম ব্যবহার অর্জনের মাধ্যমে গ্রামের এবং গোটা দেশের উন্নয়নের জন্য সবিশেষ ইতিবাচক ভূমিকা পালন করতে পারে।

দুর্ভাগ্যজনক যে, ১৯৭৫ সনের ১৫ই আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা ও ক্ষমতার পরিবর্তনের ফলে গ্রাম সংক্রান্ত বঙ্গবন্ধুর কর্মসূচি আর অগ্রসর হতে পারে না। তবে, জিয়াউর রহমান সরকারের আমলেও গ্রাম ভিত্তিক প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো প্রতিষ্ঠার একটি উদ্যোগ নেয়া হয়। সে উদ্দেশ্যে ১৯৮০ সনে "স্বনির্ভর গ্রাম সরকার" বিধিমালা জারী হয়, এবং তার অধীনে "গ্রাম সরকার" গঠিত হয়। একই সনে রাজধানী ঢাকা শহরে নবগঠিত গ্রাম সরকারের সদস্যদের এক মহা-সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু ১৯৮১ সনে জিয়াউর রহমানকে হত্যার পর ১৯৮২ সনে ক্ষমতা গ্রহণ করে এরশাদ সরকার স্বনির্ভর গ্রাম সরকার বাতিল করে দেয়। তারপরও বিভিন্ন সরকারের আমলে গ্রাম পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গঠনের কিছু উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। যেমন ১৯৯৭ সনে শেখ হাসিনা সরকার কর্তৃক "স্থানীয় সরকার (গ্রাম পরিষদ) আইন" এবং ২০০৩ সনে খালেদা জিয়া সরকার কর্তৃক "গ্রাম সরকার আইন" প্রণীত হয়। কিন্তু এই উভয় আইনের স্পৃহাটি ছিল গ্রামকে ইউনিয়ন পরিষদের ওয়ার্ড হিসেবে গণ্য করা এবং গ্রাম পর্যায়ের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোকে ইউনিয়ন পরিষদের পরিশিষ্টে পরিণত করা। বঙ্গবন্ধু এবং জিয়াউর রহমানের প্রস্তাবসমূহে গ্রাম পর্যায়ের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো যেমন সমাজের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর মৌল উপাদান হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছিল, তার প্রতিফলন এসব আইনে সেভাবে ছিল না। তদুপরি, এর প্রথমটি দ্বিতীয়টি দ্বারা রহিত করা হয়; এবং দ্বিতীয়টি দেশের উচ্চ আদালত কর্তৃক সংবিধান পরিপন্থী বলে ঘোষিত

হয়। ফলে এখন গ্রাম পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর ক্ষেত্রে এক শূন্যতা বিরাজ করছে। গ্রাম পর্যায়ে আনুষ্ঠানিক প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো কেবল একজন ওয়ার্ড প্রতিনিধিতে অবশিষ্টিত হয়েছে। ফলে গ্রামগুলো যেন অভিবাবকহীন, এতিমের মতো হয়ে আছে।

অথচ বিভিন্ন কারণে বাংলাদেশে গ্রাম পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়ে তোলা এখন আগের চেয়েও বেশী প্রয়োজন হয়ে দাঁড়িয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের মুখে টিকে থাকার জন্য দেশের জল এবং জমি সম্পদের যে নিবিড় ও মনোযোগী পরিচর্যা প্রয়োজন তা গ্রামের সকলের সমষ্টিগত উদ্যোগ ও প্রয়াস ছাড়া সম্ভব নয়। কিন্তু তার জন্য প্রয়োজন গ্রাম পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো। একইভাবে, বাংলাদেশের বিদ্যমান উন্নয়ন ধারাটি বহুলাংশে "উপর-থেকে-নীচ" বৈশিষ্টপূর্ণ এবং আমলাতান্ত্রিক। এই উন্নয়ন ধারাকে "নীচ-থেকে-উপর" বৈশিষ্টমন্ডিত এবং গণমুখী করার জন্যও প্রয়োজন গ্রাম পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো যা গ্রামের মানুষের স্বতস্ফূর্ত এবং সমষ্টিগত প্রয়াস উৎসারণের মুখটি উন্মুক্ত করতে পারে।

বাংলাদেশে গ্রাম পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর এরূপ অধোগতির বিপরীতে রয়েছে প্রতিবেশী ভারতের অভিজ্ঞতা। সেখানে আমরা দেখি "পঞ্চায়েত রাজে"র উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি, যার ভিত্তি হলো "গ্রাম পঞ্চায়েত"। স্থানীয় সরকার কাঠামোর সর্বনিম্ন ধাপ হিসেবে স্বীকৃত "গ্রাম পঞ্চায়েত" ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে গুরুত্বপূর্ণ এবং কার্যকর ভূমিকা পালন করছে। প্রতিবেশী পশ্চিমবঙ্গেও তার উদাহরণ দেখা যায়। গণচীনেও কমিউন ব্যবস্থা বাতিলের পর সেখানে গ্রাম সরকার গুরুত্ব পাচ্ছে। তদুপরি, নির্বাচিত গ্রাম সরকারের প্রতিষ্ঠা চীনের রাজনৈতিক ব্যবস্থার গণতন্ত্রায়ণের সূচনা ধাপ হিসেবেও বাড়তি গুরুত্ব পাচ্ছে। সুতরাং, বাংলাদেশের জন্য প্রাসংগিক আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতাও গ্রামের প্রতি দৃষ্টি ফেরানো এবং গ্রাম পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তার প্রতি দিক নির্দেশ করে।

এসব বিভিন্ন কারণেই আজ প্রয়োজন গ্রাম বিষয়ক বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নটির কাছে ফিরে যাওয়া এবং কীভাবে এই স্বপ্নকে যুগোপযোগী করে বাস্তবায়িত করা যেতে পারে সে লক্ষ্যে সচেষ্ট হওয়া। সে উদ্দেশ্যেই এই পুস্তকের রচনা। আজকের পরিস্থিতির জন্য বঙ্গবন্ধুর সমবায়ী গ্রাম প্রস্তাবটি কতখানি প্রাসংগিক? আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতার আলোকে বঙ্গবন্ধুর যৌথচাষের প্রস্তাব বর্তমানে কতোখানি উপযোগী? যৌথচাষবিহীন সমবায় কী কার্যকর হবে? যৌথচাষ ভিত্তিক গ্রাম তহবিল না গঠিত হলে গ্রামের বস্তুগত এবং শ্রম সম্পদের মধ্যে প্রয়োজনীয় সম্পৃক্তি কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে? যৌথচাষ এবং উৎপাদিত ফসলের এক-তৃতীয়াংশ ছাড়া গ্রাম তহবিল কীভাবে গঠিত হবে? সমবায়ী গ্রামের সাথে গ্রাম পর্যায়ে স্থানীয় সরকার কাঠামোর সম্পর্ক কী হবে? গ্রাম পর্যায়ে সৃষ্ট প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর সাথে স্থানীয় সরকারের বিদ্যমান অন্যান্য ধাপ, বিশেষত ইউনিয়ন পরিষদের সম্পর্ক কী হবে? গ্রাম পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর সুনির্দিষ্ট রূপটি কী হবে? এক্ষেত্রে আগের উদ্যোগসমূহের – যেমন ১৯৮০ সনের "স্বনির্ভর গ্রাম সরকার," ১৯৯৭ সনের

"স্থানীয় সরকার (গ্রাম পরিষদ) আইন," এবং ২০০৩ সনের "গ্রাম সরকার আইন," – মধ্যকার বিভিন্ন পার্থক্য অতিক্রম করা সম্ভব কী? বিদ্যমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে গ্রাম পর্যায়ে স্থানীয় সরকার কাঠামোকে সম্প্রসারিত করা এবং সমবায়ী গ্রাম গঠনের লক্ষ্য কতখানি বাস্তবসম্পন্ন? এসব এবং সম্পর্কিত অন্যান্য প্রশ্ন এই পুস্তকে আলোচিত হয়েছে। আলোচনার সূত্রে এসব প্রশ্নের যেসব উত্তর এই পুস্তকে পরিবেশিত হয়েছে, তাই যে চূড়ান্ত এমন কোনো দাবি করা হচ্ছে না। এই পুস্তকের মূল লক্ষ্য উপর্যুক্ত প্রশ্নসমূহের আলোচনার সূত্রপাত করা।

এই পুস্তকের আলোচনার একটি দীর্ঘ প্রেক্ষিত রয়েছে। বাংলাদেশের উন্নয়ন কৌশল এবং তাতে গ্রামের প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তনের ভূমিকা নিয়ে আমি গবেষণা শুরু করি আশীর দশকে। সেই গবেষণার ভিত্তিতে সেসময় দু'টি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়: *বাংলাদেশের উন্নয়ন কৌশল প্রসঙ্গ* (সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, ১৯৮৪) এবং *বাংলাদেশের উন্নয়ন সমস্যা* (জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ১৯৮৭)। এছাড়া বহুসংখ্যক প্রবন্ধও বিভিন্ন জার্নালে প্রকাশিত হয়। (কিছু পাণ্ডুলিপি অপ্রকাশিত থেকে যায়।) তারপর দীর্ঘকাল এ বিষয়ে আলোচনার আর সুযোগ হয় নি। ইতিমধ্যে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক অঙ্গনে অনেক মৌল পরিবর্তন ঘটে, যার প্রেক্ষিতে পূর্বতন অনুসিদ্ধান্তসমূহ পুনর্বিবেচনার প্রয়োজন দেখা দেয়।

এই দশকের শুরুতে পুনরায় এসব বিষয় নিয়ে আমার গবেষণা এবং প্রকাশনার সুযোগ ঘটে। তার ভিত্তিতে কয়েকটি বই প্রকাশিত হয়। তার মধ্যে রয়েছে, *বাংলাদেশের গ্রাম: অতীত ও ভবিষ্যৎ* (প্রথমা প্রকাশন ২০১১) এবং *আগামী দিনের বাংলাদেশ* (প্রথমা প্রকাশন ২০১২)। বর্তমান পুস্তকে যেসব বিশ্লেষণ পরিবেশিত হয়েছে তার আরও বিস্তারিত বিবরণ এসব পূর্ব প্রকাশিত গ্রন্থে উপস্থাপিত হয়েছে। সে কারণে এখানে তা বিস্তারিত করা হয় নাই। আরেকটি যে কারণে এই পুস্তকের আলোচনাকে বিভিন্ন স্থানে সংক্ষিপ্ত মনে হতে পারে তা হলো, এটা লেখা হয়েছিল "সমাজ গবেষণা কেন্দ্র" কর্তৃক প্রকাশিত *সমাজ, অর্থনীতি ও রাষ্ট্র* শীর্ষক জার্নালে প্রবন্ধ হিসেবে প্রকাশের জন্য। এই পুস্তকটি উপর্যুক্ত প্রবন্ধেরই কিছুটা বর্ধিত রূপ। এসব বিভিন্ন কারণে, কিছুটা সংক্ষিপ্ত হলেও, আশা করি মূল যুক্তি এবং অনুসিদ্ধান্তসমূহ পরিষ্কারভাবেই এই পুস্তকে পরিবেশিত হয়েছে। তবে ভবিষ্যতে আরও বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ সবসময়ই থাকবে।

এই পুস্তক প্রকাশের জন্য আমি অনেকের কাছেই ঋণী। তাদের সকলের কথা উল্লেখ করা সম্ভব নয়। তবে কয়েকজনের কথা উল্লেখ না করা অমার্জনীয় হবে। প্রথমত, গ্রাম বিষয়ক গবেষণার ক্ষেত্রে যারা পূর্বসূরী এবং যাঁদের গবেষণা এবং প্রকাশনা থেকে আমি বিশেষভাবে উপকৃত হয়েছি, তাঁদের প্রতি এই সুযোগে আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। এক্ষেত্রে কয়েকজনের নাম না উল্লেখ করলেই নয়। তাঁদের মধ্যে দু'জন হলেন আবু আহমেদ আবদুল্লাহ এবং মাহাবুব হোসেন। অকাল প্রয়াত এঁরা দুজনেই একসময় বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের (বি-আই-ডি-এস) গবেষক ছিলেন, এবং গ্রামের অর্থনীতি ও সমাজ কাঠামো নিয়ে মৌলিক গবেষণা উপহার দিয়েছেন। তাঁদের এ অবদান স্মরণীয় হয়ে থাকবে। এক্ষেত্রে তৃতীয়জন হলেন স্বপন আদনান, যিনি প্রথমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং পরে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের শিক্ষক ছিলেন। সত্তর দশকের শেষে এবং আশির দশকের শুরুতে "ভিলেজ স্টাডিজ" শিরোনামে তিনি গ্রামের সমাজ কাঠামো নিয়ে যে গবেষণা পরিচালনা করেছিলেন, তা গ্রামের অভ্যন্তরের আনুভূমিক ও উল্লাম্বিক বিভক্তি বোঝার জন্য বিশেষভাবে সহায়ক হয়েছিল।

দ্বিতীয়ত আমি ধন্যবাদ জানাতে চাই *সমাজ অর্থনীতি ও রাষ্ট্র* জার্নালের সম্পাদক ও প্রকাশককে, এই প্রবন্ধটি পুস্তকাকারে প্রকাশের অনুমতি প্রদানের জন্য। এই সুযোগে সমাজ গবেষণা কেন্দ্রের বন্ধু এবং সহযোগী সকলকে তাঁদের উৎসাহ, সমর্থন, এবং সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ জানাই। তৃতীয়ত, শিল্পী মোস্তাফিজ কারিগরকে সুন্দর প্রচ্ছদের জন্য ধন্যবাদ। চতুর্থত, মুদ্রক মাটি-আর-মানুষের সকল কর্মীদেরকে তাঁদের সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ। পঞ্চমত, ১৯৯৭ সনের "স্থানীয় সরকার (গ্রাম পরিষদ) আইন"টি খুঁজে পাওয়ার জন্য সুপ্রীম কোর্টের তরুণ আইনজীবী ও লেখক আরিফ খানের প্রতি আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। আশ্চর্যের বিষয় যে, এই আইনটি কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না।

বিশেষ ধন্যবাদ যাঁর প্রাপ্য তিনি হলেন গবেষক-প্রাবন্ধিক আহমাদ মাযহার, যিনি এই পুস্তকটি প্রকাশের কাজের তত্ত্বাবধান করেছেন। সবশেষে আমি কৃতজ্ঞ আমার পরিবারের সদস্যদের প্রতি, যাদের সমর্থন এবং সহযোগিতা আমার জন্য অতীব মূল্যবান।

এই বইতে প্রকাশিত সকল মতামত লেখকের নিজস্ব এবং এসবের সাথে তিনি যেসব সংস্থা, প্রতিষ্ঠান, সংগঠনের সাথে জড়িত সেগুলো একমত নাও হতে পারে।

এই বইটি আমি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি উৎসর্গ করেছি। তাঁর প্রতি আমরা জাতি হিসেবে যে অবিচার করেছি, তার সামান্যও যদি এতে যদি লাঘব হয়, সেটা হবে পরম পাওয়া।

নজরুল ইসলাম
[ই-মেইল: *nislam13@yahoo.com*]
২০১৭

১. ভূমিকা

১৯৭৫ সনের জানুয়ারি মাসে বঙ্গবন্ধু "দ্বিতীয় বিপ্লবে"র ডাক দিয়েছিলেন। এই বিপ্লবের কর্মসূচির রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক, দুটি দিকই ছিল। অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে মূল যে নতুন কর্মসূচি বঙ্গবন্ধু ঘোষণা করেন, তা হলো প্রতি গ্রামে বাধ্যতামূলক সমবায় প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু ১৯৭৫ সনের আগস্ট মাসে বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা এবং ক্ষমতার পরিবর্তনের ফলে দ্বিতীয় বিপ্লব আর অগ্রসর হতে পারে নি। ফলে সমবায়ী গ্রাম প্রতিষ্ঠার যে স্বপ্ন বঙ্গবন্ধু দেখেছিলেন, তা অবাস্তবায়িত থেকে যায়।

তারপর থেকে চার দশকের বেশি সময় অতিবাহিত হয়েছে। পদ্মা, মেঘনা, যমুনায় বহু পানি প্রবাহিত হয়েছে; বিশ্ব পরিস্থিতির নাটকীয় পরিবর্তন ঘটেছে; এবং সেইসঙ্গে বাংলাদেশের পরিস্থিতিরও পরিবর্তন হয়েছে। এত বছর এবং পরিবর্তনের পর আজও কী বঙ্গবন্ধুর সমবায়ী গ্রামের স্বপ্নের কোন প্রাসঙ্গিকতা এবং উপযোগিতা আছে? থাকলে তা কী? কীভাবে গ্রাম বিষয়ক বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নকে যুগোপযোগী করে বাস্তবায়িত করা যেতে পারে? এসব প্রশ্নই বর্তমান প্রবন্ধের উপজীব্য বিষয়। এই প্রবন্ধের মূল প্রস্তাবনা হলো, এত সময় এবং পরিবর্তন সত্ত্বেও আজও বঙ্গবন্ধুর সমবায়ী গ্রামের স্বপ্নটি প্রাসঙ্গিক এবং বাংলাদেশের বর্তমান গ্রামীণ ও জাতীয় সমস্যাবলি সমাধানে তা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। কীভাবে সেটা সম্ভব, তা তুলে ধরাই এই পুস্তকের মূল উদ্দেশ্য।

লক্ষণীয়, বঙ্গবন্ধুর সমবায়ী গ্রামের প্রস্তাবের দু'টি দিক ছিল। একটি হলো "যৌথ চাষে"র দিক। তিনি প্রস্তাব করেছিলেন, গ্রামের সকল জমিতে যৌথচাষ হবে। দ্বিতীয়টি হলো, গ্রামের সকলকে অন্তর্ভুক্ত করে একটি স্বয়ম্ভর প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়ে তোলার দিক। "গ্রাম তহবিল" গঠন সংক্রান্ত বঙ্গবন্ধুর প্রস্তাবের মধ্য দিয়ে এই দিকটি বিশেষভাবে প্রকাশিত হয়েছিল।

বিশ্বব্যাপী অভিজ্ঞতার আলোকে যৌথচাষের বিষয়টি এখন প্রশ্নবিদ্ধ। একদিকে, প্রাক্তন সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং পূর্ব-ইউরোপীয় দেশসমূহে যৌথচাষ সম্বলিত সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির পতন ঘটেছে। অন্যদিকে, চীন এবং ভিয়েতনামসহ এশীয় সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহ যৌথচাষ পরিত্যাগ করে

পরিবার-ভিত্তিক চাষে প্রত্যাবর্তন করেছে। এসব অভিজ্ঞতার আলোকে এখন বাংলাদেশে যৌথচাষের প্রস্তাব করা কঠিন। কিন্তু গ্রাম পর্যায়ে সকলকে অন্তর্ভুক্তকারী স্বয়ম্ভর প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়ে তোলার দিকটির উপযোগিতা হ্রাস পায় নি। বরং বিভিন্ন কারণে এই উপযোগিতা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। এসব কারণের মধ্যে রয়েছে: (ক) গ্রামের জন-জমি-জলসম্পদের অব্যাহত অনোত্তম (সাব-অপটিমাল) ব্যবহার; (খ) নদ-নদী ও জলাশয়সমূহের সংকটাপন্ন অবস্থা; (গ) জলবায়ু পরিবর্তনের বিভিন্নমুখী বিরূপ প্রভাব; (ঘ) জমি, জল, ও বায়ুর দূষণ; (ঙ) অপরিকল্পিত নগরায়ন ও শিল্পায়ন দ্বারা গ্রামের জমির অপচয়ধর্মী ব্যবহার; (চ) গ্রামাভ্যন্তরে বৈষম্যের বৃদ্ধি; (ছ) গ্রামের আত্ম-নির্ভরতার পরিবর্তে পরমুখাপেক্ষিতার প্রসার; ইত্যাদি। সুতরাং আজ সময় এসেছে বঙ্গবন্ধুর সমবায়ী গ্রামের স্বপ্নটির কাছে ফিরে যাওয়া এবং এই স্বপ্নটিকে বর্তমানের জন্য উপযোগী করে বাস্তবায়নে সচেষ্ট হওয়া।

বঙ্গবন্ধু-পরবর্তী বিভিন্ন সরকারের আমলে গ্রাম পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়ার কিছু উদ্যোগ নেয়া হয়েছে ঠিকই, কিন্তু সেগুলো হয় বাস্তবায়িত হয়নি কিংবা বাস্তবায়িত হলেও স্থায়ী হয়নি। জিয়াউর রহমানের আমলে "স্বনির্ভর গ্রাম সরকার" প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু এরশাদ সরকার তা অবলুপ্ত করে। পরবর্তী সরকারসমূহের এ সংক্রান্ত উদ্যোগ মূলত কমিশন গঠন, বিল উত্থাপন, এবং আইন প্রণয়নে সীমাবদ্ধ থাকে। ফলে বাংলাদেশের গ্রামের এখন কোনো প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো নেই। গ্রামগুলো এখন অনেকটা যেন এতিমের মতো হয়ে আছে। গ্রামের নিজস্ব জীবনী-শক্তি বহুলাংশে অবশ হয়ে আছে। গ্রামের ভেতর থেকে যৌথ কর্মকান্ডমূলক উদ্যোগ এবং উদ্যম তেমন সৃষ্ট হতে পারছে না।

গ্রামের সমবায়ীকরণের লক্ষ্যে প্রথম এবং আশু করণীয় হবে, গ্রামের সকল প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটে নির্বাচিত "গ্রাম পরিষদ" গঠন। গ্রাম পরিষদের দ্বৈত ভূমিকা থাকবে। একদিকে তা স্থানীয় সরকার কাঠামোর সর্বনিম্ন ধাপের ভূমিকা পালন করবে; অন্যদিকে তা সমবায়ী গ্রামের পরিচালনা পরিষদ হিসেবে কাজ করবে। যেহেতু গ্রামের সকলকে নিয়েই গ্রাম সমবায় গঠিত হবে, সেহেতু এ দু'য়ের জন্য আলাদা প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর প্রয়োজন নেই। তদুপরি যেহেতু যৌথচাষের প্রস্তাব করা হচ্ছে না, সেহেতু সমবায়ী গ্রামকে প্রত্যক্ষ দৈনন্দিন উৎপাদন কাজ পরিচালনার দায়িত্ব ততোটা পালন করতে হবে না। সে কারণেও সমবায়ী গ্রামের জন্য পৃথক পরিচালনা পরিষদের প্রয়োজন হবে না।

যৌথচাষের প্রবর্তন ছাড়াও নির্বাচিত গ্রাম পরিষদ এবং সমবায়ী গ্রাম গ্রামের সুপ্ত সম্ভাবনার সর্বোত্তম বাস্তবায়নের পথ উন্মোচিত করবে; গ্রামের নিজস্ব শক্তি, উদ্যম, এবং স্পৃহা পুনরুদ্ধার করবে। সমবায়ীকরণের ফলে গ্রামের জমি ও জল সম্পদের সঙ্গে গ্রামের শ্রমজীবীরা সম্পৃক্ত হবেন; এবং তার ফলে এসব সম্পদের যথাযথ ব্যবহার এবং উন্নয়নে শ্রম প্রদানে তাঁরা এগিয়ে আসবেন। এভাবে একদিকে গ্রামের জমি ও জল সম্পদ এবং অন্যদিকে শ্রম সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। যদিও যৌথচাষের প্রস্তাব করা হচ্ছে না, কিন্তু অনুকূল জাতীয় পরিস্থিতি এবং গ্রামের অভ্যন্তরীণ প্রস্তুতি সাপেক্ষে সীমাবদ্ধ পরিধির এবং স্বেচ্ছামূলক ভূমি সংস্কার এবং অন্যান্য প্রগতিশীল এবং গণমুখী উদ্যোগ গ্রহণ সম্ভব হবে, এবং তা গ্রামের সমবায়ীকরণকে অপেক্ষাকৃত গভীর চরিত্র দিতে পারবে।

গ্রামের বস্তুগত সম্পদের সঙ্গে শ্রমজীবীদের সম্পৃক্ত করার ক্ষেত্রে "গ্রাম তহবিল" গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এই গ্রন্থে আমরা দেখবো কীভাবে যৌথচাষের প্রবর্তন ছাড়াও গ্রামের সম্পদের ভিত্তিতে গ্রাম-তহবিল গড়ে তোলা সম্ভব। তদুপরি বঙ্গবন্ধুর প্রস্তাব মোতাবেক গ্রামের উন্নয়নের জন্য জাতীয় বাজেটের বরাদ্দকৃত অর্থ ও অন্যান্য সম্পদও গ্রাম-তহবিলের মাধ্যমে পরিচালিত হবে। গ্রামের মানুষের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ এবং তত্ত্বাবধানে গঠিত ও পরিচালিত গ্রাম পরিষদ এবং গ্রাম-তহবিল দেশের সামগ্রীক উন্নয়ন প্রয়াসে এক গুণগত পরিবর্তনের সূচনা করতে পারে। বর্তমানের "উপর-থেকে-নীচ" এবং মূলত আমলাতান্ত্রিক উন্নয়ন ধারার পরিবর্তে তা "নীচ-থেকে-উপর" এবং গণতান্ত্রিক ও গণমুখী উন্নয়ন ধারা প্রবর্তনের লক্ষ্যে একটি সবল এবং ব্যাপ্তীসম্পন্ন পদক্ষেপ হিসেবে কাজ করবে। এই ধারায় গ্রামের সুষম ও পরিবেশসম্মত উন্নয়ন সুগম হবে। বাংলাদেশের গ্রাম পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো সংক্রান্ত আইনটিকে তাই এমন হতে হবে, যাতে তা গ্রামের সমবায়ীকরণ, তাকে প্রয়োজনীয় গভীরতা প্রদান, এবং এর বিভিন্ন সুফল অর্জনের লক্ষ্যে যেসব উদ্যোগের দরকার তা গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় এখতিয়ার প্রদান করে।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশেই গ্রাম পর্যায়ে গঠিত প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো সফলভাবে কাজ করছে। প্রতিবেশী পশ্চিমবঙ্গসহ ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে "গ্রাম-পঞ্চায়েত" গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। চীনে কমিউন ব্যবস্থা ভেংগে দেয়ার পর গ্রাম পর্যায়ে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছে, এবং

নির্বাচনের মাধ্যমে "গ্রাম কমিটি" গঠনের বিধান এবং প্রথা চালু হয়েছে। গ্রাম পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ এসব অভিজ্ঞতা থেকে প্রয়োজনীয় শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। তবে বাংলাদেশের গ্রামের প্রাতিষ্ঠনিক কাঠামো এ দেশের নিজস্ব ইতিহাস এবং ঐতিহ্যের আলোকেই গড়ে তুলতে হবে। সে লক্ষ্যে গ্রামের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো বিষয়ে বাংলাদেশের অতীতের দিকে মনোযোগ দিতে হবে। নিজস্ব ইতিহাস এবং প্রাসঙ্গিক আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতার আলোকে সমবায়ী গ্রাম সংক্রান্ত প্রস্তাবটিকে যুগোপযোগী করে বাস্তবায়িত করা যেতে পারে, এবং এভাবেই বাংলাদেশের গ্রাম নিয়ে বঙ্গবন্ধু যে স্বপ্ন দেখেছিলেন, তাকে বাস্তবে রূপ দেয়া যেতে পারে।

এই গ্রন্থের আলোচনার ধারাবাহিকতা নিম্নরূপ। দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে ১৯৭৫ সালের জানুয়ারিতে ঘোষিত বঙ্গবন্ধুর সমবায়ী গ্রামের প্রস্তাবটি তুলে ধরা হয়েছে। এই প্রস্তাব উত্থাপন করার ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধু সমাজতন্ত্রের প্রতি তাঁর নিজের বিশ্বাস এবং সমাজতন্ত্রের সে সময়কার আন্তর্জাতিক মডেল দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। সেজন্যে প্রবন্ধের তৃতীয় অনুচ্ছেদে সমাজতন্ত্র সম্পর্কে বঙ্গবন্ধুর চিন্তাভাবনা এবং চতুর্থ অনুচ্ছেদে সমাজতন্ত্রের সে সময়কার মডেলে যৌথচাষ সম্বলিত সমবায়ের ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

কিন্তু সমাজতন্ত্রের আন্তর্জাতিক মডেল দ্বারা প্রভাবিত হলেও বঙ্গবন্ধুর সমবায় ঠিক সমাজতন্ত্রের সমবায় ছিল না। সমাজতন্ত্রের সমবায়ে সাধারণত জমির উপর ব্যক্তি মালিকানা থাকতো না; ফলে নীট উৎপাদনের প্রায় পুরোটাই শ্রমের ভিত্তিতে বিতরিত হতো। বিপরীতে, বঙ্গবন্ধুর সমবায়ে জমির উপর ব্যক্তি মালিকানা অক্ষুণ্ন ছিল। ফসলের তিন ভাগ হওয়ার কথা ছিল। একভাগ জমি মালিকানার ভিত্তিতে; একভাগ শ্রমের ভিত্তিতে; আর একভাগ "গ্রাম তহবিলে"র জন্য। এই তহবিল দ্বারা গ্রামের কল্যাণমুখী বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালিত হওয়ার কথা ছিল।

কেন বঙ্গবন্ধু এরূপ বিশেষ ধরনের সমবায়ের প্রস্তাব করেছিলেন, সেটা বোঝার জন্য বঙ্গবন্ধুর ঘোষণার জাতীয় প্রেক্ষিতটি জানা প্রয়োজন। সে কারণে এই গ্রন্থের পরবর্তী কয়েকটি অনুচ্ছেদে জাতীয় প্রেক্ষিতের দিকে মনোযোগ দেয়া হয়েছে। পঞ্চম অনুচ্ছেদে বাংলাদেশে কৃষক প্রশ্নের ইতিহাস আলোচিত হয়েছে। এতে বৃটিশ আমল থেকে পাকিস্তান আমল এবং স্বাধীন বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধু আমল পর্যন্ত কৃষক প্রশ্নের বিবর্তনের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া হয়েছে। এই বিবরণ থেকে আমরা দেখি যে, ১০০ বিঘা সিলিং ভিত্তিক পুনর্বিতরণমূলক ভূমি

সংস্কারের কর্মসূচি শেরে বাংলা আবুল কাশেম ফজলুল হকের ১৯৩৭ সনে গঠিত অবিভক্ত বাংলার মন্ত্রীসভায় গৃহীত হলেও তা কোনোদিন বাস্তবায়িত হয় নি। স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধু এই কর্মসূচি বাস্তবায়নে সচেষ্ট হন। কিন্তু তাঁর দলের ভেতরেই এ কর্মসূচির প্রতি বিরোধিতার কারণে তিনি পিছু হটতে বাধ্য হন। অবশেষে ১৯৭৫ সনে তিনি যৌথচাষ-সম্পন্ন সমবায়ী গ্রামের ঘোষণা দেন।

লক্ষণীয়, পুনর্বিতরণমূলক ভূমি সংস্কার থেকে যৌথচাষ – এই যাত্রায় বঙ্গবন্ধু একা ছিলেন না। বাংলাদেশের ভূমি সংস্কার নিয়ে যেসব অর্থনীতিবিদেরা সত্তর দশকে আলোচনা করেছেন, তাদের অধিকাংশের ক্ষেত্রেও অনুরূপ যাত্রা পরিলক্ষিত হয়। তবে বঙ্গবন্ধুর যাত্রার পেছনে মূল কারণটি ছিল "রাজনৈতিক সম্ভাব্যতা"র সমস্যা। পক্ষান্তরে, অর্থনীতিবিদদের জন্য তা ছিল "ভূমি-স্বল্পতা"র সমস্যা। এই দুই সমস্যা আবার পরস্পর সম্পর্কিত। বঙ্গবন্ধুর সমবায়ী গ্রাম ঘোষণার জাতীয় প্রেক্ষিতটি বোঝার জন্য এই দুই সমস্যা সম্পর্কে সম্যক ধারণা প্রয়োজন। আগামীতে কী কী ধারায় বঙ্গবন্ধুর সমবায়ী গ্রামের প্রস্তাবকে যুগোপযোগী করা সম্ভব, তা নির্ধারণের জন্যও এই ধারণা প্রয়োজন। সেকারণে ষষ্ঠ অনুচ্ছেদে পুনর্বিতরণমূলক ভূমি সংস্কারের পক্ষের যুক্তিগুলো তুলে ধরা হয়েছে। সপ্তম অনুচ্ছেদে পুনর্বিতরণমূলক ভূমি সংস্কারের পথে জমি-স্বল্পতার সমস্যা আলোচিত হয়েছে। অষ্টম অনুচ্ছেদে পুনর্বিতরণমূলক ভূমি সংস্কারের পথে রাজনৈতিক বাঁধার সমস্যা আলোচিত হয়েছে। এই রাজনৈতিক বাঁধা অতিক্রম করার জন্যই বঙ্গবন্ধু তাঁর প্রস্তাবিত সমবায়ে জমি-মালিকানা অক্ষুণ্ন রাখার উপর জোর দিয়েছিলেন। এটা ছিল জমি মালিকদের সঙ্গে আপোষের প্রস্তাব। সমবায় কর্মসূচির মধ্যে সুপ্ত এই আপোষের দিকটি নবম অনুচ্ছেদে আলোচিত হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর এই কৌশলী চিন্তাটি এখনও মূল্যবান, এবং গ্রাম সংক্রান্ত বর্তমানের করণীয় নির্ধারণের জন্য তা গুরুত্বপূর্ণ সূত্র যোগাতে পারে।

বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নকে যুগোপযোগী করার জন্য আরও জানা প্রয়োজন গত চার দশকে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক অংগণে কী কী প্রাসঙ্গিক পরিবর্তন ঘটেছে। আমরা উপরে লক্ষ্য করেছি, সমাজতন্ত্রের আন্তর্জাতিক মডেল বঙ্গবন্ধুকে প্রভাবিত করেছিল। কিন্তু ইতিমধ্যে সমাজতন্ত্রের মডেলের পরিবর্তন ঘটেছে। বিশেষত, গণচীন এবং ভিয়েতনামের অভিজ্ঞতা প্রমাণ করেছে যে, নিম্নমানের উৎপাদিকা শক্তির কৃষিতে যৌথচাষ সফল করা কঠিন। এমনকি যেসব "সমাজতান্ত্রিক" দেশে কৃষি প্রযুক্তি উন্নত পর্যায়ে পৌঁছেছিল, সেসব দেশেও

যৌথচাষ সম্বলিত সমবায় কাংখিত সাফল্য প্রদর্শন করতে পারেনি। নবম অনুচ্ছেদে আমরা এই আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা এবং বাংলাদেশের জন্য তার তাৎপর্যের বিষয়টি আলোচনা করেছি। দশম অনুচ্ছেদে আমরা দেখেছি জাতীয় অর্থনীতিতে, বিশেষত কৃষি এবং ভূমি মালিকানার ক্ষেত্রে কী কী মূল পরিবর্তন ঘটেছে। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতার এই পর্যালোচনা থেকে যে মূল সিদ্ধান্ত বেড়িয়ে আসে তা হলো, বর্তমান পর্যায়ে পুরো গ্রাম-ভিত্তিক যৌথচাষের প্রস্তাবনাটি পরিত্যাগ করাই শ্রেয়।

দ্বাদশ অনুচ্ছেদে আমরা দেখেছি যে, যৌথচাষ ছাড়াও সমবায়ী গ্রাম গঠিত হতে পারে এবং তার মাধ্যমে সমবায়ী গ্রামের যেসব সম্ভাবনা বঙ্গবন্ধু এবং বাংলাদেশের অর্থনীতিবিদেরা দেখেছিলেন তা বহুলাংশে বাস্তবায়িত হতে পারে। ত্রয়োদশ অনুচ্ছেদে আমরা সমবায়ী গ্রামে কী ধরনের স্বেচ্ছামূলক ভূমিসংস্কার বাস্তবায়িত হতে পারে, তা আলোচনা করেছি। গ্রামের সম্ভাবনা বাস্তবায়নের মূল শর্ত হলো, গ্রামের জল-জমি এবং অন্যান্য বস্তুগত সম্পদের সঙ্গে গ্রামের সকলকে সম্পৃক্ত করা। যৌথচাষ ছাড়াও এই সম্পৃক্তি সম্ভব, এবং এক্ষেত্রে গ্রাম-তহবিল কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করতে পারে। কীভাবে যৌথচাষ ছাড়াও গ্রাম-তহবিল গঠিত হতে পারে এবং কী কী ধারায় তা গ্রামের সম্ভাবনা বাস্তবায়ন করতে পারে, তা চতুর্দশ অনুচ্ছেদে তুলে ধরা হয়েছে। পঞ্চদশ অনুচ্ছেদে সমবায়ী গ্রাম কর্মসূচি বাস্তবায়নে পর্যায়ক্রমতা, বৈচিত্রের স্বীকৃতি, এবং অভ্যন্তরীণ সক্ষমতার প্রয়োজনীয়তার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে।

আগেই উল্লিখিত হয়েছে, সমবায়ী গ্রাম প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রাথমিক পদক্ষেপ হবে গ্রাম পর্যায়ে স্ব-শাসনমূলক একটি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়ে তোলা, যা একই সঙ্গে স্থানীয় সরকার কাঠামোর সর্বনিম্ন ধাপ এবং সমবায়ী গ্রামের পরিচালনা পরিষদ হিসেবে কাজ করবে। এই প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর সুনির্দিষ্ট রূপ এবং করণীয় কী হতে পারে তা নির্ণয় এবং বোঝার জন্য এ বিষয়ক বাংলাদেশের নিজস্ব ইতিহাস এবং প্রাসঙ্গিক আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা জানা প্রয়োজন। সে লক্ষ্যে ষোড়শ অনুচ্ছেদে আমরা বাংলাদেশের বিভিন্ন সরকার কর্তৃক গ্রাম পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়ার বিভিন্ন উদ্যোগের অভিজ্ঞতা আলোচনা করেছি। বিশেষত, বঙ্গবন্ধুর সমবায়ী গ্রাম (১৯৭৫), জিয়াউর রহমানের "স্বনির্ভর গ্রাম সরকার" (১৯৮০), শেখ হাসিনা সরকারের "স্থানীয় সরকার (গ্রাম পরিষদ) আইন" (১৯৯৭), এবং খালেদা জিয়া সরকারের "গ্রাম সরকার আইনে"র (২০০৩) একটি তুলনামূলক আলোচনা করেছি। গ্রামের

প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোটি সুনির্দিষ্ট করার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতার দিকে দৃষ্টি দেয়া সহায়ক হবে। সে উদ্দেশ্যে সপ্তদশ অনুচ্ছেদে আমরা প্রতিবেশী ভারত এবং চীনের প্রাসঙ্গিক অভিজ্ঞতা আলোচনা করেছি।

অষ্টাদশ অনুচ্ছেদে দেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে গ্রাম পরিষদ এবং সমবায়ী গ্রাম প্রতিষ্ঠার কর্মসূচি গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন কতখানি সম্ভব, সে বিষয়টি আলোচিত হয়েছে। সর্বশেষ, ঊনবিংশ অনুচ্ছেদে উপসংহারমূলক বক্তব্য পরিবেশিত হয়েছে।

২. ১৯৭৫ সনে বঙ্গবন্ধুর সমবায়ী গ্রামের ঘোষণা

১৯৭৫ সনের ২৬শে মার্চ স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে আয়োজিত সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে অনুষ্ঠিত জনসভায় বঙ্গবন্ধু সমবায়ী গ্রাম সংক্রান্ত তাঁর প্রস্তাবটি জনসমক্ষে তুলে ধরেন। এই বক্তৃতায় তিনি বলেন,

> আমি ঘোষণা করছি যে, পাঁচ বছরের প্ল্যানে (পরিকল্পনায়) প্রত্যেকটি গ্রামে ... কম্পালসারি (বাধ্যতামূলক) কো-অপারেটিভ (সমবায়) হবে। বাংলাদেশে ৬৫ হাজার গ্রাম-কো-অপারেটিভ হবে। প্রত্যেকটি মানুষ – যে মানুষ কাজ করতে পারে – তাকে এই কো-অপারেটিভের সদস্য হতে হবে। গ্রামে গ্রামে বহুমুখী কো-অপারেটিভ করা হবে।
>
> ... ভুল করবেন না। এই যে নতুন সিস্টেমে (ব্যবস্থায়) যেতে চাচ্ছি তাতে আমি আপনাদের জমি নেব না। ভয় পাবেন না যে, জমি নিয়ে যাব, তা নয়। এর জমি মালিকের থাকবে। আপনার জমির ফসল আপনি পাবেন। কিন্তু ফসলের অংশ সবাই পাবে। অংশ যাবে কো-অপারেটিভের হাতে; অংশ যাবে গভর্নমেন্টের (সরকারের) হাতে।
>
> ... এগুলো বহুমুখী কো-অপারেটিভ হবে। পয়সা যাবে তাদের কাছে, টেস্ট রিলিফ যাবে তাদের কাছে, ওয়ার্কস প্রোগ্রাম যাবে তাদের কাছে। আস্তে আস্তে ইউনিয়ন কাউন্সিল টাউটদের বিদায় দেয়া হবে; তা না হলে দেশকে বাঁচানো যাবে না। এ জন্যই ভিলেজ (গ্রাম) কো-অপারেটিভ হবে। ...
>
> আমার যুবক ভাইরা, আমি যে কো-অপারেটিভ করতে যাচ্ছি গ্রামে গ্রামে, এর উপর বাংলার মানুষের বাঁচা-মরা নির্ভর করবে। আপনাদের ফুলপ্যান্টটা একটু হাফ-প্যান্ট করতে হবে। পাজামা ছেড়ে একটু লুঙ্গি পড়তে হবে। আর গ্রামে

গ্রামে গিয়ে কো-অপারেটিভকে সাফল্যমন্ডিত করে তোলার জন্য কাজ করে যেতে হবে (বারকাত ২০১৫, পৃ. ৯৬-৯৭)।

বঙ্গবন্ধুর উপর্যুক্ত বক্তব্য থেকে বেশ কয়েকটি বিষয় বেড়িয়ে আসে। প্রথমত, তিনি যৌথচাষের প্রস্তাব করেছেন। দ্বিতীয়ত, তিনি ঘোষণা করেছেন যে, উৎপাদিত (নীট) ফসল তিনভাগে বিভক্ত হবে। একভাগ বিতরিত হবে শ্রমের ভিত্তিতে; একভাগ জমি মালিকানার ভিত্তিতে; আর একভাগে জমা হবে গ্রাম তহবিলে। এই তহবিল দিয়ে গ্রামের জন্য কল্যাণকর বিভিন্ন কর্মকান্ড বাস্তবায়িত হবে। (এই ভাগের বিষয়টি বঙ্গবন্ধু অন্যত্র আরও পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করেন।) তৃতীয়ত, বঙ্গবন্ধু বারংবার মনে করিয়ে দিয়েছেন যে, জমি মালিকানা অক্ষুণ্ন থাকবে। জমি মালিকদের তিনি আশ্বস্ত করেছেন যে, তাদের জমি নিয়ে নেয়া হবে না। চতুর্থত, তিনি এমন সমবায়ের কথা ভেবেছেন যা গ্রামের সকলকে অন্তর্ভুক্ত করবে, শুধু কৃষি উৎপাদনের সঙ্গে জড়িতদের নয়। সেকারণেই বঙ্গবন্ধুর সমবায় ছিল "বহুমুখী" সমবায়। শুধু ফসল উৎপাদন এবং তার ভাগ-বাটোয়ারাই এই সমবায়ের উদ্দেশ্য ছিল না। অন্যান্য বিভিন্নমুখী তৎপরতা পরিচালনাও এসব সমবায়ের লক্ষ্য ছিল। পঞ্চমত, তিনি গ্রামোন্নয়নের লক্ষ্যে জাতীয়, তথা গ্রামের বাইরের সকল সম্পদও গ্রাম সমবায়ের মাধ্যমে প্রবাহিত করার কথা ভেবেছেন।

সাক্ষাৎ কী কারণে এবং কার পরামর্শে বঙ্গবন্ধু উপর্যুক্ত সমবায়ী গ্রামের প্রস্তাব করেছিলেন, তা একটি কৌতূহলোদ্দীপক বিষয়। বিশেষত আওয়ামী লীগের ভেতরের ডানপন্থী বনাম বামপন্থী টানাপড়েনের মধ্যে বঙ্গবন্ধুর পক্ষে ১৯৭৫ সনে এরূপ আপাতঃদৃষ্টির একটি বামপন্থী ধারার পদক্ষেপ গ্রহণ কীভাবে সম্ভব হলো, তা একটি মূল্যবান অনুসন্ধানের বিষয় হতে পারে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বহুদলীয় সংসদীয় ব্যবস্থা বাতিল করে একদলীয় সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তনও আপাতদৃষ্টিতে একটি বামধারার কর্মসূচি বলে প্রতিভাত হতে পারে। সুতরাং উপরের প্রশ্নটি শুধু সমবায়ী গ্রাম প্রস্তাবের জন্য নয়, দ্বিতীয় বিপ্লবের রাজনৈতিক কর্মসূচি, তথা গোটা দ্বিতীয় বিপ্লব কর্মসূচির জন্যই প্রযোজ্য হতে পারে।[১] এসব প্রশ্ন নিয়ে আমরা অন্যত্র আলোচনা করেছি;[২] সুতরাং এখানে তার পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নেই।

ঘনিষ্ঠ পর্যালোচনা থেকে দেখা যায়, ১৯৭৫ সনে ঘোষিত সমবায়ী গ্রাম প্রস্তাবের পেছনে একদিকে ছিল বঙ্গবন্ধুর নিজস্ব রাজনৈতিক বিশ্বাস এবং অন্যদিকে ছিল জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক প্রেক্ষিত।[৩] এক্ষেত্রে দু'টি বিষয়

লক্ষণীয়। প্রথমত, বঙ্গবন্ধু নিজে সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস করতেন, এবং দ্বিতীয়ত, বঙ্গবন্ধুর সময়কালে আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে সমাজতন্ত্রের যে মডেল বিরাজমান ছিল, তাতে কৃষিতে যৌথচাষ ভিত্তিক সমবায়কেই যথাযথ বলে বিবেচনা করা হতো। পরবর্তী দুই অনুচ্ছেদের আলোচনা থেকে এই দু'টি বিষয় আরও পরিষ্কার হবে।

৩. বঙ্গবন্ধু এবং সমাজতন্ত্র

একটি ধারণা প্রচলিত আছে যে, বঙ্গবন্ধু বিভিন্ন সময় সমাজতন্ত্র-অভিমুখী যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন, সেগুলো ছিল অন্যদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে, অনেকটা চাপে পড়ে, এবং পরিস্থিতির কারণে অগত্যা গৃহীত পদক্ষেপ। ঘনিষ্ঠ বিচারে দেখা যায়, এই ধারণা সঠিক নয়। দ্বিতীয় বিপ্লব এবং তার অংশ হিসেবে সমবায়ী গ্রাম কর্মসূচি বঙ্গবন্ধু তাঁর নিজস্ব বিবেচনা থেকেই করেছিলেন; অন্যের দ্বারা প্ররোচিত হয়ে নয়।

আজকের পটভূমিতে অনেকের কাছে কিছুটা আশ্চর্যের মনে হলেও, বঙ্গবন্ধু নিজেই গভীরভাবে সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন। সম্প্রতি প্রকাশিত তাঁর *অসমাপ্ত আত্মজীবনী* এ বিষয়টি আরও স্পষ্ট করেছে। এই গ্রন্থ থেকে জানা যায়, পঞ্চাশের দশক থেকেই বঙ্গবন্ধু সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী হয়ে ওঠেন। সে দশকের ঘটনাবলী বর্ণনা করতে যেয়ে বঙ্গবন্ধু জানান,

> আমি নিজে কমিউনিস্ট নই। তবে সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস করি এবং পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে বিশ্বাস করি না। একে আমি শোষণের যন্ত্র হিসেবে মনে করি। এই পুঁজিপতি সৃষ্টির অর্থনীতি যতদিন দুনিয়ায় থাকবে, ততদিন মানুষের উপর মানুষের শোষণ বন্ধ হতে পারে না (রহমান ২০১৪, পৃ.২৩৪)।

বঙ্গবন্ধুর সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী হওয়াটা আশ্চর্যের নয়। ছোটবেলা থেকেই তিনি ছিলেন অন্যায় এবং অবিচারের বিরুদ্ধে। যারা নির্যাতিত, নিপীড়িত, অবহেলিত, শোষিত – বঙ্গবন্ধু সবসময় তাদের পক্ষে দাঁড়িয়েছেন। এটাই ছিল তাঁর চরিত্রের মূল দিক। এ দিকটিই তাঁর রাজনীতিকে সর্বদা পরিচালিত করেছে। তিনি সমাজকে দেখেছেন শোষক বনাম শোষিতের সংঘাতের দৃষ্টিকোণ থেকে। সে আমলে শোষণের বিষয়টি বোঝা তুলনামূলকভাবে সহজ ছিল। অর্থনীতি ছিল মূলত সামন্ত উৎপাদন সম্পর্ক বিজড়িত কৃষি অর্থনীতি। একজন জমিদার যে একজন কৃষক বা প্রজাকে শোষণ করছে, এটা বোঝার জন্য

কোনো গবেষণার প্রয়োজন ছিল না। বঙ্গবন্ধু এ ধরনের এবং কোনো ধরনের শোষণ মেনে নিতে রাজী ছিলেন না। মূলত, শোষণ ও অবিচার বিরোধী মনোভাবের জন্যই বঙ্গবন্ধু প্রথমে পাকিস্তান আন্দোলনে যোগ দেন এবং পরবর্তীতে বাংলাদেশ আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন।

১৭৯৩ সনে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের পর থেকে খাজনা অনাদায়ে জমিদারী নিলাম দেয়া, তথা "সূর্যাস্ত আইন" প্রয়োগের মাধ্যমে ধীরে ধীরে বাংলার বেশিরভাগ জমিদারী নব্য ধনী হিন্দু ব্যবসায়ীদের হাতে চলে যায়। (এ বিষয়ে আরও বিস্তৃত আলোচনার জন্য নীচের ৫ এবং ১৬ নং অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। ফলে, বিশেষত পূর্ব-বাংলায় প্রজাদের উপর জমিদারের শোষণ সাধারণভাবে মুসলমান কৃষক শ্রেণির উপর হিন্দু জমিদার শ্রেণির শোষণ বলে প্রতিভাত হয়। তদুপরি বঙ্গবন্ধু দেখেছিলেন যে, বৃটিশ শাসিত এবং হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ ভারতবর্ষে মুসলমানদের স্বার্থ উপেক্ষিত হচ্ছিল। এছাড়া অনেক উচ্চবর্ণ হিন্দুদের দ্বারা মুসলমানদের অচ্ছুৎ জ্ঞান করার বিষয় তো ছিলই। ফলে তিনি পাকিস্তান আন্দোলনকে শোষকের বিরুদ্ধে শোষিতের সংগ্রাম হিসেবে দেখেছিলেন। পাকিস্তানকেই বাংলার মুসলমানদের ত্রাণের উপায় বলে মনে করেছিলেন, এবং সর্বশক্তি দিয়ে তিনি পাকিস্তান আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন।[৪]

লক্ষণীয়, মুসলিম লীগের ভেতরও তিনি বস্তুত একটি শ্রেণি সংগ্রামে নিয়োজিত হন। সোহরাওয়ার্দী এবং আবুল হাশিমের নেতৃত্বে তিনি মুসলিম লীগকে নবাব আর খান বাহাদুরদের পকেট থেকে বের করে জনগণের মুসলিম লীগে পরিণত করার প্রয়াসে নিয়োজিত হন। তাঁদের এই প্রচেষ্টা সফলও হয়েছিল। সেকারণেই বাংলার কৃষক এবং সাধারণ মানুষ ১৯৪৬ সনের নির্বাচনে বিপুলভাবে মুসলিম লীগের পক্ষে ভোট দিয়েছিল। একমাত্র বাংলাতেই মুসলিম লীগ এককভাবে সরকার গঠন করতে পেরেছিল, এবং সোহরাওয়ার্দী অবিভক্ত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হতে পেরেছিলেন।[৫]

পাকিস্তান হওয়ার পর যখন মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব সোহরাওয়ার্দীকে অপসারিত করে বঙ্গীয় মুসলিম লীগের উপর খাজা নাজিমুদ্দিনের নেতৃত্ব চাপিয়ে দেয় এবং বাংলা ভাষা তথা বাংগালী জনগোষ্ঠীর ন্যায়সংগত অধিকারের উপর আক্রমণ শুরু করে তখন বঙ্গবন্ধু দ্রুত পাকিস্তানের মোহ পরিত্যাগ করে শোষিত বাঙ্গালী জাতির পক্ষে দাঁড়িয়ে যান। মুসলিম লীগের জনসম্পৃক্ত অংশ নিয়ে আওয়ামী লীগ গঠন করেন। তার পরের ইতিহাস সকলেরই জানা।[৬]

শোষিতের পক্ষে দাঁড়ানোর বঙ্গবন্ধুর যে আজন্ম তাগিদ, তার আরও প্রমাণ দেখি এমনকী পাকিস্তান আন্দোলন এবং সাক্ষাৎ পাকিস্তান-পরবর্তী বিভিন্ন ঘটনা থেকেও। তিনি পাকিস্তান আন্দোলনের মধ্যেই শ্রমিক "দাওয়াল"দের পক্ষে সংগ্রাম করেন। এই সংগ্রাম করতে যেয়ে গ্রেফতার হওয়ার মুখোমুখি হন। পাকিস্তান হওয়ার পর আইন পড়ার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার কিছুদিনের মধ্যেই তিনি বিশ্ববিদ্যালয় কর্মচারীদের সংগ্রামের সমর্থনে নেমে পড়েন এবং সে কারণে বহিষ্কৃত হন। অন্য অনেকে যদিও মুচলেকা দিয়ে বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার করিয়ে নেন, বঙ্গবন্ধু তা করতে রাজী হন না। ফলে জীবনে তাঁর আর আইন পড়া এবং ওকালতি করে অর্থ উপার্জন করা হয়ে ওঠে নি।

১৯৫০ সনে গণচীনের বেইজিং-এ অনুষ্ঠিত বিশ্ব শান্তি সম্মেলনে পাকিস্তান দলের সদস্য হিসেবে অংশগ্রহণকালে চীন দেশ ঘুরে দেখার যে সুযোগ পেয়েছিলেন, তা বঙ্গবন্ধুর সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসকে আরও গভীর করতে সহায়ক হয়েছিল। নতুন প্রতিষ্ঠিত গণচীনের কর্মকান্ড এবং মানুষের মধ্যেকার উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখে তিনি মোহিত হয়েছিলেন, এবং তার সঙ্গে নব-প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর আচার-আচরণ ও কর্মতৎপরতা তুলনা করে তিনি বিমর্ষ হয়েছিলেন। দুনিয়া এবং আন্তর্জাতিক ইস্যুসমূহও তিনি শ্রেণি দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতেন। *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*তে তিনি উপলব্ধি ব্যক্ত করেন যে,

> পুঁজিপতিরা নিজেদের স্বার্থে বিশ্বযুদ্ধ লাগাতে বদ্ধপরিকর। নতুন স্বাধীনতাপ্রাপ্ত জনগণের কর্তব্য বিশ্বশান্তির জন্য সংঘবদ্ধভাবে চেষ্টা করা। যুগ যুগ ধরে পরাধীনতার শৃংখলে যারা আবদ্ধ ছিল, সাম্রাজ্যবাদী শক্তি যাদের সর্বস্ব লুট করেছে – তাদের প্রয়োজন নিজের দেশকে গড়া ও জনগণের অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক মুক্তির দিকে সর্বশক্তি নিয়োগ করা। বিশ্বশান্তির জন্য জনমত সৃষ্টি করা তাই প্রয়োজন হয়ে পড়েছে (রহমান ২০১৪, পৃ. ২৩৪)।

সদ্য স্বাধীন পাকিস্তানের বৈদেশিক নীতির বিষয়টিও বঙ্গবন্ধু শ্রেণি অবস্থান থেকে বিচার করেন। এই উপলব্ধি থেকে তিনি গোড়া থেকেই পাকিস্তানের সিয়েটো এবং সেন্টো জোটে যোগদানের বিরোধিতা করেন। ১৯৫৩ সনে ময়মনসিংহে অনুষ্ঠিত আওয়ামী লীগের কাউন্সিল সভায় বঙ্গবন্ধু এসব জোটে যোগদানের বিরুদ্ধে এবং স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বৈদেশিক নীতির পক্ষে প্রস্তাব পাশ করান।[৭]

বঙ্গবন্ধু যে নিজে নিজেকে সমাজতন্ত্রী ভাবতেন, শুধু তাই নয়। অন্যদের কাছেও তা স্পষ্ট ছিল। শুধু তাই নয়, মুসলিম লীগের অনেকে তাকে কমিউনিস্ট বলেও সন্দেহ করতেন।[৮] এ বিষয়ে জিন্নাহ পরবর্তী পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল (বড় লাট) গোলাম মোহাম্মদের সঙ্গে ১৯৫৪ সনে সাক্ষাতকালে আলাপচারিতার এক চমৎকার বিবরণ বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত আত্মজীবনীতে পাওয়া যায়।

উপর্যুক্ত ইতিহাসের আলোকে স্পষ্ট, স্বীয় অভিজ্ঞতা এবং উপলব্ধির ভিত্তিতে বঙ্গবন্ধু নিজেই সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন এবং সে বিশ্বাস তাঁর পঞ্চাশের দশক থেকেই ছিল। সুতরাং, বহিস্থ চাপ কিংবা অন্যদের পরামর্শের ফলে তাঁকে পরবর্তীকালে সমাজতন্ত্রের ঘোষণা দিতে এবং সমাজতান্ত্রিক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হয়েছিল বলে যে ধারণা অনেকের মধ্যে প্রচলিত আছে, তা সঠিক নয়। বঙ্গবন্ধুর আত্মজীবনীর মধ্য দিয়ে এ বিষয়টি আরও পরিষ্কারভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সেকারণেই ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ১১-দফা গ্রহণে তাঁর কোন সমস্যা হয় নাই, এবং পরবর্তীতে বাংলাদেশের অন্যতম রাষ্ট্রীয় লক্ষ্য হিসেবে সমাজতন্ত্রকে গ্রহণেও তিনি দ্বিধা করেন নি।[৯]

স্বাধীনতার পর সমাজতন্ত্রের পক্ষে বঙ্গবন্ধুর ধ্যান-ধারণা আরও স্পষ্টভাবে সামনে চলে আসে, কেননা তখন তা শুধু আর ভবিষ্যত করণীয় সম্পর্কে বিশ্বাসের বিষয় ছিল না; বরং তা বিশ্বাস বাস্তবায়নের বিষয়ে পরিণত হয়। ১৯৭২ সনের ২৬শে মার্চ জাতীয়করণ পদক্ষেপ ঘোষণা করতে গিয়ে প্রথম স্বাধীনতা বার্ষিকী উপলক্ষে প্রদত্ত বেতার ও টেলিভিশনে প্রদত্ত ভাষণে বঙ্গবন্ধু বলেন,

> আমার সরকার অভ্যন্তরীণ সমাজ বিপ্লবে বিশ্বাসী। পুরাতন সমাজ ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনতে হবে। অবাস্তব তাত্ত্বিকতা নয়; আমার সরকার ও পার্টি বৈজ্ঞানিক সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি প্রবর্তনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। দেশের বাস্তব প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে পুরাতন সামাজিক কাঠামোকে ভেংগে দিয়ে নতুন সমাজ গড়তে হবে। শোষণ ও অবিচারমুক্ত নতুন সমাজ আমরা গড়ে তুলবো। জাতির এই মহাক্রান্তিলগ্নে সম্পদের সামাজিকীকরণের পর্যায়ক্রমিক কর্মসূচির শুভ সূচনা হিসেবে আমার সরকার উল্লিখিত বিষয়গুলো জাতীয়করণ করেছে (সেলিম ২০১৬)।

সুবিদিত যে, বঙ্গবন্ধুর এই জাতীয়করণ কর্মসূচির আওতায় পড়েছিল সকল ব্যাংক ও বীমা কোম্পানি, সকল বৃহৎ শিল্প এবং বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান।[১০] লক্ষণীয়, বাঙালি মালিকানাধীন কল-কারখানা, ব্যাংক, বীমা, ও অন্যান্য

বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠানও বঙ্গবন্ধু জাতীয়করণ করেছিলেন। সমাজতন্ত্রের প্রতি বিশ্বাস ছাড়া এটা সম্ভব ছিল না। কেন তিনি জাতীয়করণ করেছিলেন, জাতীয়করণের তাৎপর্য কী, এবং জাতীয়করণের প্রেক্ষিতে জনগণের করণীয় কী, তা ১৯৭২ সালের মে দিবস উপলক্ষে জাতির উদ্দেশ্যে দেয়া ভাষণে বঙ্গবন্ধু অত্যন্ত প্রাঞ্জলভাবে, সাধারণ মানুষের বোধগম্য ভাষায়, ব্যাখ্যা করেছিলেন। এই ব্যাখ্যা থেকেও সমাজতন্ত্রের প্রতি বঙ্গবন্ধুর বিশ্বাসের পরিচয় পাওয়া যায়।[১১] সমাজতন্ত্রের পক্ষে প্রাঞ্জল যুক্তি রচনার আরও উদাহরণ দেখা যায় ১৯৭২ সনের ৯ই মে রাজশাহী শহরের এক জনসভায় দেয়া বঙ্গবন্ধুর ভাষণে।[১২] ১৯৭৩ সনের ৪-রা ডিসেম্বর বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসের উদ্বোধনী অধিবেশনে প্রদত্ত বক্তৃতায় বঙ্গবন্ধু বলেন,

> সমাজতন্ত্র আমাদের প্রয়োজন। সমাজতন্ত্র না হলে এ দেশের দুঃখী মানুষের বাঁচবার উপায় নাই। আমরা শোষণহীন সমাজতন্ত্র চাই।" এর সঙ্গে তিনি এও যোগ করেন যে, "সমাজতন্ত্রের রাস্তা সোজা নয়। সমাজতন্ত্র করতে হলে যে ক্যাডারের দরকার, তা আমরা করতে পেরেছি কিনা এ নিয়ে আলোচনার দরকার আছে।" তবে তিনি ঘোষণা করেন যে, "সমাজতন্ত্রের রাস্তায় আমরা যে পদক্ষেপ নিয়েছি, তা থেকে আমরা পিছু হটতে পারি না, পারবো না – যত বড় ষড়যন্ত্রই চলুক না কেন (সেলিম ২০১৬)।"[১৩]

বঙ্গবন্ধু শুধু যে সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন তাই নয়, *সমবায়* সম্পর্কেও বঙ্গবন্ধুর চিন্তাধারা ছিল গভীর এবং ব্যাপক। ১৯৭২ সনের ৩০শে জুন বাংলাদেশ সমবায় ইউনিয়ন আয়োজিত সমবায় সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণ থেকে তা স্পষ্ট হয়। এই ভাষণে বঙ্গবন্ধু বলেন,

> আমার দেশের প্রতিটি মানুষ খাদ্য পাবে, আশ্রয় পাবে, শিক্ষা পাবে, উন্নত জীবনের অধিকারী হবে – এই হচ্ছে আমার স্বপ্ন। এই পরিপ্রেক্ষিতে গণমুখী সমবায় আন্দোলনকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। কেননা, সমবায়ের পথ সমাজতন্ত্রের পথ, গণতন্ত্রের পথ। সমবায়ের মাধ্যমে গরিব কৃষকেরা যৌথভাবে উৎপাদন যন্ত্রের মালিকানা লাভ করবে। অন্যদিকে অধিকতর উৎপাদন বৃদ্ধি ও সম্পদের সুষম বণ্টন ব্যবস্থায় প্রতিটি ক্ষুদ্র চাষী গণতান্ত্রিক অংশ ও অধিকার পাবে। জোতদার, ধনী চাষীর শোষণ থেকে তারা মুক্তি লাভ করবে সমবায়ের সংহত শক্তি দ্বারা। একইভাবে কৃষক, শ্রমিক, তাঁতি, জেলে, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা যদি একজোট হয়ে পুঁজি ও অন্যান্য উপাদান সমবায়ের মাধ্যমে একত্র করতে পারেন তবে আর মধ্যবর্তী ধনিক ব্যবসায়ী-শিল্পপতি গোষ্ঠী

তাদের শ্রমের ফসলকে লুট করে খেতে পারবে না। সমবায়ের মাধ্যমে গ্রাম বাংলায় গড়ে উঠবে ক্ষুদ্র শিল্প যার মালিক হবে সাধারণ কৃষক, শ্রমিক, এবং ভূমিহীন নির্যাতিত দুঃখী মানুষ। ... আজ সমবায় পদ্ধতিতে গ্রামে গ্রামে, থানায়, বন্দরে গড়ে তুলতে হবে মেহনতী মানুষের যৌথ মালিকানা। কৃষকেরা তাদের উৎপাদিত ফসলের বিনিময়ে পাবে ন্যায্যমূল্য; শ্রমিকেরা পাবে শ্রমের ফল ভোগের ন্যায্য অধিকার। ... অতীতের সমবায় ছিল শোষক গোষ্ঠীর ক্রীড়নক। তাই সেখানে ছিল কোটারী স্বার্থের ব্যাপক ভূমিকা। আমাদের সমবায় আন্দোলন হবে সাধারণ মানুষের যৌথ আন্দোলন – কৃষক, শ্রমিক, মেহনতি জনতার নিজস্ব প্রতিষ্ঠান। আপনারা জানেন যে, সমবায় সংস্থাগুলিকে সত্যিকারের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার জন্য আমি ঘোষণা করেছি যে, সংস্থার পরিচালনা দায়িত্ব ন্যস্ত থাকবে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের উপর, কোনো আমলা বা মনোনীত ব্যক্তির উপর নয়। আমার সমবায়ী ভাইয়েরা এই বলিষ্ঠ পদক্ষেপকে অভিনন্দিত করেছেন। এই গণতন্ত্রীকরণের পরিপ্রেক্ষিতে আমি তাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই তাদের দায়িত্ব। তাদের দেখতে হবে যে, সমবায় সংস্থাগুলি যেন সত্যিকারের জনগণের প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে ওঠে। জেলে সমিতি, তাঁতি সমিতি, গ্রামীণ কৃষক সমিতি যেন সত্যিকারের জেলে, তাঁতি, কৃষকের সংস্থা হয়; মধ্যবর্তী ব্যবসায়ী বা ধনী কৃষক যেন আবার এই সমিতিগুলোকে দখল করে অতীত দুর্নীতির পুনরাবৃত্তি না করে। আমার প্রিয় কৃষক, মজুর, জেলে, তাঁতিভাইদের সাহায্যে এমন একটি নতুন ও সুষম ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে যা শোষণ ও প্রতিক্রিয়াশীল কোটারী স্বার্থকে চিরদিনের জন্য নস্যাৎ করে দেবে (বারকাত ২০১৫, পৃ. ৯৪-৯৫)।

উপরের আলোচনা এবং উদ্ধৃতিসমূহ থেকে পরিষ্কার যে, বঙ্গবন্ধু নিজেই আন্তরিকভাবে সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন এবং এই বিশ্বাস তাঁর রাজনৈতিক জীবনের প্রায় শুরু থেকেই ছিল।[১৪] পরবর্তীকালে তাঁর এই বিশ্বাস আরও দৃঢ় হয়েছিল। স্বাধীন বাংলাদেশকে তিনি সমাজতন্ত্রের ধারার অগ্রসর করে নিতে চেয়েছিলেন। সে কারণে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে তখন সমাজতন্ত্রের যে মডেল ছিল, সেটাকেই তিনি বহুলাংশে অনুসরণ করার চেষ্টা করেছিলেন। সে কারণে পরবর্তী অনুচ্ছেদে আমরা সমবায়ী গ্রাম ঘোষণার এই আন্তর্জাতিক প্রেক্ষিতটির প্রতি দৃষ্টি দেব।

৪. বঙ্গবন্ধুর সমবায়ী গ্রাম ঘোষণার আন্তর্জাতিক প্রেক্ষিত

১৯৭৫ সনের সমবায়ী গ্রাম ঘোষণা করার ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধু সমাজতন্ত্রের বিদ্যমান আন্তর্জাতিক মডেল দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। এটা শুধু সমবায়ী গ্রামের বিষয়ে নয়। স্বাধীনতার পর ১৯৭২-১৯৭৫ সময়কালে বঙ্গবন্ধু কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের মধ্যেই এর উদাহরণ দেখা যায়। সমাজতন্ত্রের তখনকার মডেলে শিল্প ও বৃহৎ বাণিজ্য থাকতো সরকারী মালিকানায়। বঙ্গবন্ধুও বাংলাদেশে বৃহৎ শিল্প ও বাণিজ্য জাতীয়করণ করেছিলেন। তখনকার সমাজতন্ত্রের রাজনৈতিক মডেল ছিল কার্যত একদলীয় শাসনের। বহুদলীয় সংসদীয় পদ্ধতির পক্ষে আজীবন সংগ্রামে সত্ত্বেও বঙ্গবন্ধু ১৯৭৫ সনে একদলীয় শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করেছিলেন। আশ্চর্যের নয় যে, তিনি এটাকে নাম দিয়েছিলেন "শোষিতের গণতন্ত্র"। এটাও তার শোষক-শোষিত আতসকাঁচ (প্রিজম) দিয়ে পৃথিবীকে দেখারই উদাহরণ ছিল।

কৃষি ও গ্রামের ক্ষেত্রেও আমরা তার পুনরাবৃত্তি দেখি। ১৯৭৫ সনে যখন বঙ্গবন্ধু দ্বিতীয় বিপ্লবের কর্মসূচি ঘোষণা করেন, তখন সমাজতন্ত্রের যে মডেল পৃথিবীতে চালু ছিল, তাতে কৃষিতে যৌথচাষকেই বাঞ্ছনীয় কিংবা অপরিহার্য মনে করা হতো। এটা শুরু হয় সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে। ১৯১৭ সনে অক্টোবর বিপ্লবের পর রুশদেশে ভূস্বামী, তথা জমিদারদের জমি কৃষকদের মধ্যে বণ্টন করে দেয়া হয়। লেনিন প্রথমে এরূপ বণ্টনে উৎসাহী ছিলেন না। তিনি বরং এসব জমিতে বৃহদাকার খামার প্রতিষ্ঠা করা যায় কিনা, সে বিষয়ে আগ্রহী ছিলেন। কিন্তু জমি-বণ্টনের পক্ষে কৃষকদের বিপুল সমর্থনের কারণে তিনি মত বদল করে বণ্টনের পক্ষে সায় দেন। বস্তুত শেষাবধি জমি বণ্টন আর বলশেভিকদের মতের উপর নির্ভর করে না। ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের পর স্বতঃস্ফূর্তভাবেই – কৃষকদের নিজ উদ্যোগে, অর্থাৎ সমাজের নীচ থেকে এবং উপরিস্থ রাষ্ট্রের উদ্যোগ ও পদক্ষেপ ছাড়াই – ভূস্বামীদের জমি বাজেয়াপ্ত এবং বণ্টন শুরু হয়ে যায়। অক্টোবর বিপ্লবের পর এই প্রক্রিয়া আরও বেগবান হয় এবং দ্রুতই পূর্ণতা অর্জন করে।

পরবর্তীতে লেনিন "নয়া অর্থনৈতিক নীতি (নেপ)" চালু করেন এবং বণ্টন-উদ্ভূত ক্ষুদে কৃষক উৎপাদন ব্যবস্থাকে সমাজতন্ত্রের অংশ হিসেবে মেনে নেন, এবং জোর করে "উৎপাদন" সমবায় প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন। মৃত্যুর পূর্বে "সমবায় সম্পর্কে" শিরোনামে লিখিত এক গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধে তিনি

কৃষকদের মধ্যে বাণিজ্যিক এবং অন্যান্য ধরনের সমবায় প্রসারের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন এবং ধারণা দেন যে, এভাবে ধীরে ধীরে ভবিষ্যতে উৎপাদন সমবায় গড়ে উঠবে, যাতে কৃষকেরা *স্বেচ্ছায়* যোগ দেবে।[১৫]

কিন্তু ১৯২৯ সনে স্তালিন অনেকটা অতর্কিতভাবে নেপের অবসান ঘটান এবং গ্রামে ক্ষুদে কৃষক উৎপাদন ব্যবস্থা বাতিল করে যৌথচাষ ভিত্তিক উৎপাদন সমবায় প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯২৯ থেকে ১৯৩১, মাত্র দুই বছরের মধ্যে গোটা সোভিয়েত ইউনিয়নের কৃষিকে যৌথচাষ ভিত্তিক সমবায়ী কৃষিতে রূপান্তরিত করা হয়। সেই থেকে যৌথচাষ তথা উৎপাদন সমবায় সমাজতন্ত্রের কৃষি ও গ্রামের রূপ হয়ে দাঁড়ায়। সোভিয়েত ইউনিয়নের উদাহরণের সূত্রে পরবর্তীতে অন্যান্য পূর্ব ইউরোপীয় অনেক দেশেও কৃষিতে যৌথচাষ চালু হয়।[১৬]

গণচীনের ইতিহাসটি অনেকটা সোভিয়েত ইউনিয়নের মতোই। সেখানে ১৯৪৯ সনের বিপ্লবের পর প্রথমে ভূস্বামীদের জমি বাজেয়াপ্ত করে তা শ্রমজীবী কৃষকদের মধ্যে বন্টিত হয়েছিল। ফলে সেখানেও ক্ষুদে উৎপাদন-ভিত্তিক কৃষি চালু হয়েছিল। কিন্তু মাও জেদং ১৯৫৭-৫৮ সনে "বৃহৎ উল্লম্ফন" কর্মসূচি চালু করেন। এই কর্মসূচির অংশ হিসেবে গ্রামে ক্ষুদে কৃষক-ভিত্তিক ব্যবস্থা নাকচ করে যৌথচাষ ভিত্তিক কমিউন প্রতিষ্ঠিত হয়। চীনের কমিউনসমূহের দায়িত্ব শুধু কৃষিতে সীমাবদ্ধ ছিল না; বিভিন্ন ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ এবং শিল্প প্রতিষ্ঠাও এর এখতিয়ারের মধ্যে পড়ে। সমাজতান্ত্রিক ভিয়েতনামেও যৌথচাষ প্রচলিত হয়।[১৭]

এভাবে কী ইউরোপ, কী এশিয়া – সর্বত্রই সমাজতন্ত্রের দেশসমূহে কৃষিতে যৌথচাষ প্রবর্তিত হয়। ফলে সমাজতন্ত্র এবং কৃষিতে যৌথচাষ সমার্থক হয়ে পড়ে।[১৮] উপর্যুক্ত আন্তর্জাতিক প্রেক্ষিতের কারণে এটা বলা অসংগত হবে না যে, ১৯৭৫ সনে যৌথচাষভিত্তিক সমবায়ী গ্রামের কর্মসূচি প্রস্তাব করার ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধু সমাজতন্ত্রের আন্তর্জাতিক মডেল দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন।

কিন্তু যেটা লক্ষণীয়, আন্তর্জাতিক প্রেক্ষিত তথা সমাজতন্ত্রের তদানীন্তন আন্তর্জাতিক মডেল দ্বারা প্রভাবিত হলেও বঙ্গবন্ধু যে সমবায়ের প্রস্তাব করছিলেন, তা ঠিক সমাজতান্ত্রিক সমবায় ছিল না। সমাজতান্ত্রিক দেশের সমবায়ে সাধারণত জমির উপর ব্যক্তি-মালিকানা ছিল না। যেমন রাশিয়াতে বিপ্লবের পর "শান্তি" ডিক্রির পর দ্বিতীয় ডিক্রিই ছিল "জমি" সংক্রান্ত ডিক্রি। এই ডিক্রি দ্বারা জমির জাতীয়করণ করা হয়েছিল। ফলে ফসলের বিতরণ ছিল পুরোপুরিই শ্রমের ভিত্তিতে। একইভাবে চীনের কমিউনেও জমির উপর কোনো

ব্যক্তি মালিকানা ছিল না। বিপরীতে, বঙ্গবন্ধুর সমবায় ছিল জমি মালিকানা সংরক্ষিত রেখে যৌথচাষের সমবায়। এ সমবায়ে জমি মালিকানার সূত্রে উৎপদিত ফসলের অংশ পাওয়ার বিধান ছিল। সুতরাং, সমাজতন্ত্রের আন্তর্জাতিক মডেল দ্বারা প্রভাবিত হোলেও বঙ্গবন্ধু তার অন্ধ অনুকরণের চেষ্টা করেন নি।

শুধু সমবায়ের ক্ষেত্রে নয়। সাধারণভাবে, বিদেশি মডেলের অন্ধ অনুকরণ যে সঠিক নয়, সে বিষয়ে বঙ্গবন্ধু সচেতন ছিলেন। ১৯৭৫ সালের জুলাই মাসে নবগঠিত বাকশালের কেন্দ্রীয় কমিটির প্রথম বৈঠকে দেয়া তার বক্তৃতায় বঙ্গবন্ধু বলেন,

> তবে এখানে যে শোষণহীন সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার কথা আমরা বলেছি, সে অর্থনীতি আমাদের, সে ব্যবস্থা আমাদের। কোনো জায়গা থেকে হায়ার (ভাড়া) করে এনে, ইমপোর্ট (আমদানি) করে এনে কোন 'ইজম' (মতবাদ) চলে না। এ দেশে – কোনো দেশে চলে না। আমার মাটির সাথে, আমার মানুষের সাথে, আমার কালচারের (সংস্কৃতির) সাথে, আমার ব্যাকগ্রাউন্ডের (পটভূমির) সাথে, আমার ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত করেই আমার ইকনমিক সিস্টেম (অর্থনৈতিক ব্যবস্থা) গড়তে হবে। কারণ আমাদের দেশে অনেক সুবিধা আছে। কারণ, আমার মাটি কী, আমার পানি কতো, আমার এখানের মানুষের কালচার কী, আমার ব্যাকগ্রাউন্ড কী, তা না জানলে হয় না। ফান্ডামেন্টালি (মূলগতভাবে) আমরা একটা শোষণহীন সমাজ গড়তে চাই, আমরা একটা সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি করতে চাই। বাট দি সিস্টেম ইজ আওয়ার্স। উই ডু নট লাইক টু ইমপোর্ট ইট ফ্রম এনিহোয়ার ইন দি ওয়ার্ল্ড (তবে ব্যবস্থাটি আমাদের। পৃথিবীর অন্য কোথাও থেকে এটা আমদানি করার ইচ্ছা আমাদের নেই) (সেলিম, ২০১৬)।

সুতরাং, ১৯৭৫ সনে বঙ্গবন্ধু যে সমবায়ী গ্রামের প্রস্তাব করেন, তার মধ্যে একদিকে যেমন ছিল সমাজতন্ত্রের তদানিন্তন আন্তর্জাতিক মডেলের প্রভাব, অন্যদিকে তাতে ছিল বাংলাদেশের জাতীয় প্রেক্ষিতের প্রভাব। কী ছিল এই জাতীয় প্রেক্ষিত? কিভাবে তা বঙ্গবন্ধুকে প্রভাবিত করেছিল? পরবর্তী কয়েকটি অনুচ্ছেদে আমরা এই প্রশ্নেরই উত্তর খুঁজবো। জাতীয় প্রেক্ষিতের আবার কয়েকটি দিক চিহ্নিত করা যেতে পারে। একটি হলো বাংলাদেশের কৃষক প্রশ্নের "ঐতিহাসিক" দিক। অন্যটি হলো ১৯৭৫ সনের ঘোষণার "সমসাময়িক" দিক। প্রথমে আমরা ঐতিহাসিক দিকটি, তথা বাংলাদেশে কৃষক প্রশ্নের ইতিহাসটি সংক্ষেপে আলোচনা করবো।

৫. বাংলাদেশে কৃষক প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

যে কৃষক প্রশ্ন সমাধানের উদ্দেশ্যে বঙ্গবন্ধু ১৯৭৫ সনের সমবায়ী গ্রামের ঘোষণা দেন, তার ঐতিহাসিক প্রেক্ষিতটি দীর্ঘ। এক হিসেবে এর সূচনা বৃটিশ আমলে।

৫.১ বৃটিশ আমল

১৭৯৭ সনে বৃটিশেরা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রবর্তন করে। এটি ছিল ভারতবর্ষে "সামন্ত" জমি-মালিকানার স্থলে "বুর্জোয়া" জমি মালিকানা প্রবর্তনের উদ্যোগ।[১৯] সামন্ত জমি মালিকানার দু'টি মূল বৈশিষ্ট ছিল। একটি হলো, এই মালিকানা যতো না জমির উপর, তার চেয়ে বেশি প্রত্যক্ষভাবে কৃষক বা প্রজার উপর নিবদ্ধ ছিল। এর কারণও স্পষ্ট। সামন্ত যুগে জমির তুলনায় মানুষ ছিল কম। সাধারণত, অনেক জমি পতিত অথবা অরণ্য কিংবা জলাবেষ্টিত থেকে যেত। কাজেই স্বাধীনতা থাকলে কৃষকেরা এসব জমিতে চলে যেতে পারতো। কৃষকবিহীন জমির উপর মালিকানার বিশেষ অর্থ ছিল না। সেকারণে সামন্ত যুগের অন্যতম বৈশিষ্ট ছিল কৃষকদের খর্বিত স্বাধীনতা। এর চূড়ান্ত রূপ ছিল ভূমি-দাস প্রথা, যা রাশিয়াসহ অন্য অনেক দেশে প্রচলিত ছিল। অন্যান্য সামন্ত সমাজে ব্যক্তি-স্বাধীনতার খর্বকরণ এরূপ উত্তুঙ্গ রূপ না পেলেও কমবেশি প্রযোজ্য ছিল। এ পরিস্থিতি বোঝানোর জন্যই অনেক সময় বলা হয় যে, সামন্ত যুগে কৃষকেরা (প্রজারা) ছিল "রাজনৈতিকভাবে পরাধীন" এবং সামন্ত শোষণ ছিল "রাজনৈতিক বলপ্রয়োগ" ভিত্তিক। এর সঙ্গে সম্পর্কসূত্রে বিজড়িত ছিল সামন্তবাদের জমি মালিকানার দ্বিতীয় মূল বৈশিষ্ট। সেটা হলো, সামন্ত মালিকানা "নিরঙ্কুশ" ধরনের মালিকানা ছিল না। বরং মালিকানা ছিল "আপেক্ষিক"। এই মালিকানার সুনির্দিষ্ট অভিপ্রকাশ ছিল উৎপাদিত ফসলে কার কতটুকু অধিকার সে সংক্রান্ত নিয়ম বা প্রথা। উৎপন্ন ফসলে রাজার অধিকার ছিল; জমিদারের অধিকার ছিল; কৃষকেরও অধিকার ছিল। কারো অধিকারই নিরঙ্কুশ ছিল না। সকলেই কিছু ঐতিহ্যগত নিয়ম বা প্রথা দ্বারা আবদ্ধ ছিল। বিশেষত জমির উপর কৃষকের অধিকার নিয়ে কোনো প্রশ্ন ছিল না। জমি থেকে কৃষকদের উচ্ছেদ নয়; কিভাবে জমিতে কৃষকদের ধরে রাখা যায়, সেটাই ছিল মূল বিষয়; এবং তার জন্য বলপ্রয়োগ সামন্ত যুগের একটি সাধারণ বৈশিষ্ট ছিল।[২০]

বিপরীতে, বুর্জোয়া জমি মালিকানা হলো জমির উপর নিবদ্ধ; এই মালিকানায় জমিকে একটি "বস্তু" হিসেবে দেখা হয়। কৃষকদের সঙ্গে সম্পর্ক

হচ্ছে পরোক্ষ – বস্তু হিসেবে জমির মাধ্যম দ্বারা রচিত একটি সম্পর্ক। কৃষকেরা রাজনৈতিকভাবে স্বাধীন। একইসঙ্গে বুর্জোয়া জমি মালিকানা নিরঙ্কুশ। কৃষকের প্রথাগত অধিকারের কোনো স্বীকৃতি এই মালিকানায় নেই। সেহেতু রাজনৈতিকভাবে স্বাধীন হলেও জমির প্রয়োজনে কৃষকেরা বুর্জোয়া মালিকদের উপর অর্থনৈতিকভাবে নির্ভরশীল। সে কারণে বুর্জোয়া শোষণকে অনেক সময় "অর্থনৈতিক বলপ্রয়োগ" ভিত্তিক শোষণ বলা হয়।

সামন্ত মালিকানা থেকে বুর্জোয়া মালিকানায় উত্তরণ ঐতিহাসিকভাবে একটি প্রলম্বিত প্রক্রিয়া ছিল। পশ্চিম ইউরোপ, বিশেষত ইংল্যান্ডেই এই উত্তরণ প্রথম ব্যাপকহারে সংঘটিত হয়। এরজন্য অর্থনীতি ও সমাজকে কয়েক শতাব্দীর "বাণিজ্যবাদে"র (মার্কেটাইলিজমের) পর্ব অতিক্রম করতে হয়েছে। তারপরই কেবল সমাজ জমির উপর বুর্জোয়া মালিকানার জন্য প্রস্তুত হয়। এই প্রস্তুতির পরও বুর্জোয়া মালিকানা দ্বারা জমির উপর সামন্ত মালিকানার প্রতিস্থাপন একটি যথেষ্ট বেদনাদায়ক প্রক্রিয়া ছিল। এই প্রক্রিয়ার চূড়ান্তি ঘটে ইংল্যান্ডের "ফার্মার (কৃষি-উদ্যোক্তা) মডেলের" উদ্ভবের মধ্যে।[২১] এই মডেলে ফার্মার ভূস্বামীদের নিকট থেকে একটি নির্দিষ্ট খাজনার বিনিময়ে জমি ইজারা নেয়। অতঃপর সে মজুরীর বিনিময়ে কৃষি শ্রমিকদের দিয়ে জমি চাষ করায়। নীট ফসল থেকে খাজনা প্রদানের পর তার যা থাকে, সেটা হলো মুনাফা। এই মুনাফার সর্বোচ্চকরণে সে সচেষ্ট হয়। এই মডেলে সব সম্পর্কই চুক্তি ভিত্তিক সম্পর্ক। ভূস্বামী বা জমি মালিকের সঙ্গে কৃষি-উদ্যোক্তা বা ফার্মারের সম্পর্ক চুক্তিভিত্তিক; একইভাবে ফার্মারের সঙ্গে কৃষি শ্রমিকের সম্পর্কও চুক্তিভিত্তিক। এখানে প্রথা, নিয়ম, কিংবা নৈতিকতার স্থান নেই। তেমনি কেউ চুক্তি ভঙ্গ করলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আদালতের শরণাপন্ন হওয়ার বিধান রয়েছে। ফার্মার যদি দীর্ঘমেয়াদে জমি ব্যবহারের চুক্তি লাভ করেন, তবে তিনি জমির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন বিনিয়োগ সম্পাদনেও আগ্রহী হন।

লর্ড কর্নওয়ালিস যখন বাংলায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন করেন, তখন তিনি জমির উপর উপর্যুক্ত বাণিজ্যবাদী এবং বুর্জোয়া ধারণা দ্বারাই অগ্রসর হন। একটি নির্দিষ্ট খাজনার বিনিময়ে জমির উপর জমিদারদের নিরঙ্কুশ মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়। খাজনা অনাদায়ে "সান-সেট 'ল" তথা "সূর্যাস্ত আইনে"র অধীনে জমিদারী নিলামে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা হয়। সামন্ত ভারতের জন্য জমি নিয়ে এ ধরনের "বাণিজ্য" একটা অভাবনীয় বিষয় ছিল। স্বাভাবিকভাবেই নবাবী আমলে বিরাজমান বাংলার জমিদারদের – যাদের বেশিরভাগ ছিলেন

মুসলমান – এই নতুন পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাওয়াতে বেগ পেতে হয়। তদুপরি কোম্পানির রাজস্ব সর্বোচ্চ করার উদ্দেশ্যে জমিদারদের উপর আরোপিত খাজনা বেশ উচ্চহারেই নির্ধারিত হয়। এই উভয়বিধ কারণে এবং সূর্যাস্ত আইনের কঠোর প্রয়োগের ফলে ক্রমে ক্রমে পূর্বেকার জমিদারীসমূহ আংশিক কিংবা সম্পূর্ণভাবে নব্য ধনী বেনিয়া (ব্যবসায়ী) শ্রেণির হাতে চলে যেতে থাকে, যারা কিছুটা হলেও বাণিজ্যে পারদর্শী ছিল। শেষোক্তদের বেশিরভাগ ছিলেন হিন্দু। এভাবেই কালক্রমে বাংলার (বিশেষত পূর্ব বাংলার) মুসলমান কৃষক শ্রেণির উপর একটি মূলত হিন্দু জমিদার শ্রেণির উদ্ভব ঘটে।

কিন্তু নতুন বণিক-জমিদারেরা লর্ড কর্নওয়ালিসের উৎপাদনশীল বিনিয়োগে আগ্রহী ফার্মার হওয়ার পরিবর্তে (বৃটিশ-পূর্ব) সামন্তযুগের জমিদার হওয়ার প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হন এবং তাদের ভোগবিলাসী জীবনধারা অনুকরণের প্রয়াসে ব্যাপৃত হন। যেহেতু চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে জমিদারদের মালিকানাকে বুর্জোয়া, নিরঙ্কুশ ধরনের মালিকানা বলে গণ্য করা হয়েছিল, সেহেতু তাতে প্রজা তথা কৃষকদের প্রথাসম্মত অধিকারসমূহের তেমন কোন স্থান ছিল না। সে কারণে এবং পূর্ব-নির্দিষ্ট পরিমাণ খাজনা আদায়ের চাপের তাড়নায় নতুন জমিদারেরা উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির পরিবর্তে যথেচ্ছ প্রজা নিগ্রহ, অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক, আটক-নির্যাতন, ইত্যাদি করতে পারতেন এবং করতেন। ফলে কৃষক অসন্তোষ এবং বিদ্রোহ বেড়ে যায়।

পরিস্থিতি সামাল দেয়া এবং জমি সংক্রান্ত অধিকারের ক্ষেত্রে জমিদার ও প্রজার এই চরম বৈষম্যমূলক পরিস্থতির কিছুটা উপশমের লক্ষ্যে ১৮৮৫ সনে "বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন" পাশ হয়। এই আইনের মাধ্যমে জমির উপর প্রজাদেরও কিছু অধিকার স্বীকৃত হয়, এবং জমিদারদের স্বেচ্ছাচারী আচরণের উপর কিছু বিধি-নিষেধ আরোপিত হয়। অবশ্য ততোদিনে জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে প্রজারা জমির প্রয়োজনে জমিদারদের উপর এতটাই নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে যে, জমিদারদের আর বলপূর্বক প্রজাদের ধরে রাখার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা থাকে না। ফলে প্রজাস্বত্ত্ব আইনের কার্যকারীতা অনেকটা হ্রাস পায়।

অন্যদিকে প্রজাস্বত্ত্ব আইনের ফলে উপ-সামন্তকরণের প্রক্রিয়া আরও বেড়ে যায়।[২২] প্রত্যক্ষ কৃষকদের কাছ থেকে নিজেরা খাজনা আদায়ের পরিবর্তে জমিদারেরা বিভিন্ন মধ্যস্বত্ত্বভোগীর আশ্রয় গ্রহণ করেন। ফলে খোদ কৃষকের উপর শোষকবর্গের সংখ্যা বেড়ে যায়। তার সঙ্গে যোগ হয় মহাজনী শোষণ। সময় ও পরিমাণমতো খাজনা পরিশোধ করা এবং অন্যান্য প্রয়োজনে কৃষকেরা

ব্যাপকহারে ঋণগ্রস্থ হয়ে পড়ে এবং চড়া সুদ আদায়কারী মহাজনদের ফাঁসে আটকা পড়ে। অনেক ক্ষেত্রে জমিদার কিংবা জমির মধ্যস্বত্ত্বভোগকারীরা নিজেরাই মহাজনী ব্যবসায় নিয়োজিত ছিল। এই দ্বৈত শোষণের নিগড়ে পড়ে কৃষক-প্রজাদের জীবন বিষময় হয়ে ওঠে।

উপর্যুক্ত আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতির কারণেই শেরে-বাংলা আবুল কাশেম ফজলুল হক কর্তৃক জমিদারী বিলুপ্তি, জমি উপর প্রজার মালিকানা (অধিকার) প্রতিষ্ঠা, মহাজনী শোষণের হাত থেকে পরিত্রাণ, ইত্যাদি দাবি নিয়ে ১৯৩৫ সনে প্রতিষ্ঠিত "কৃষক-প্রজা পার্টি" বাংলায় জনপ্রিয়তা অর্জন করে।[২৩] ধর্ম-নির্বিশেষে কৃষক-প্রজার অধিকারের উপর গুরুত্ব দেয়ার কারণেই জিন্নাহর সঙ্গে ফজলুল হকের মতবিরোধ দেখা দেয়। ১৯৩৭ সনের নির্বাচনে কৃষক-প্রজা পার্টি আলাদাভাবে নির্বাচন করে এবং বঙ্গীয় বিধানসভায় ৩৬ আসন নিয়ে তৃতীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে জয়লাভ করে। (কংগ্রেস পায় ৫৪ আসন এবং মুসলিম লীগ পায় ৩৭ আসন।) এই নির্বাচনে কৃষক প্রজা পার্টির ২১-দফা কর্মসূচির অন্যতম ছিল জমিদারী ব্যবস্থা বিলুপ্ত করে জমির উপর কৃষকের অধিকার প্রতিষ্ঠা। ফজলুল হক প্রথমে কংগ্রেসের সঙ্গে কোয়ালিশন সরকার গঠনের চেষ্টা করেন। কিন্তু কেন্দ্রীয় কংগ্রেস তাতে অসম্মত হলে তিনি অগত্যা মুসলিম লীগ এবং অন্যান্য কিছু সংখ্যালঘু ও নিম্নবর্গীয় (শিডিউল কাস্ট) প্রতিনিধি দলের সঙ্গে মিলে ১৯৩৭ সনের ১লা এপ্রিল কোয়ালিশন সরকার গঠন করেন। মুসলিম লীগের সঙ্গে কৃষক প্রজা পার্টির বিরোধ, কৃষক প্রজা পার্টির অভ্যন্তরে বিভিন্ন উপদলীয় বিরোধ, কোয়ালিশনভুক্ত নিম্নবর্গীয় ও সংখ্যালঘু প্রতিনিধি দলের সঙ্গে বিরোধ, ইত্যাকার বিভিন্নমুখী বিরোধ দ্বারা এই কোয়ালিশন জর্জরিত ছিল। আরও ছিল কোয়ালিশনের বাইরে থেকে যাওয়া কংগ্রেস এবং বৃটিশ সদস্য এবং গভর্নরের বিভিন্নমুখী চাপ। এরমধ্যে ফজলুল হকের পক্ষে কাজ করা সহজ ছিল না। তা সত্ত্বেও কৃষক-প্রজাদের কল্যাণের লক্ষ্যে ফজলুল হক বেশ কিছু আশু এবং সুদূরপ্রসারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তার মধ্যে ছিল মহাজনী শোষণ থেকে মুক্ত করার জন্য প্রণীত "বঙ্গীয় কৃষি ঋণগ্রস্ত আইন (১৯৩৮)" এবং এই আইন বাস্তবায়নের জন্য বাংলার সকল অঞ্চলে "ঋণ শালিসী বোর্ড" গঠন; "অর্থ ঋণ আইন (১৯৩৮)" এবং "বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ত্ব (সংশোধন) আইন (১৯৩৮)"। শেষোক্ত আইন খাজনা বৃদ্ধি করার সকল বিধান দশ বছরের জন্য স্থগিত করে; রায়ত-প্রজাদের উপর জমিদারদের কর্তৃক আরোপিত সকল "আবওয়াব" ও "সেলামি" বাতিল করে; রায়তদের

কর্তৃক জমি হস্তান্তরের ক্ষেত্রে জমিদারকে প্রদত্ত হস্তান্তর ফী বাতিল করে। এই আইন অপরিশোধিত খাজনার উপর সুদের হার ১২.৫০ শতাংশ থেকে ৬.২৫ শতাংশে হ্রাস করে। রায়তেরা নদী সিকস্তি অধিকার লাভ করেন, যার ফলে তাঁরা নদী ভাংগণের পর থেকে বিশ বছরের মধ্যে চার বছরের খাজনা প্রদানপূর্বক নতুন জমিতে অধিকার প্রাপ্ত হন।[২৪]

কৃষকের দৃষ্টিকোণ থেকে ফজলুল হক সবচেয়ে যে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন তা হলো জমিদারী বিলুপ্তি সংক্রান্ত আইন প্রণয়নের লক্ষ্যে তিনি ১৯৩৮ সনের ৫ই নভেম্বর ফ্রান্সিস ফ্লাউডের নেতৃত্বে একটি কমিশন গঠন করেন, যা পরবর্তীকালে "ফ্লাউড কমিশন" নামে পরিচিতি লাভ করে। ১৯৪০ সনের ২১শে মার্চ ফ্লাউড কমিশন তার চূড়ান্ত প্রতিবেদন পেশ করে। কমিশনে মূল সুপারিশসমূহের মধ্যে ছিল চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত তথা জমিদারী প্রথা বাতিল এবং সকল প্রকার মধ্যস্বত্ত্বের বিলোপ সাধন।

মুসলিম লীগের সঙ্গে কোয়ালিশন সরকারের প্রধান থাকা অবস্থাতেই ফজলুল হক মুসলিম লীগের লাহোর সম্মেলনে যোগ দেন এবং ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এই প্রস্তাবে একাধিক রাজ্য (স্টেটস) সহকারে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য ঘোষিত হয়। কিন্তু ১৯৪১ সনে জিন্নাহর মতের বিরুদ্ধে যেয়ে ভাইসরয়ের ডিফেন্স কাউন্সিলে যোগ দিলে জিন্নাহ ফজলুল হককে মুসলিম লীগ থেকে বহিষ্কার করেন এবং তাঁর নেতৃত্বে গঠিত বাংলার কোয়ালিশন সরকার থেকে মুসলিম লীগের সমর্থন প্রত্যাহার করে নেন। ফলে ১৯৪১ সনের ২রা ডিসেম্বর তাঁর সরকারের পতন ঘটে। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে ১২ই ডিসেম্বর ফজলুল হক কংগ্রেস, ফরওয়ার্ড ব্লক, হিন্দু মহাসভা, কৃষক-প্রজা পার্টির শামসুদ্দিনের নেতৃত্বাধীন অংশ, এবং নিম্নবর্গের স্বতন্ত্র সদস্যদের সমবায়ে একটি নতুন সরকার গঠন করেন, যা "শ্যমা-হক" মন্ত্রিসভা হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। মুসলিম লীগ এই মন্ত্রীসভার তীব্র বিরোধীতায় অবতীর্ণ হয়। দেশীয় ও বিদেশি ব্যবসায়ী মহলও বিরোধী ভূমিকা পালন করে। বাংলার তদানীন্তন গভর্নর স্যার জন হারবার্টের নিকট স্বাধীনচেতা ফজলুল হকের পরিবর্তে খাজা নাজিমুদ্দিনকেই বেশি পছন্দনীয় মনে হয়। ফলে সংবিধানের ৯৩ অনুচ্ছেদের ধারাবলে গভর্নরের আদেশে ১৯৪৩ সনের ১৮শে মার্চ ফজলুল হকের দ্বিতীয় মন্ত্রীসভার পতন ঘটে এবং এপ্রিল মাসে খাজা নাজিমুদ্দিনের নেতৃত্বে নতুন মন্ত্রীসভা গঠিত হয়। ফ্লাউড কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়নে ফজলুল হকের পক্ষে সে পর্যায়ে আর কিছু করা সম্ভব হয় না।

উদ্ভূত পরিস্থিতিতে ১৯৪৩-১৯৪৬ সময়কালে ফজলুল হক পাকিস্তান আন্দোলনের বিরোধিতা করেন। কিন্তু বাংলার মুসলমান প্রজারা তখন জমিদারদের শোষণমুক্ত হওয়ার জন্য পাকিস্তান প্রতিষ্ঠাকেই উপযোগী উপায় হিসেবে দেখেন এবং বিপুলভাবে পাকিস্তান আন্দোলনের পক্ষে সমবেত হন। ১৯৪৬ সনে নতুন নির্বাচনে মুসলিম লীগ মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত ১১৭ আসনের মধ্যে ১১০ আসনে জয়লাভ করে। বিপরীতে ফজলুল হকের কৃষক-প্রজা পার্টি মাত্র চারটি আসন পায়, তার মধ্যে দুটি ছিল তাঁর নিজের। সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে নতুন মুসলিম লীগ সরকার গঠিত হয়। ফজলুল হক একা হয়ে পড়েন। অগত্যা ১৯৪৬ সনে সেপ্টেম্বরে তিনি পুনরায় মুসলিম লীগে যোগ দেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়া এগিয়ে যায়।

কিন্তু জমিদারী বিলুপ্তির যে প্রক্রিয়া ফ্লাউড কমিশন গঠনের মাধ্যমে ফজলুল হক সূচনা করেন, তা পাকিস্তান আন্দোলনের ফলে কিছুটা চাপা পড়ে গেলেও বহমান থাকে। ১৯৪৪ সনে গঠিত প্রশাসনিক তদন্ত কমিটি ফ্লাউড কমিশনের সুপারিশের প্রতি জোর সমর্থন জানায়। কিন্তু নাজিমুদ্দিনের নেতৃত্বাধীন মুসলিম লীগ সরকার এ বিষয়ে তেমন উদ্যোগ গ্রহণ করে না। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, ১৯৪৩ সনের দুর্ভিক্ষ, ইত্যাদি এ বিষয়ে মনোযোগে বাধা সৃষ্টি করে। তদুপরি মুসলিম লীগের নাজিমুদ্দিনের নেতৃত্বাধীন অংশের অনেকে নিজেরাই জমিদার ছিলেন এবং ফলে জমিদারী বিলুপ্তির বিরুদ্ধে ছিলেন। ১৯৪৬ সনে সোহরোয়ার্দীর নেতৃত্বে গঠিত মুসলিম লীগ সরকার এই সুপারিশ বাস্তবায়নের পক্ষে ছিল। বস্তুত এই সরকারের সময়ই ১৯৪৭ সনের ১০ই এপ্রিল "বঙ্গীয় স্টেট একুইজিশন এন্ড টেন্যান্সী" বিল উত্থাপিত হয়। কিন্তু পাকিস্তান আন্দোলন এবং অবশেষে দেশ-বিভাগ, ইত্যাদি কারণে এই বিলের আইনে পরিণত হওয়া এবং তার বাস্তবায়ন স্থগিত থাকে।

৫.২ পাকিস্তান আমল

দেশ বিভাগের পর ১৯৪৭ সনের "বেঙ্গল স্টেট একুইজিশন এন্ড টেন্যান্সী" বিলকে "ঈস্ট বেঙ্গল স্টেট একুইজিশন এন্ড টেন্যান্সী বিল" নামে পুনর্বিন্যস্ত করে ১৯৪৮ সনের ৩১শে মার্চ প্রকাশিত করা হয় এবং আইনসভার বিশেষ কমিটির নিকট পাঠানো হয়। ১৯৫১ সনের ১৬ই মে এই বিল আইনে পরিণত হয়। বেশিরভাগ হিন্দু জমিদারদের ভারতে অভিগমন এই আইন পাশ করাকে সহজ করে দেয়। সাধারণভাবে "জমিদারী উচ্ছেদ আইন" বলে

পরিচিত এই আইনে খোদ কৃষকদের "মালিক" বলে অভিহত করা হয়; এবং সরকার বা রাষ্ট্রকে রাজস্ব বা জমি-খাজনার একমাত্র দাবিকারী হিসেবে ঘোষণা করা হয়। সকল মধ্যস্বত্ত্ব বাতিল করা হয়। জমিদার ও অন্যান্য মধ্যস্বত্ত্বভোগকারীদের ক্ষতিপূরণ দেয়া হয়। তবে বর্গা প্রথা বাতিল হয় না।[২৫]

লক্ষণীয় যে, এই আইনে আরও ছিল ১০০ বিঘা জমি সিলিং। কিন্তু সেটা তখন বাস্তবায়িত হয় না। ১৯৫৪ সনে যুক্তফ্রন্টের ২১-দফা নির্বাচনী কর্মসূচির মধ্যে ১০০ সিলিংয়ের দাবিটি অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। কিন্তু যুক্তফ্রন্ট সরকারকে অচিরেই উচ্ছেদ করা হয়। আইয়ুব খানের আমলে সিলিং ৩৬৫ বিঘায় উন্নীত হয়। ফলে পাকিস্তান আমলে কার্যত কোন ভূমি সংস্কার বাস্তবায়িত হয় না। ১৯৭০ সনে আওয়ামী লীগের কর্মসূচিতে ১০০ বিঘা সিলিং পুনরায় অন্তর্ভুক্ত হয়। এভাবেই কৃষকের প্রশ্নটি স্বাধীন বাংলাদেশে পৌঁছায়। এই ইতিহাস থেকে বোঝা যায় যে, আওয়ামী লীগের ১৯৭০ সনের নির্বাচনে ১০০ বিঘা জমি সিলিংয়ের অন্তর্ভুক্তি কোন নতুন বিষয় ছিল না। তা বরং তিরিশের দশকে ফজলুল হক সূচিত সংস্কারেরই একটি অসমাপ্ত অংশ ছিল।

৫.৩ স্বাধীনতার পর – বঙ্গবন্ধু আমল

স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধু ২৫ বিঘা পর্যন্ত খাজনা মওকুফের পাশাপশি ১০০-বিঘা জমি সিলিং কার্যকর করারও উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এ উদ্দেশ্যে ১৯৭২ সনের ১৪ই আগস্ট "বাংলাদেশ রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ এবং ভূমিস্বত্ব (তৃতীয় সংশোধনী) আদেশ (রাষ্ট্রপতি আদেশ নং ৯৬)" – ইংরাজিতে, বাংলাদেশ এস্টেট একুইজিশন এন্ড টেন্যান্সী (থার্ড এমেন্ডমেন্ট) অর্ডার) – জারি হয়। এই আদেশবলে ২৫ বিঘা পর্যন্ত খাজনা মওকুফ করা হয়। ১৯৭২ সনের ১৫ই আগস্ট "বাংলাদেশ জমি মালিকানা (সীমাবদ্ধকরণ) আদেশ (রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ৯৮)" – ইংরাজিতে, বাংলাদেশ ল্যান্ডহোল্ডিংস (লিমিটেশন) অর্ডার) – জারি হয়। এই আদেশবলে জমি মালিকানার উপর ১০০ বিঘা সিলিং আরোপিত হয়। এই আদেশ অমান্যকারীদের ছয় বছর কারাদণ্ড অথবা ১০,০০০ টাকা জরিমানা অথবা উভয় দন্ডে দণ্ডিত করার বিধান রাখা হয়। এসব আইন জারির আগেই ১৯৭২ সনে ৯ই মে রাজশাহী শহরে দেয়া পূর্বোল্লিখিত ভাষণে বঙ্গবন্ধু বলেন,

> কোনো লোক একশ বিঘার উপর জমি রাখতে পারবে না। এতে যে জমি উদ্বৃত্ত হবে, তা ভূমিহীন গরীবের মধ্যে বিলি করে দেয়া হবে। খাস-মহলের জমি গরীবকে ছাড়া কাকেও দেয়া হবে না (সেলিম, ২০১৬)।

লক্ষণীয়, ভূমি সংস্কারের ইস্যুতে ১৯৭২ সনের সিলিং আদেশ ১৯৫০ সনের জমিদারী উচ্ছেদ আইনের তুলনায় দৃঢ় ছিল। ১৯৫০-এর আইনে শুধুমাত্র অবিবাহিত সন্তানদের পরিবারের সদস্য হিসেবে গণ্য করা হয়েছিল। বিপরীতে ১৯৭২ সনের আদেশে পরিবারের সংজ্ঞা নির্ধারিত হয়েছিল নিম্নরূপ

> কোনো ব্যক্তি, তার স্ত্রী, পুত্র, অবিবাহিত কন্যা, পুত্রবধূ, পুত্রের পুত্র (দৌহিত্র), এবং পুত্রের অবিবাহিত কন্যা।[২৬]

অর্থাৎ, বিবাহিত-অবিবাহিত নির্বিশেষে সকল পুত্রদের পরিবারের অন্তর্ভুক্ত বলে ধরা হয়েছিল। বলাবাহুল্য, পরিবারের এরূপ প্রসারিত সংজ্ঞার ফলে বেশি উদ্বৃত্ত জমি পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল। অনুমিত হয়েছিল যে, এই সিলিং বাস্তবায়িত হওয়ার ফলে ১২ লক্ষ একর জমি উদ্বৃত্ত পাওয়া যাবে। উদ্বৃত্ত জমি ভূমিহীন এবং ১.৫ একরের কম জমিসম্পন্ন পরিবারদের মধ্যে বিতরণ করার কথা ছিল। আরেকটি যে দিকে ১৯৭২ সনের আইন অগ্রসর চরিত্রের ছিল, তা হলো উদ্বৃত্ত জমি বিতরণের ক্ষেত্রে কোনো সেলামীর দাবি না করা। ১৯৫০ সনের আইনের সূত্রে যেটুকু জমির পুনর্বিতরণ সংঘটিত হয়েছিল, তাতে জমি পাওয়ার জন্য সেলামি প্রদানের বিধান ছিল। এসব বিভিন্ন অগ্রসরতা সত্ত্বেও, মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী ১৯৭২ সনের বিপ্লবী পরিস্থিতিতে অনেকের নিকট ১০০ বিঘা সিলিং অনেক উঁচু বলে প্রতিভাত হয়েছিল, এবং তাদের অনেকে ১০ একর তথা ৩৩ বিঘা সিলিংয়ের দাবি করেছিলেন।

বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে সাড়া দিয়ে কিছু জমি মালিকেরা উদ্বৃত্ত জমি সরকারের নিকট জমাও দেন। কিছু খাস জমি বিতরিতও হয়। কিন্তু দ্রুতই ১০০ বিঘা সিলিং কার্যকর করা সংক্রান্ত বঙ্গবন্ধুর উদ্যোগের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে ওঠে। আওয়ামী লীগের ভেতর থেকেই মূলত এই প্রতিরোধ দেখা দেয়। তখনকার সময়ে আওয়ামী লীগের জাতীয় এবং স্থানীয় পর্যায়ের নেতৃত্বের একটি বড় অংশ এবং ১৯৭০ এবং ১৯৭৩ সনে নির্বাচিত আওয়ামী লীগের সাংসদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন ধনী কৃষক, যাদের মোট জমির পরিমাণ ১০০ বিঘার বেশি ছিল। তারা বঙ্গবন্ধুর ভূমি-সংস্কার কর্মসূচির বিরোধিতা করেন। বিবাহিত পুত্রদের আলাদা পরিবার গণ্য না করাকে তাঁরা অযৌক্তিক মনে করেন। এই

অভিমতের পেছনে তারা বিভিন্ন যুক্তি দেখান। বিবাহিত পুত্রদের স্ত্রীদের পৈত্রিকসূত্রে প্রাপ্ত জমি শশুরের জমির হিসাবের মধ্যে অন্তর্ভুক্তির ন্যায্যতা সম্পর্কে তাঁরা প্রশ্ন তোলেন। তাঁরা জমি সংক্রান্ত ঘোষণাপত্র জমা দেয়ার সময়ের স্বল্পতার অভিযোগও তোলেন। ১৯৭৩ সনের শেষ পর্যন্ত মাত্র ৯০০ একর জমি বিতরিত হয়। ১৯৭৫ অবধি মাত্র ৫,৩৭১ পরিবার জমি উদ্বৃত্ত দেখিয়ে ঘোষণাপত্র জমা দেন এবং সে অনুযায়ী উদ্বৃত্ত জমির পরিমাণ দাঁড়ায় মাত্র ৭৬,৭১২ একর।

এই হতাশাকর ফলাফল এবং দলীয় সাংসদ এবং অন্যান্যদের অব্যাহত প্রতিরোধের মুখে বঙ্গবন্ধু পুনর্বিতরণমূলক ভূমি সংস্কারের ইস্যুতে পিছু হটতে বাধ্য হন। প্রথমে একটি নির্দিষ্ট তারিখের আগে বিবাহিত এবং আলাদা সংসার স্থাপন করা পুত্রদের পিতার পরিবারে অন্তর্ভুক্ত না করার মাধ্যমে একটি সমঝোতা খোঁজার চেষ্টা হয়। পরে এই তারিখ আরও নিকটবর্তী করা হয়। অবশেষে পরিবারের যে অগ্রসর সংজ্ঞা ১৯৭২ সনে গৃহীত হয়েছিল তা সংশোধন করে মূলত ১৯৫০ সনের আইনে গৃহীত সংজ্ঞায় ফিরে যাওয়া হয়। অত:পর সকল বিবাহিত পুত্র সন্তানেরা পৃথক পরিবার হিসেবে গণ্য হন। ফলে পিতার সম্পত্তি বিবাহিত পুত্রদের মধ্যে ভাগ করে দেয়ার মাধ্যমে অধিকাংশ বড় জমি মালিকেরা ১০০ বিঘা সিলিং এড়াতে সমর্থ হন।

প্রণিধানযোগ্য, ১৯৭৩/১৯৭৪ সনের এই পশ্চাদাপসারণের কিছুকাল পরই বঙ্গবন্ধু আবার ১৯৭৫ সনে যৌথচাষ সম্বলিত সমবায়ী গ্রামের কর্মসূচি দেন। এটা কীভাবে সম্ভব হলো? যৌথচাষের কর্মসূচি আপাতঃদৃষ্টিতে পুনর্বিতরণমূলক ভূমি সংস্কারের কর্মসূচির চেয়ে আরও অগ্রসর কর্মসূচি। অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর কর্মসূচি বাস্তবায়নে অপারগ হয়ে কীভাবে বঙ্গবন্ধুর পক্ষে আরও অগ্রসর, যৌথচাষ ভিত্তিক সমবায়ী গ্রামের প্রস্তাব করা সম্ভব হলো? বাংলাদেশের গ্রামের বাস্তবতা উন্মোচন এবং আগামীতে অগ্রসর হওয়ার মূল সূত্র এই প্রশ্নের উত্তরের মধ্যেই নিহিত আছে।

এ প্রসঙ্গে লক্ষণীয়, যেমনিভাবে পুনর্বিতরণমূলক ভূমি সংস্কারে অপারগ হয়ে বঙ্গবন্ধু যৌথচাষ সম্বলিত সমবায়ী গ্রামের প্রস্তাবে উপনীত হয়েছিলেন, তেমনিভাবে বহু খ্যাতনামা অর্থনীতিবিদও বাংলাদেশে ভূমি সংস্কারের প্রস্তাব করতে যেয়ে অবশেষে যৌথ চাষাবাদের প্রস্তাবে পৌঁছেছিলেন। অর্থনীতিবিদদের অনুরূপ এই যাত্রা সে অর্থে বঙ্গবন্ধুর উপর্যুক্ত যাত্রার সমান্তরাল। কিন্তু যেখানে বঙ্গবন্ধুর যাত্রার সাক্ষাৎ কারণ ছিল রাজনৈতিক,

অর্থনীতিবিদদের অনুরূপ যাত্রার সাক্ষাৎ কারণ ছিল অর্থনৈতিক। আগামীতে গ্রামের সম্ভাব্য সমবায়ী রূপান্তর সম্পর্কে আলোচনার জন্য অর্থনীতিবিদদের এই যাত্রার কার্য-কারণ একটু বিস্তারিত লক্ষ্য করা প্রয়োজন। পরবর্তী কয়েকটি অনুচ্ছেদে আমরা তারই চেষ্টা করবো।[২৭] প্রথমে আমরা লক্ষ্য করবো ভূমি সংস্কারের পক্ষে তাঁদের মূল যুক্তিগুলো কী ছিল।

৬. ভূমি সংস্কারের পক্ষে যুক্তিসমূহ

স্বাধীনতার পর ভূমি সংস্কার একটি বহুল আলোচিত বিষয় ছিল। বস্তুত, সেসময় বাংলাদেশে এমন অর্থনীতিবিদ পাওয়া দুষ্কর ছিল, যিনি ভূমি সংস্কারের পক্ষে যুক্তি রাখেন নি।[২৮] এই ব্যাপক এবং বহুধা আলোচনা থেকে বাংলাদেশের পরিস্থিতিতে ভূমি সংস্কারের পক্ষে মূল যে যুক্তিগুলো বেড়িয়ে আসে তা নিম্নরূপ।

প্রথমত, অর্থনীতিবিদেরা কৃষি জোতের আকার (সংক্ষেপে, জোতাকার) এবং জমির উৎপাদনশীলতার মধ্যে একটি বিপরীত সম্পর্ক লক্ষ্য করেছিলেন। বিভিন্ন গবেষণা থেকে দেখা গিয়েছিল যে, ক্ষুদ্রাকার জোতের বিঘা-প্রতি উৎপাদন বৃহদাকার জোতের তুলনায় বেশি। এ থেকে যুক্তি প্রতিষ্ঠিত হয় যে, বড় জোতের মালিকদের কাছ থেকে জমি স্বল্প জোতের পরিবারদের নিকট হস্তান্তরিত হলে মোট উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। একই ধারার পরিলক্ষণ ছিল বর্গার ক্ষেত্রে। গবেষণায় দেখা যায় যে, একই কৃষকের নিজ জমির উৎপাদনশীলতা বর্গা জমির উৎপাদনশীলতার তুলনায় বেশি। ফলে এই সূত্রে বর্গা সংস্কারের পক্ষেও যুক্তি পাওয়া যায়।

উৎপাদন বৃদ্ধির দৃষ্টিকোণ থেকে ভূমি সংস্কারের পক্ষে উপর্যুক্ত যুক্তিকে বলা যায় "প্রত্যক্ষ" এবং "মাইক্রো" সংযোগ সঞ্জাত যুক্তি। সে তুলনায়, উৎপাদন বৃদ্ধির দৃষ্টিকোণ থেকে ভূমি সংস্কারের পক্ষে দ্বিতীয় যুক্তিকে বলা যেতে পারে "পরোক্ষ" অথবা "ম্যাক্রো" সংযোগ সঞ্জাত যুক্তি। সেটা হলো এই যে, ভূমি সংস্কারের ফলে বিতরণ অধিকতর সুষম হবে; দরিদ্রদের আয় ও ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। গবেষণা থেকে দেখা যায়, ধনীদের তুলনায় দরিদ্রদের চাহিদা দেশজ পণ্য ও সেবার দিকে বেশি নিবদ্ধ হয়। সুতরাং, তাদের আয় ও ক্রয়ক্ষমতার বৃদ্ধি দেশজ উৎপাদনের বাজার সম্প্রসারিত করবে। ফলে বর্তমানে বাজার সংকীর্ণতার কারণে দেশজ উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে যেসব বাঁধার সৃষ্টি হচ্ছে, তা দূরীভূত হবে।

ভূমি সংস্কারের পক্ষে তৃতীয় যুক্তিটিও উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যের সঙ্গে পরোক্ষভাবে সম্পর্কিত; তবে পরোক্ষতার প্রকৃতি এখানে কিছুটা ভিন্ন। এখানে উপলব্ধিটা হলো, গ্রামের অসম জমি মালিকানার একটা বৃহত্তর নেতিবাচক প্রতিফল আছে; কেননা অসম জমি মালিকানার ফলে গ্রামের জমি, শ্রম, এবং ঋণ বাজারের উপরও গ্রামের ধনীদের নিয়ন্ত্রণ কায়েম হয়। কাজ, বর্গা-জমি, কিংবা ঋণ – সব কিছুর জন্যই গরীবদের গ্রামের অবস্থাপন্নদের শরণাপন্ন হতে হয়। ফলে অসম জমি মালিকানার সূত্রে "অসম ক্ষমতা কাঠামো"র উদ্ভব ঘটে। গ্রামের জীবনের উপর ধনীদের এরূপ প্রভুত্বের কারণে গ্রামের দরিদ্রদের জন্য উন্নয়নমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়িত করা কঠিন হয়ে পড়ে; কারণ অবস্থাপন্নদের ক্ষমতাবলয় ভেদ করে এসব কার্যক্রমের সুফল গরীবদের নিকট পৌঁছায় না। বরং প্রভাবশালীরাই এসব সুফল বহুলাংশে আহরণ করে, এবং তাদের ক্ষমতা বলয় আরও দৃঢ় হয়ে ওঠে। সে কারণে ভূমি সংস্কারের মাধ্যমে জমি মালিকানা বিতরণ সুষম করা গেলে গ্রামের ক্ষমতা কাঠামো অপেক্ষাকৃত সমতাধর্মী হবে, এবং তার ফলে উন্নয়ন সুগম হবে।

ভূমি সংস্কারের পক্ষে চতুর্থ যুক্তি হলো বিনিয়োগ অথবা উদ্বৃত্ত ব্যবহার ধরনের সূত্রে। এই যুক্তিটি ভূমি সংস্কারের পক্ষে উপর্যুক্ত প্রথম যুক্তির সঙ্গে সম্পর্কিত। এখানে বক্তব্যটি নিম্নরূপ। গবেষণা থেকে দেখা যায়, যদিও ধনীদের তুলনায় দরিদ্রদের মোট উদ্বৃত্তের পরিমাণ কম, কিন্তু এই উদ্বৃত্তের কতটা কৃষিতে উৎপাদনশীল বিনিয়োগে নিয়োজিত হচ্ছে, সে অনুপাত দরিদ্রদের বেশি। বিপরীতে, ধনীদের উদ্বৃত্তের অপেক্ষাকৃত বেশি অংশ ব্যয়িত হয় বিভিন্ন অনুৎপাদনশীল খাতে, প্রদর্শনীমূলক ভোগে, কিংবা হস্তান্তরমূলক ব্যয়ে। সুতরাং, এসূত্রেও একটি যুক্তি বেড়িয়ে আসে যে, যদি পুনর্বিতরণমূলক ভূমি সংস্কারের মাধ্যমে ছোটদের হাতে উদ্বৃত্ত বাড়ানো যায়, তাহলে কৃষি এবং সামগ্রীকভাবে উৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগ আরও বৃদ্ধি পাবে।

প্রসংগক্রমে বলা দরকার, জোতাকার এবং জমি-উৎপাদনশীলতার মধ্যকার উপরিল্লিখিত বিপরীত সম্পর্কটি উচ্চ ফলনশীল (উফশী) বিভিন্ন ফসল চাষের গতিশীল পরিস্থিতির জন্য প্রযোজ্য হবে কিনা সে বিষয়ে একটি উদ্বেগ প্রকাশিত হয়েছিল। লক্ষ্য করা হয়েছিল যে, জোতাকার এবং জমি-উৎপাদনশীলতার মধ্যকার বিপরীত সম্পর্কটির মূল কারণ চাষকাজে নিয়োজিত শ্রমের তারতম্যের মধ্যে নিহিত। যেহেতু জমির তুলনায় শ্রম লভ্যতা ছোট কৃষকের বেশি, সেহেতু সে বেশি শ্রম দিয়ে তার জমি চাষ করে। অনেক

সময় দেখা যায়, বর্ধিত উৎপাদনের আশায় সে অধিক শ্রম-ঘন ফসল চাষ করে। কিন্তু উফশী চাষের ক্ষেত্রে সার, সেচ, কীটনাশক ঔষধ, প্রভৃতি নগদ মূল্যে ক্রয়সাপেক্ষ উপকরণের, তথা পুঁজির ভূমিকা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দেখা দেয়। ছোট কৃষকদের জমি অনুপাতে পারিবারিক শ্রম সরবরাহ বেশি থাকলেও, তাদের পুঁজি নেই বা কম। সুতরাং ছোট কৃষকেরা উফশী চাষের সুযোগ গ্রহণ করে উৎপাদন বৃদ্ধিতে সক্ষম হবে কিনা, সে বিষয়ে সংশয় ছিল।

কিন্তু গবেষণা থেকে দেখা যায়, পুঁজি লভ্যতার দৃষ্টিকোণ থেকে প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেও ছোট কৃষকেরা উফশী চাষে অংশ গ্রহণ করে উৎপাদন বৃদ্ধির প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন। গতিশীল পরিস্থিতির প্রতি তাদের এই সাড়া অনেক গবেষকের বেশ বিস্ময়েরও উদ্রেক করে। দেখা যায়, নতুন প্রযুক্তি প্রবর্তনের বিভিন্ন সূচক – তথা উফশী, সেচ, সার, প্রভৃতি ব্যবহারের – বিচারে ছোট কৃষকেরাই বরং বেশি অগ্রসর। এ থেকে অনুমিত হয় যে, যদি ভূমি সংস্কারের মাধ্যমে ছোটদের হাতে আরও বেশি জমি পৌঁছানো যায়, তাহলে সার্বিকভাবে দেশে উফশী প্রসারের মাত্রা এবং ফলে মোট উৎপাদন আরও বেশি বৃদ্ধি পাবে।

এটা ঠিক যে, ক্ষুদ্র ঋণের প্রসার গ্রামের দরিদ্রদের পুঁজি লভ্যতা বৃদ্ধি করেছে, কেননা এই ঋণ প্রাপ্তির জন্য জমি অথবা অন্য কোন সম্পদ বন্ধকী দেয়ার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু ঋণের পরিমাণের স্বল্পতা, উচ্চ সুদের হার, এবং তাৎক্ষণিকভাবে পরিশোধের প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার বিধান, ইত্যাদি কারণে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধিতে ক্ষুদ্র ঋণের ভূমিকা সীমাবদ্ধ থেকে গিয়েছে। এদিকে অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানিক সূত্রের ঋণ প্রাপ্তির জন্য বন্ধকীর প্রয়োজনীয়তা অব্যাহত আছে, এবং তা দরিদ্র ও বর্গাচাষিদের ঋণ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। এদিক থেকেও পুনর্বিতরণমূলক ভূমি সংস্কার কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়ক হতে পারে, কেননা তা ছোট কৃষকদের কর্তৃক প্রাতিষ্ঠানিক সূত্রের ঋণ প্রাপ্তিকে সুগম করবে। গবেষণা থেকে দেখা যায়, প্রাতিষ্ঠানিক সূত্র থেকে প্রাপ্ত ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে বড়দের তুলনায় ছোটদের আচরণই বেশি সন্তোষজনক। ক্ষুদ্র ঋণের অভিজ্ঞতাও দেখায় যে, উপযুক্ত পরিবেশে গ্রামের দরিদ্ররাও বিনিয়োগের সুযোগ গ্রহণে আগ্রহী এবং ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রেও প্রশংসনীয় দায়িত্বশীলতার পরিচয় দেয়।

উপরের আলোচনা দেখায় যে, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং সমতা, উভয় দৃষ্টিকোণ থেকেই বাংলাদেশে ভূমি সংস্কার প্রয়োজন। কিন্তু আমরা লক্ষ্য করেছি, তা সত্ত্বেও বাংলাদেশে আজ পর্যন্ত কোন কার্যকর ভূমি সংস্কার সম্পাদিত হতে পারে নি। কী এর কারণ? ভূমি সংস্কারের পক্ষে প্রবল যুক্তি থাকা

সত্ত্বেও তা বাস্তবায়িত হচ্ছে না কেন? ঘনিষ্ঠ বিচারে দেখা যায় যে, বাংলাদেশে ভূমি সংস্কারের পথে দুই ধরনের সমস্যা বিরাজমান। একটি হলো জমি-স্বল্পতার সমস্যা। অন্যটি হলো প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক শক্তি-ভারসাম্যের সমস্যা। প্রথমে জমি-স্বল্পতা সমস্যার দিকে নজর দেয়া যাক।

৭. ভূমি সংস্কারের পথে জমি স্বল্পতার সমস্যা

বাংলাদেশে ভূমি সংস্কারের পথে একটি বড় সমস্যা হলো জমি স্বল্পতা। অর্থাৎ, জনসংখ্যার তুলনায় আবাদী জমির পরিমাণ এতই কম যে, সিলিং আরোপের মাধ্যমে যে উদ্বৃত্ত জমি পাওয়া যাবে, তা দিয়ে সকল ভূমি-স্বল্প ও ভূমিহীন পরিবারকে প্রয়োজনীয় জমি দেয়া সম্ভব নয়।

এখানে কার্যক্ষম জোতের (ভায়াবল ফার্মসাইজ), অর্থাৎ স্বতন্ত্র গৃহস্থী পরিচালনা সম্ভব, এরূপ জোতের নিম্নতম আকারের প্রশ্ন প্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে। এ প্রশ্নটি বিতর্কিত, কেননা এক্ষেত্রে বিভিন্ন মাপকাঠি হতে পারে। তার একটি হলো পরিবারের খাদ্য চাহিদা; অর্থাৎ জোত থেকে পরিবারের ভরণপোষণের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্যোৎপাদন সম্ভব কিনা। আরেকটি মাপকাঠি হতে পারে পরিবারে লভ্য শ্রমশক্তি; অর্থাৎ পরিবারের নিজস্ব শ্রমশক্তি দ্বারা কতোটা জমি চাষ করা সম্ভব। আরেকটি মাপকাঠি হতে পারে প্রযুক্তিগত। যেমন, এক জোড়া বলদ এবং হাল দিয়ে যেটুকু জমিতে স্বচ্ছন্দে কৃষিকাজ করা যায়, সেটাকেই ন্যূনতম কার্যক্ষম জোতাকার বলে ধরা হোক, এরূপ একটি অভিমতও বাংলাদেশে প্রচলিত আছে।

লক্ষণীয়, কার্যক্ষম জোতের আকার একটি নির্দিষ্ট সময়ে স্থান-ভেদে ভিন্ন হতে পারে। আবার তা একই স্থানে সময়-ভেদে ভিন্ন হতে পারে। প্রথমটি খুবই বোধগম্য, কারণ দেশের সবস্থানে জমির উর্বরতা এক নয়; এলাকা ও উচ্চতা ভেদে জমিতে কয়টি ফসলের আবাদ করা সম্ভব তার সংখ্যাও ভিন্ন হয়। অন্যদিকে কোনো নির্দিষ্ট স্থানেও সময়ভেদে পরিস্থিতি বদলে যেতে পারে। যেমন উফশী প্রচলনের আগে কোনো এলাকার একটি পরিবারের খাদ্য চাহিদা পূরণের জন্য অথবা পরিবারের সদস্যদের শ্রম নিয়োজন নিশ্চিত করার জন্য যতখানি জমি প্রয়োজন, উফশী প্রচলনের পর তা কম হওয়ার সম্ভাবনা। একইভাবে, আগে যে এলাকা এক ফসলী ছিল, সেচের প্রবর্তনের পর সে এলাকাই বহু ফসলী হয়ে যেতে পারে, ফলে কার্যক্ষম জোতের ন্যূনতম আকার

কমে যেতে পারে। অন্যদিকে, সময়ে কৃষক পরিবারের নিজস্ব খাদ্য চাহিদা এবং শ্রমশক্তিও পরিবর্তিত হতে পারে। জোতাকার সংক্রান্ত প্রযুক্তিগত মাপকাঠি-প্রসূত সুপারিশও বদলে যেতে পারে। যেমন, বর্তমানে বাংলাদেশে বিভিন্ন স্থানে হাল-বলদ দিয়ে চাষের পরিবর্তে পাওয়ার টিলার, তথা যন্ত্র দিয়ে চাষের প্রচলন ঘটছে। সুতরাং, প্রযুক্তিগত জোতাকার এখন ভিন্ন হবে অথবা ভিন্নভাবে দেখা প্রয়োজন হবে।

ন্যূনতম কার্যক্ষম জোতাকার নির্ণয়ের এসব বিভিন্ন খুঁটিনাটি দিক নিয়ে মতভেদ থাকলেও এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, যদি প্রকৃতই ভূমি সংস্কারের মাধ্যমে দেশে স্ব-মালিকানা ভিত্তিক গৃহস্থ অর্থনীতি উৎসাহিত করতে হয়, তাহলে ভূমিহীন ও ভূমিস্বল্প পরিবারদের মধ্যে অন্তত সেটুকু পরিমাণে জমি বিতরণ করা দরকার, যাতে বিতরণের পর তারা ন্যূনতম জোতাকারের অধিকারী হয়।

এ সূত্রেই সমস্যা দেখা দেয়। দেশের অর্থনীতিবিদেরা বিভিন্ন সময়ে ভূমি সংস্কার বিষয়ে হিসাব কষার চেষ্টা করেছেন। অর্থাৎ, সিলিং কত হলে কতটা পরিমাণ উদ্বৃত্ত জমি পাওয়ার সম্ভাবনা; ন্যূনতম কার্যক্ষম জোতাকার কতো হতে পারে; এর নীচে ভূমিস্বল্প এবং ভূমিহীন পরিবারের সংখ্যা কতো; প্রাপ্ত উদ্বৃত্ত জমি দিয়ে তাদের কতজনকে কি পরিমাণ জমি দেয়া সম্ভব; সেসবের বিভিন্ন অনুমান তাঁরা পরিবেশন করেছেন।

সত্তর দশকে ফা'ল্যান্ড, পারকিনসন, নূরুল ইসলাম, স্তেপানেক, আবু আব্দুল্লাহ, প্রমুখ অর্থনীতিবিদ এ ধরনের কিছু হিসাব উপস্থিত করেছিলেন। তাঁদের এসব হিসাব ছিল মূলত ষাটের দশকের পরিসংখ্যান ভিত্তিক। বলাবাহুল্য, তখন ভূমিহীন পরিবারের সংখ্যা এখনকার তুলনায় অনেক কম ছিল। এতদসত্ত্বেও তখনই তাঁদের পুনর্বিতরণমূলক ভূমি সংস্কারের হিসাব মিলাতে খুবই বেগ পেতে হয়েছিল। লক্ষ্য করা যেতে পারে, সে সময় বাংলাদেশে ন্যূনতম কার্যক্ষম জোতাকার সম্বন্ধীয় অনুমান সাধারণভাবে ১.৬৭ থেকে ২.৫ একর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কেউ কেউ (যেমন, জোসেফ স্তেপানেক) মূলত এক একরের ভিত্তিতে পুনর্বিতরণের হিসেব করার চেষ্টা করেছেন। তা সত্ত্বেও তাঁরা কেউই পুনর্বিতরনের হিসাব মেলাতে পারেন নি।[২৯] ফলে বাংলাদেশে পুনর্বিতরণমূলক ভূমি সংস্কারের পথে জমি স্বল্পতা একটি অনতিক্রম্য বাঁধা বলে প্রতিভাত হয়েছে। প্রশ্ন উঠেছে, এই পরিস্থিতিতে বিকল্প কী হতে পারে?

৭.১ *স্বল্প-পরিধির জমি পুনর্বিতরণ*

ভূমি সংস্কার প্রশ্নে জমি স্বল্পতার সমস্যার সম্মুখীন হয়ে গবেষকেরা যেসব বিভিন্ন প্রস্তাব করেছেন, তার মধ্যে এক ধরনের প্রস্তাবকে "স্বল্প-পরিধির পুনর্বিতরণে"র প্রস্তাব বলে আখ্যায়িত করা যেতে পারে। এই প্রস্তাবে সম্পূর্ণ ভূমিহীনদের জমি পুনর্বিতরণের আওতা থেকে বাদ দেয়ার সুপারিশ করা হয়।[৩০] এ প্রস্তাবের পেছনে মূল যুক্তিগুলি নিম্নরূপ। প্রথমত, স্বল্প পরিমাণের উদ্বৃত্ত জমি সকল ভূমিহীন ও ভূমিস্বল্প পরিবারদের ভাগ করে দেয়া হলে কারোরই কার্যক্ষম জোত অর্জিত হবে না; ফলে চাষে অদক্ষতা দেখা দেবে, এবং উৎপাদনের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া পড়বে। দ্বিতীয়ত, এখন যারা সম্পূর্ণ অথবা কার্যত ভূমিহীন, তাদের অনেকেই আর কৃষিকাজের সঙ্গে যুক্ত নন। ফলে একদিকে তাদের চাষের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণাদি (যেমন হাল-বলদ) নেই, অন্যদিকে কৃষিকাজের সাথেও তারা আর ততোটা পরিচিত নন। এমতাবস্থায় যদি তাদেরকে জমি দেয়া হয়, তবে তাতে উৎপাদন কমে যাওয়ার আশংকা থাকে। তৃতীয়ত, পুনর্বিতরণের সূত্রে প্রাপ্ত জমির পরিমাণ ন্যূনতম কার্যক্ষম জোতাকারের চেয়ে কম হলে সে জমি বিক্রি হয়ে পুনরায় বড় জমি মালিকদের হাতেই ফিরে যাবে। এসব যুক্তির ভিত্তিতেই প্রস্তাব করা হয় যে, জমির পুনর্বিতরণ শুধুমাত্র ভূমি-স্বল্প কৃষকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হোক। অথবা, বড় জোর সেসব ভূমিহীন পরিবারদের অন্তর্ভুক্ত করা হোক, যাদের এখনো মূল পেশা ক্ষেতমজুর হিসেবে কৃষিকাজ করা।

বলাবাহুল্য, স্বল্প-পরিধির পুনর্বিতরণমূলক উপর্যুক্ত প্রস্তাবের বেশ কিছু আকর্ষণীয় দিক আছে। প্রথমত, এটা উদ্বৃত্ত জমির সীমাবদ্ধতার সমস্যাকে কিছুটা সহজ করে। দ্বিতীয়ত, এ ধরনের সংস্কারে কোন নতুন ধরনের সাংগঠনিক প্রয়াস অথবা প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো নির্মাণের প্রয়োজন নেই। কৃষি উৎপাদন প্রচলিত ধারার পারিবারিক গৃহস্থ কর্মকান্ড হিসেবে পরিচালিত হতে পারে। ফলে উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিশৃংখলা সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে।

কিন্তু এসব আকর্ষণীয়তার কিছু বিপরীত দিকও আছে। প্রথমত, যেখানে গ্রামীণ পরিবারের প্রায় পঞ্চাশ শতাংশ কার্যত ভূমিহীন, সেখানে তাদেরকে বাদ দিয়ে শুধুমাত্র ভূমিস্বল্প (অর্থাৎ ছোট এবং অংশত মাঝারি) কৃষকদের নিয়ে ভূমি সংস্কার সম্পাদনের বিষয়টি রাজনৈতিকভাবে বাস্তবসম্পন্ন কিনা সে বিষয়ে সংশয় রয়েছে। লক্ষ্য করা দরকার যে, ভূমি সংস্কার শুধু জমির অংক মেলানোর বিষয় নয়; তা রাজনৈতিক শক্তি সমাবেশের হিসাব মেলানোর বিষয়ও বটে। সে

দৃষ্টিকোণ থেকে গ্রামের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভূমিহীনদের বাদ দিয়ে – বস্তুত তাদের মধ্যে বঞ্চনাবোধের প্রসার ঘটিয়ে – শুধুমাত্র ভূমি-স্বল্প কৃষকদের শক্তি ও সমর্থনের উপর নির্ভর করে ভূমি সংস্কার করা রাজনৈতিকভাবে কঠিন হতে পারে। দ্বিতীয়ত, ভূমি সংস্কারের পেছনে উৎপাদন বৃদ্ধির যুক্তি যেমন আছে, তেমনি এর সঙ্গে সামাজিক ন্যায় এবং সুষম বিতরণের ইস্যু ওতোপ্রোতভাবে জড়িত। বাংলাদেশে এই দুই ইস্যু ঘনিষ্ঠ সম্পর্কিত। সে দৃষ্টিকোণ থেকে এবং উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যের সঙ্গে ভূমি সংস্কারের পূর্বোল্লিখিত ম্যাক্রোসংযোগের আলোকে স্বল্প-পরিধির পুনর্বিতরণের প্রস্তাবটি তেমন কার্যকর নয়। তৃতীয়ত, স্বল্প-পরিধির পুনর্বিতরণে শুধু যে ভূমিহীনদের পাশ কাটানো হবে তাই নয়, তাদের জীবিকার ক্ষেত্রে কিছু প্রতিকূলতার সৃষ্টি হতে পারে। যেমন ধনীকৃষকদের (বর্গায়-না-দেয়া) জমি মূলত ক্ষেতমজুর নিয়োগের মাধ্যমে চাষ হয়। এসব ধনীদের উদ্বৃত্ত জমি ছোট কৃষকদের নিকট হস্তান্তরিত হলে ভূমিহীনদের মোট নিয়োজনের সুযোগ কমে যেতে পারে, কারণ ছোট কৃষকেরা ভূমি সংস্কারসূত্রে প্রাপ্ত জমি নিজেদের পারিবারিক শ্রম দিয়েই চাষ করার চেষ্টা করবে।

এসব যুক্তির পাশাপাশি আরেকটি যে বিষয় এখানে গুরুত্বপূর্ণ তা হলো, স্বল্প-পরিধির পুনর্বিতরণ গ্রামের ব্যাপক শ্রমজীবী অংশ, তথা ভূমিহীনদের গ্রামের জমি ও জল সম্পদের সঙ্গে সম্পৃক্ত করবে না; এসব সম্পদের উপর তাদের কোন অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে না; ফলে এসব সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারে শ্রম নিয়োজনে তারা উৎসাহিত হবে না। (এ বিষয়টি নিয়ে আমরা ১২ নং অনুচ্ছেদে আরও বিস্তৃত আলোচনা করেছি।) বর্তমানের করণীয় সম্পর্কে পরবর্তী আলোচনার জন্য স্বল্প-পরিধির ভূমি সংস্কারের পক্ষে-বিপক্ষের এসব বিভিন্ন যুক্তি মনে রাখা প্রয়োজন হবে।

৭.২ *স্বল্প-পরিধির যৌথচাষ*

জমি স্বল্পতার উপর্যুক্ত পরিস্থিতিতে গবেষকেরা আরেক যে ধরনের প্রস্তাব করেছেন, তাকে "স্বল্প-পরিধির যৌথতা"র প্রস্তাব বলে অভিহিত করা যেতে পারে।[৩১] এ প্রস্তাবের পেছনের চিন্তাসূত্রটি নিম্নরূপ। যেহেতু একাধিক কারণে ভূমিহীনদের বাদ দিয়ে (তথা স্বল্প-পরিধির পুনর্বিতরণমূলক) ভূমি সংস্কার বাঞ্ছনীয় নয়, সেহেতু তাদেরকে (তথা সকল জমি প্রত্যাশীদের) অন্তর্ভুক্ত করেই ভূমি সংস্কার করা প্রয়োজন। এতে কার্যক্ষম জোতাকারের পূর্বোল্লিখিত সমস্যার

উদ্ভব ঘটবে ঠিকই। কিন্তু উদ্বৃত্ত জমি যৌথতার ভিত্তিতে প্রদানের মাধ্যমে এ সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে। অর্থাৎ, প্রাপ্ত জমি যৌথভাবে চাষ করার শর্ত আরোপ করা হবে।

স্বল্প-পরিধির পুনর্বিতরণের মতো স্বল্প-পরিধির যৌথতামূলক ভূমি সংস্কারেরও বেশ কিছু আকর্ষণীয় দিক আছে। প্রথমত, যে বিষয়টি উপরে উল্লিখিত হলো, এতে ন্যূনতম কার্যক্ষম জোতাকারের সমস্যার সমাধান হতে পারে। দ্বিতীয়ত, এতে চাষের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ (হাল-বলদ, পাওয়ার টিলার, ইত্যাদি) লভ্যতার সমস্যার সমাধান হতে পারে; কারণ জমি-প্রাপ্ত পরিবারদের আলাদাভাবে এসব না থাকলেও সম্মিলিতভাবে এগুলো সংগ্রহ করা তাদের পক্ষে সহজ হবে। তৃতীয়ত, এতে পূর্বোল্লিখিত "বিপরীত-পুনর্বিতরণে"র সমস্যারও সমাধান হবে। আমরা লক্ষ্য করেছি, এ সমস্যার উদ্রেক ঘটে যখন কোনো পরিবার ন্যূনতম কার্যক্ষম জোতাকারের অনুপস্থিতিতে, চাষের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণের অভাবে, অথবা সাধারণভাবে অভাব-অনটনের কারণে ভূমি সংস্কার সূত্রে প্রাপ্ত জমি বিক্রী করে দিতে বাধ্য হয়, এবং এভাবে জমি পুনরায় ধনীদের হাতে ফিরে যায়। যৌথাচাষের শর্তাধীনে বিতরিত হলে এই পরিণতি এড়ানো যাবে। স্বল্প-পরিধির যৌথতার প্রস্তাবের পক্ষে চতুর্থ যুক্তি হলো, গ্রামের সকল ভূমিহীন এবং ভূমিস্বল্প পরিবারদের এই প্রস্তাবের পক্ষে পাওয়া সম্ভব এবং তা ভূমি সংস্কারের জন্য প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক শক্তি সমাবেশ গড়ে তোলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। পঞ্চমত, উদ্বৃত্ত জমির যৌথচাষ ও পরিচালনার মধ্য দিয়ে গ্রামের দরিদ্রদের একটি বিকল্প অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতাবিন্দু গড়ে উঠতে পারে এবং তা গ্রামে ধনীদের ক্ষমতাবলয় প্রতিহত করায় সহায়ক হতে পারে।

কিন্তু উপর্যুক্ত আকর্ষণীয় দিকসমূহের পাশাপাশি স্বল্প-পরিধির যৌথতামূলক ভূমি সংস্কারের বিভিন্ন সমস্যাও রয়েছে। প্রথমত, সিলিংয়ের সূত্রে গ্রামের ধনীদের কাছ থেকে যে উদ্বৃত্ত জমি পাওয়া যাবে, তা বিভিন্ন স্থানে ছড়ানো হওয়ারই সম্ভাবনা। এসব ছড়ানো-ছিটানো জমির ভিত্তিতে যৌথখামার গড়ে তোলা কঠিন। অন্যদিকে, বদলা-বদলির ভিত্তিতে এসব জমিকে একত্রিত করাও কঠিন হবে, কেননা এটা অনেকটা নির্ভর করবে যৌথখামারের বাইরে থেকে যাওয়া পরিবারসমূহের সম্মতির উপর, যাদের অনেকেই আবার সিলিং দ্বারা সরাসরিভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হবেন। দ্বিতীয়ত, উদ্বৃত্ত জমির ভিত্তিতে যৌথখামারের প্রতিষ্ঠা সম্ভব হলেও তা গ্রামের দরিদ্রদের পুরো নিয়োজন (এবং জীবিকা)

নিশ্চিত করতে পারবে না। এ অবস্থায় তাদেরকে ক্ষেতমুজুর হিসেবে কাজ পাওয়া ও অন্যান্য আর্থিক প্রয়োজনে জমিসম্পন্ন ধনী পরিবারদের শ্মরণাপন্ন হতে হবে। এই অব্যাহত অর্থনৈতিক নির্ভরতার পরিস্থিতিতে গ্রামের ধনীদের ক্ষমতা প্রতিরোধকারী বিকল্প ক্ষমতা বিন্দু হিসেবে দরিদ্রদের যৌথখামার কতটা কার্যকর হতে পারবে সে বিষয়ে সংশয় থেকে যায়।

সুতরাং, কী স্বল্প পরিধির পুনর্বিতরণ, কী স্বল্প পরিধির যৌথতা, কোনোটিই বাংলাদেশের ভূমি সমস্যার সন্তোষজনক সমাধান দিতে পারে না। এমতাবস্থায় উপায় কী?

৭.৩ গ্রামের পরিধিতে যৌথচাষ

বাংলাদেশের জন্য স্বল্প-পরিধির পুনর্বিতরণ এবং স্বল্প-পরিধির যৌথচাষ প্রস্তাবদ্বয়ের উপর্যুক্ত বহু সীমাবদ্ধতার কারণেই অর্থনীতিবিদেরা শেষ পর্যন্ত গ্রাম পর্যায়ে যৌথতার প্রস্তাবে উপনীত হয়েছিলেন। তাঁদের জন্য এটা জমি-স্বল্পতার সমস্যা দ্বারা সৃষ্ট একটি কারিগরী ধরনের বাধ্যবাধকতাই ছিল। তাঁরা এর মধ্যে কোন বিশেষ রাজনৈতিক বা মতবাদ-সঞ্জাত যুক্তি প্রয়োগের চেষ্টা করেননি। তাঁদের চিন্তায়, যেহেতু সকল প্রত্যাশীদের দেয়ার মতো পর্যাপ্ত জমি নেই, সেহেতু জমির যৌথতা ভিত্তিক বন্দোবস্তের কোন বিকল্প নেই।

উদাহরণস্বরূপ ফা'ল্যান্ড এবং পারকিনসনের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এক সময় বিশ্ব ব্যাংকে কর্মরত এই দুই অর্থনীতিবিদ স্বাধীনতার পর "বাংলাদেশ – এ টেস্ট কেইস অফ ডেভেলপমেন্ট" নামে একটি বেশ সাড়া জাগানো বই লিখেন। তাতে তাঁরা উপসংহারে পৌঁছান যে,

> সুতরাং প্রতীয়মান হয়, যদি আয় বিতরণ এবং নিয়োজনের সুযোগের সমস্যার সমাধান করতে হয়, তাহলে যৌথচাষ ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে। ... এ ধরনের স্পষ্টতই সমাজতান্ত্রিক পদক্ষেপের জন্য বাংলাদেশ সামাজিক এবং রাজনৈতিকভাবে প্রস্তুত নাও হতে পারে। কিন্তু এই উপসংহার কোন মতবাদে বিশ্বাস থেকে নিঃসৃত নয়; এই উপসংহারে উপনীত হতে হয় কেননা জমি-স্বল্পতার পরিস্থতিতে ভূমিহীনদের জীবিকা নিশ্চিত করার অন্য কোন উপায় খুঁজে পাওয়া দুরূহ (Faaland and Parkinson 1976, pp. 87-88)।[৩২]

অধ্যাপক নূরুল ইসলাম, যিনি স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম পরিকল্পনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান ছিলেন, তিনিও সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে,

যতোই জনসংখ্যা এবং তার সঙ্গে ভূমিহীন মজুরের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে এবং ক্ষুদ্রাকার জোতসমূহ আরও বিভক্ত হতে থাকবে, ততোই কোন-না-কোন ধরনের যৌথ ভূমি ব্যবস্থাপনার জন্য চাপ ও যুক্তি বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা, কেননা এরূপ ব্যবস্থাপনা দৃশ্যমান বেকারত্বকে অসহনীয় মাত্রায় পৌঁছানো থেকে রক্ষা করতে পারে। বাংলাদেশের গ্রামীণ অর্থনীতির এরূপ ভবিষ্যতের প্রেক্ষিতে জমির কোন-না-কোন ধরনের যৌথ মালিকানা ও ব্যবস্থাপনা আয় ও নিয়োজন ভাগাভাগি করে নেয়ার একটি কার্যকর পদ্ধতি হিসেবে কাজ করতে পারে (Nurul Islam 1978, p. 40)।[৩৩]

কীভাবে গ্রামের উদ্বৃত্ত শ্রম বিভিন্ন বিনিয়োগমূলক কাজে নিয়োজিত করা যায়, তার বিস্তারিত আলোচনার সূত্রেই তিনি উপসংহারে উপনীত হন যে, জমি এবং জল সম্পদের যৌথ ব্যবস্থাপনা প্রয়োজন। তিনি ব্যাখ্যা করেন যে,

> এটাকে একটি পরিবারের ভেতর যে (মালিকানা-শ্রম-আয়-ভোগ) ব্যবস্থা গ্রামীণ বাংলাদেশে প্রচলিত, তাকেই গোটা গ্রামের পরিধিতে সম্প্রসারণ বলে বিবেচনা করা যেতে পারে (Islam 1978, p. 45)।[৩৪]

বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বি-আই-ডি-এস)-এর প্রয়াত প্রতিভাবান গবেষক আবু আবদুল্লাহ বাংলাদেশের কৃষি এবং গ্রামীণ অর্থনীতি নিয়ে গভীর গবেষণায় নিয়োজিত হয়েছিলেন। তিনিও সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে,

> ব্যক্তিগত মালিকানার ভিত্তিতে জমির পুনর্বিতরণ বাংলাদেশের উন্নয়ন সমস্যাবলীর সমাধান দিতে পারবে না; বরং কতক ক্ষেত্রে তা এসব সমস্যাকে আরও সংগীণ করে তুলতে পারে। সুতরাং, আমাদের কৃষি সমস্যার সমাধান কোন-না-কোন ধরনের যৌথতামূলক ব্যবস্থার মধ্যেই খুঁজতে হবে (Abdullah 1978, pp. 379-380)।[৩৫]

উপর্যুক্ত উদ্ধৃতিগুলো থেকে পরিষ্কার, মূলত জমি স্বল্পতার সমস্যার কারণেই বাংলাদেশের কৃষি ও গ্রামের সমস্যাবলি আলোচনা করতে যেয়ে অর্থনীতিবিদেরা পুনর্বিতরণমূলক ভূমি সংস্কার থেকে অবশেষে যৌথচাষের প্রস্তাবে উপনীত হয়েছিলেন। লক্ষণীয়, তাঁরা ভূমি সংস্কারের রাজনৈতিক সমস্যাবলি নিয়ে তেমন আলোচনা করেন নি।[৩৬] কিন্তু ভূমি-স্বল্পতাই ভূমি সংস্কারের পথে একমাত্র বাঁধা নয়। আরেকটি যে গুরুত্বপূর্ণ বাধা এক্ষেত্রে কাজ করে, তা হলো রাজনৈতিক। রাজনৈতিক নেতা হিসেবে বঙ্গবন্ধুকে সে বাঁধাই মোকাবেলা করতে হয়েছিল।

৮. ভূমি সংস্কারের রাজনৈতিক সমস্যা

পুনর্বিতরণমূলক ভূমি সংস্কারের অর্থ হচ্ছে একজনের জমি নিয়ে অন্যজনকে দেয়া। বলাবাহুল্য, যাদের জমি নিয়ে নেয়া হবে তারা সাধারণত এটা প্রতিরোধ করে। সেটাই ভূমি সংস্কারের পথে রাজনৈতিক সমস্যা। তদুপরি সাধারণত যাদের জমি নেয়া হবে তাঁরা হলো ধনী এবং ক্ষমতাবান। অন্যদিকে যারা জমি পাবে, তাঁরা সাধারণত দরিদ্র এবং ক্ষমতাহীন। সুতরাং, ভূমি সংস্কারের পথে রাজনৈতিক বাঁধা অত্যন্ত প্রবল। এই বাঁধা অতিক্রম করে ভূমি সংস্কার সম্পাদন সহজ নয়।

সে কারণে আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা দেখায় যে, সফল পুনর্বিতরণমূলক ভূমি সংস্কার কেবল তখনই সম্ভব যখন রাষ্ট্রক্ষমতা থাকে এমন রাজনৈতিক শক্তির হাতে যা দেশের ভূমি স্বার্থের বিরোধী কিংবা অন্ততপক্ষে ভূমি স্বার্থের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয়।[৩৭] এটা সাধারণতঃ দুই ক্ষেত্রে সম্ভব হয়েছে। একটি হলো সামাজিক বিপ্লবোত্তর পরিস্থিতি, যখন ভূমি-স্বার্থ বিরোধী রাজনৈতিক শক্তি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছিল। বিপ্লবোত্তর রাশিয়া, চীন, ভিয়েতনাম, কিউবা প্রভৃতি দেশ তার উদাহরণ। এসব দেশে শ্রমিক-কৃষকের দল ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছিল এবং তারা ভূস্বামীদের জমি বাজেয়াপ্ত করে মেহনতী কৃষকদের মধ্যে বিতরণ করেছিল। দ্বিতীয় যে পরিস্থিতিতে পুনর্বিতরণমূলক ভূমি সংস্কার সম্ভব হয়েছে, তা হলো যখন কোন দেশ একটি বিদেশি শক্তির অধীনস্ত হয়েছে, এবং সেই বিদেশি শক্তি স্থানীয় ভূমি স্বার্থের সঙ্গে জড়িত ছিল না কিংবা তার বিরোধী ছিল। এর উদাহরণ দেখা যায় জাপান, তাইওয়ান, এবং দক্ষিণ কোরিয়ায়।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে পরাজয়ের পর জাপানের উপর যুক্তরাষ্ট্রের প্রশাসন কায়েম হয়। এই প্রশাসন জাপানের ভূস্বামী শ্রেণিকে শত্রু বিবেচনা করেছিল, কারণ জাপানী সমরবাদের উত্থানের পেছনে এই শ্রেণির সমর্থন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। ফলে ভূস্বামীদের রাজনৈতিক ক্ষমতা খর্ব করা যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থানুকূল ছিল, এবং সে কারণে আমেরিকান কর্তৃপক্ষ জাপানে ভূমি সংস্কারে এগিয়ে যায়। ভূমি সংস্কারের পেছনে আরেকটি যুক্তি ছিল গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা। ভূস্বামীদের আধিপত্যসম্পন্ন দেশের চেয়ে ক্ষুদে মালিকানার কৃষিভিত্তিক দেশে গণতন্ত্র কার্যকর হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। সে বিষয়টিও জাপানে ভূমি সংস্কারের ক্ষেত্রে ভূমিকা রেখেছে।

দক্ষিণ কোরিয়াতেও আমরা মোটামুটি একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি দেখি। কোরিয়া যুদ্ধের পর সেখানেও মার্কিন প্রশাসন কায়েম হয়েছিল। বলাবাহুল্য,

স্থানীয় ভূমিস্বার্থের সঙ্গে এই প্রশাসনের সংশ্লিষ্টতা ছিল না। তদুপরি, উত্তর কোরিয়াতে প্রতিষ্ঠিত শ্রমিক পার্টির সরকার ততোদিনে গভীর ভূমি সংস্কার সম্পাদন করেছে। দক্ষিণ কোরিয়ার মেহনতী কৃষকেরা যাতে শ্রমিক পার্টি এবং সমাজতন্ত্রের প্রতি আকৃষ্ট না হয়, সেকারণেও দক্ষিণ কোরিয়ার মার্কিন প্রশাসন সেদেশে কার্যকর ভূমি সংস্কার সম্পাদন করে।

তাইওয়ানেও একই রকম ঘটনা লক্ষ্য করা যায়। ১৯৪৯ সনে চীনে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে বিপ্লব সংঘটিত হলে চিয়াং কাই শেকের জাতীয়তাবাদী দল (কুয়োমিন্টাংগ) ও সেনাবাহিনী চীনের মূল ভূখন্ড থেকে তাইওয়ানে অভিগমন করে এবং সেখানে কর্তৃত্ব স্থাপন করে। ফলে স্থানীয় ভূস্বামীদের সঙ্গে এই সরকারের স্বার্থ সংশ্লিষ্টতা ছিল না। এছাড়া কুয়োমিনতাঙ্গের সেনাসদস্যদের জীবিকা নিশ্চিত করার জন্য তাদেরকে জমি দেয়া প্রয়োজন ছিল। তদুপরি, উপরে আমরা লক্ষ্য করেছি, বিপ্লব পরবর্তী গণচীনে গভীর ভূমি সংস্কার বাস্তবায়িত হয়েছিল। সুতরাং গণচীন এবং কমিউনিস্ট পার্টির প্রতি তাইওয়ানের সাধারণ মেহনতী কৃষকদের আকর্ষণ স্তিমিত করাও জরুরী ছিল। এসব বিভিন্নমুখী প্রয়োজনেই তাইওয়ানে কার্যকর ভূমি সংস্কার সম্ভব হয়েছিল।

উপর্যুক্ত আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতার আলোকে স্পষ্ট যে, সত্যিকার ভূমি সংস্কারের জন্য প্রয়োজন ভূমি স্বার্থ-বিরোধী শক্তির রাজনৈতিক ক্ষমতা। সেটা হতে পারে সামাজিক বিপ্লবের মাধ্যমে কিংবা ভূমি স্বার্থ-বিরোধী বিদেশি শাসন প্রতিষ্ঠার ফলে। এই শর্ত পূরিত না হওয়ার কারণেই পৃথিবীর অন্যান্য বহু দেশে ভূমি সংস্কার বাস্তবায়িত হয় নি। লাতিন আমেরিকার জন্য তা বিশেষভাবে প্রযোজ্য। এশিয়া ও আফ্রিকার বহু দেশের জন্যও তা প্রযোজ্য। বাংলাদেশের জন্যও তা প্রযোজ্য হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর মতো অবিসংবাদিত নেতার পক্ষেও বাংলাদেশে কার্যকর ভূমি সংস্কার বাস্তবায়ন সম্ভব হয় নি।

এক হিসেবে অন্য অনেক দেশের তুলনায় বাংলাদেশে ভূমি সংস্কারের পক্ষে রাজনৈতিক শক্তি সমাবেশ সম্ভব হওয়ার কথা ছিল। দূর থেকে গ্রাম যতোই জমাট সবুজ বলে প্রতিভাত হোক না কেন, ভেতরে তা বিভক্ত। সত্তর দশকেই বাংলাদেশের গ্রামের প্রায় চল্লিশ শতাংশ পরিবার কার্যত ভূমিহীনে পরিণত হয়। জমিসম্পন্ন পরিবারেরাও বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত। সেজন্যই গ্রামীণ ও কৃষি অর্থনীতির আলোচনায় "ধনী কৃষক," "মাঝারি কৃষক" (তার মধ্যে আবার "উচ্চ" এবং "নিম্ন"), "ছোট কৃষক," ইত্যাদি অভিধার উদ্ভব ঘটেছে।

রাজনৈতিক পরিভাষায় "জোতদার," "ভূস্বামী," প্রভৃতি অভিধাও চালু আছে। বহুল প্রচলিত হলেও, এসব অভিধা সবসময় বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে সংজ্ঞায়িত হয় না। অনেক সময় এগুলোর ব্যবহারিক অর্থের ক্ষেত্রে বিভিন্নতা দেখা দেয়। প্রায়শ আংশিক পরিচয় অথবা একটি নির্দিষ্ট নির্ণায়কের ভিত্তিতে এসব আনুভূমিক (হরাইজন্টাল) বিভক্তি নির্ধারণের চেষ্টা হয়। সে কারণে এসবের সর্বজনস্বীকৃত সংজ্ঞা সাধারণভাবে অনুপস্থিত।[৩৮]

সমাজ বিজ্ঞানী ও নৃতাত্ত্বিকেরা দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যে, শ্রেণিবিভক্তির পাশাপাশি বাংলাদেশের গ্রামে "শ্রেণীভেদী" (অর্থাৎ যেসব বিভক্তি বিভিন্ন শ্রেণি ভেদ করে বিরাজ করে) বিভক্তির প্রভাবও প্রবল। এসব উল্লাম্বিক (ভার্টিক্যাল) বিভক্তি প্রায়শ হয় আত্মীয়তার সূত্রে, যার বিভিন্ন সুনির্দিষ্ট বহির্প্রকাশ হলো, বংশ, জাতি, গুষ্টি, বাড়ী, ইত্যাদি। এছাড়া ধর্ম, বর্ণ, রাজনৈতিক বিশ্বাস, স্থানিক নৈকট্য, ইত্যাদিও শ্রেণিভেদী বিভক্তির কারণ হতে পারে। শ্রেণিভেদী বিভক্তি অনেকসময় "পৃষ্ঠপোষক-আশ্রিত" সম্পর্কের রূপ ধারণ করে। আত্মীয়তা এবং পৃষ্ঠপোষক-আশ্রিত সম্পর্কের মিলিত প্রভাবে গ্রাম অনেকসময় বিভিন্ন "দলে" (ফ্যাকশন) অথবা "সমাজে" বিভক্ত হয়ে পড়ে।

পৃষ্ঠপোষক-আশ্রিত সম্পর্কের মূল ভিত্তিটি যে অর্থনৈতিক, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। যেহেতু গ্রামের গরিবেরা উৎপাদনের উপায় থেকে বঞ্চিত; সেহেতু তাদেরকে কাজ, বর্গা জমি, ঋণ, ও অন্যান্য সহায়তার জন্য গ্রামের অবস্থাপন্নদের উপর নির্ভর করতে হয়। আত্মীয়তা, স্থানিক নৈকট্য, ইত্যাদি সূত্রে কোন একটি বা একাধিক অবস্থাপন্ন পরিবারের সঙ্গে তাদের অপেক্ষাকৃত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে এবং তাদের সঙ্গে পৃষ্ঠপোষক-আশ্রিত সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে। অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতা অবশেষে সামগ্রিক নির্ভরশীলতায় পর্যবসিত হয়; ক্ষেত্র বিশেষে তা বংশ পরম্পরামূলক চরিত্র গ্রহণ করে।[৩৯]

আত্মীয়তা সম্পর্কটি নিঃসন্দেহে অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতা-অনপেক্ষ সম্পর্ক। কিন্তু অর্থনৈতিক প্রয়োজনের সামনে আত্মীয়তা সম্পর্কও ভেঙে পড়ে। জমি নিয়ে কলহে আত্মীয়ের হতে আত্মীয়ের মৃত্যু বাংলাদেশে সাধারণ ঘটনা। গ্রামের মানুষ মূর্খ; তাঁদের অর্থনৈতিক স্বার্থ বুঝতে অপারগ; এবং সে কারণে অবস্থাপন্ন পরিবারদের সঙ্গে লীন হয়ে থাকে – এরূপ ভাবা সঠিক নয়। মানুষ তার অর্থনৈতিক প্রয়োজন অনেকটা সহজাত প্রবৃত্তির মতোই বুঝতে পারে। বৃহত্তর পটভূমিতে সেটা ভাবার জন্য নিশ্চয়ই জ্ঞান, সচেতনতা, ও প্রশিক্ষণের প্রয়োজন হয়। কিন্তু সাক্ষাৎ পরিমন্ডলের মধ্যে কোথায় তাঁর কতটুকু স্বার্থ, সেটা

বুঝে নেয়া তাঁর জন্য তেমন কষ্টকর নয়। সেজন্য বাংলাদেশের গ্রামে যেসব শ্রেণিভেদী বিভক্তি দেখা যায়, তা কোনো অযৌক্তিক প্রাচ্যীয় ঘটনা নয়; এর পেছনে স্পষ্ট অর্থনৈতিক যুক্তি রয়েছে।

উপর্যুক্ত পরিস্থিতির কারণে অনেক ক্ষেত্রেই বাংলাদেশে গ্রামে শ্রেণি বিভক্তি বহুলাংশে অনভিপ্রকাশিত হয়ে থাকে। রাজনৈতিক পরিভাষায় এ পরিস্থিতিটি বোঝানোর জন্য "অচেতন শ্রেণি" (ইংরাজীতে "ক্লাস-ইন-ইটসেলফ") এবং "সচেতন শ্রেণি" (ইংরাজীতে "ক্লাস-ফর-ইটসেলফ")-র মধ্যে পার্থক্য চিহ্নিত করা হয়।[৪০] অর্থনৈতিক বিশ্লেষণে যারা একটি শ্রেণি, কিন্তু এই শ্রেণি পরিচয়ের ভিত্তিতে সচেতন এবং সংগঠিত নয়, তাঁরা একটি "অচেতন শ্রেণি"। কিন্তু যখন তাঁরা এই শ্রেণি পরিচয়ের ভিত্তিতে সচেতন এবং সংগঠিত হন, তখন তাঁরা "সচেতন শ্রেণি"তে পরিণত হন।

বাংলাদেশে কৃষক আন্দোলনের দীর্ঘ ইতিহাস এবং ঐতিহ্য রয়েছে। মধ্যযুগ এবং বৃটিশ আমলের বিভিন্ন কৃষক বিদ্রোহের কথা বাদ দিলেও, চল্লিশের দশকের শেষভাগে এবং পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সূচনালগ্নে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে শক্তিশালী কৃষক আন্দোলন সংঘটিত হয়েছিল। উত্তরবঙ্গ এবং যশোর-কুষ্টিয়া অঞ্চলের তেভাগা আন্দোলন এবং ময়মনসিংহের টংক এবং সিলেটের নানকার প্রথা বিরোধী আন্দোলন তারই উদাহরণ। অনেক ক্ষেত্রে এসব আন্দোলন সশস্ত্র রূপ নিয়েছিল।[৪১]

কিন্তু চল্লিশ দশকের এসব কৃষক আন্দোলন সমসাময়িক "জাতীয়" এবং বৃহত্তর আন্দোলনের সঙ্গে তেমন সম্পর্কযুক্ত ছিল না।[৪২] পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে, বাংলার, বিশেষত পূর্ব বাংলার রাজনীতি তখন পাকিস্তান আন্দোলনের খাতে প্রবাহিত হয়। ফলে কৃষকদের বীরত্বপূর্ণ আন্দোলন কোনো বৃহত্তর রাজনৈতিক কিংবা সামাজিক পরিবর্তন আনতে পারে না। অচিরেই বাংলাদেশের রাজনীতি "বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদে"র ধারায় অগ্রসর হয়। যদিও কিছু কিছু চীনপন্থী দল মাও জেদংয়ের "গ্রাম দ্বারা শহরকে ঘিরে ফেলা"র নীতির অনুসরণে গ্রামকে তাদের তৎপরতার মূল ক্ষেত্র হিসেবে গ্রহণ করে, কিন্তু তাদের কর্মপরিধি সীমিত ছিল। তদুপরি, শ্রেণি সংগ্রামের নামে "জোতদারদের গলা কাটা"র লাইন শেষাবধি একটি সন্ত্রাসী কার্যক্রম হিসেবেই পর্যবসিত বা বিবেচিত হয়, এবং তাতে মেহনতী, ভূমিহীন কৃষকদের অচেতন থেকে সচেতন শ্রেণিতে রূপান্তরের প্রক্রিয়া তেমন অগ্রসর হয় না।

ফলে স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধু যখন ভূমি সংস্কার বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেন, তখন তিনি এক কঠিন রাজনৈতিক সমস্যার সম্মুখীন হন। একদিকে ছিল জমি মালিকদের বিরোধিতা। অন্যদিকে এই বিরোধিতা প্রতিহত করার মতো সংগঠিত ভূমিহীন, মেহনতী কৃষক শ্রেণিও তিনি খুঁজে পান না।[৪৩] এরূপ পরিস্থিতির মধ্যেই বঙ্গবন্ধুকে পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে হয়।

৯. বঙ্গবন্ধুর সমবায় প্রস্তাব এবং রাজনৈতিক আপোষ

বঙ্গবন্ধু ১৯৭৩ সনে পরিবারের সংজ্ঞার পরিবর্তন মেনে নিয়ে ১০০ বিঘা সিলিং সম্পন্ন পুনর্বিতরণমূলক ভূমি সংস্কার থেকে পিছিয়ে গেলেও ১৯৭৫ সনে আবার গ্রামের সমবায়ী রূপান্তরের কর্মসূচি ঘোষণা করেন? পুনরায় প্রশ্ন, এটা কী করে সম্ভব হলো?

৯.১ সমবায় প্রস্তাবের ভেতরে আপোষ

উপরের প্রশ্নটির উত্তর পাওয়ার জন্য প্রথমেই লক্ষ্য করতে হয় যে, আপাতদৃষ্টিতে সমবায়ী গ্রাম কর্মসূচিকে পুনর্বিতরণমূলক ভূমি সংস্কার কর্মসূচির চেয়ে অগ্রসর (র‍্যাডিক্যাল) কর্মসূচি মনে হলেও ঘনিষ্ঠ বিচারে দেখা যায় যে, বিষয়টি এরূপ সরল নয়। এর একটি কারণ হলো, বঙ্গবন্ধুর সমবায় কর্মসূচিতে জমি মালিকানা অক্ষুণ্ন থাকছিল। উপরে আমরা দেখেছি, বঙ্গবন্ধু বার বার আশ্বস্ত করেছিলেন যে, তিনি কারো জমি নিয়ে নিচ্ছেন না। তিনি প্রস্তাব করেছিলেন যে, ফসলের এক-তৃতীয়াংশ জমি-মালিকানার ভিত্তিতে বিতরিত হবে। বিতরণের এই ফর্মুলা অনেকটা চল্লিশ দশকের তেভাগা আন্দোলনে দাবিকৃত ফর্মুলার মতো। তেভাগা আন্দোলনের দাবিও ছিল যে, ফসলের এক-তৃতীয়াংশ (অর্ধেকের পরিবর্তে) পাবে জমি মালিক।

লক্ষণীয়,ভূমি সংস্কারের অধীনে মালিকেরা সিলিং-অতিরিক্ত জমি পুরোপুরিই হারাচ্ছিলেন। উদ্বৃত্ত জমির বিনিময়ে তারা এককালীন ক্ষতিপূরণ পেতেন কিনা সেটা নির্ভর করছিল ভূমি সংস্কার কর্মসূচির সুনির্দিষ্ট শর্তাদির উপর। এককালীন ক্ষতিপূরণ পাওয়ার সম্ভাবনা সত্ত্বেও পুনর্বিতরণমূলক ভূমি সংস্কারের অধীনে উদ্বৃত্ত জমি (রাষ্ট্রের মাধ্যমে) গরীবদের নিকট পূর্ণ মালিকানায় হস্তান্তরের তুলনায় মালিকানা সংরক্ষিত রেখে জমি সমবায়ের নিকট হস্তান্তর এবং সেই মালিকানা সূত্রে উৎপাদিত ফসলের এক-তৃতীয়াংশ পাওয়ার প্রস্তাব জমি মালিকদের নিকট অধিকতর গ্রহণযোগ্য হওয়ার কথা। সেকারণেই

পুনর্বিতরণমূলক ভূমি সংস্কারের তুলনায় বঙ্গবন্ধুর সমবায়ী গ্রামের প্রস্তাব রাজনৈতিকভাবে সহনীয় কর্মসূচি ছিল। বস্তুত এটা ছিল জমি মালিকদের সঙ্গে একটা আপোষের প্রস্তাব। সমবায় কর্মসূচির মাধ্যমে তিনি কারো জমি নিয়ে নিচ্ছেন না – এ বিষয়টির প্রতি জোর দেয়ার মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু তাঁর এই আপোসের প্রতিই জমি মালিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন।

৯.২ আপোষের বৃহত্তর যৌক্তিকতা

সন্দেহ নেই, ভূমি মালিকদের সঙ্গে আপোষের সাক্ষাৎ প্রয়োজনীয়তাটি ছিল রাজনৈতিক। ভূমি মালিকেরা পূনর্বিতরণমূলক ভূমি সংস্কারে সম্মত হচ্ছিলেন না। তাঁরা সরকারের নিকট উদ্বৃত্ত জমি হস্তান্তরে রাজী ছিলেন না। সুতরাং এগিয়ে যাওয়ার জন্য জমি মালিকদের সঙ্গে আপোষের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু এই আপোষের পেছনে আরও কোন গূঢ় আর্থ-সামাজিক কারণ ছিল কী?

এই প্রশ্নের উত্তরে লক্ষণীয়, ভূমি সংস্কারের পক্ষে যেসব যুক্তি আমরা উপরে উল্লেখ করেছি, সাধারণভাবে সেগুলোকে দুই ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। একটি হলো উৎপাদন বৃদ্ধির (সংক্ষেপে "প্রবৃদ্ধি"র) যুক্তি; অন্যটি হলো "সমতা"র যুক্তি। কিন্তু উপরের আলোচনায় সমতার যুক্তিটি আমরা মূলত গ্রামের অভ্যন্তরের দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করেছি। ধনী কৃষকদের জমি নিয়ে গরীবদের মধ্যে বিতরণ করা হলে নিঃসন্দেহে গ্রামের ভেতর আরও সমতা প্রতিষ্ঠিত হবে। এটা গ্রামের ভেতরে "উল্লাম্বিক" সমতার ইস্যু। কিন্তু সমতার একটি বৃহত্তর, তথা জাতীয় দিক আছে। অন্য ভাষায়, সমতার ইস্যুটি গ্রাম এবং শহরের মিলিত পরিধিতেও দেখা প্রয়োজন। এটা হচ্ছে "আনুভূমিক" সমতার ইস্যু।

লক্ষণীয়, সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহে যখন ভূমি সংস্কার ও গ্রামের যৌথতাভিত্তিক রূপান্তর সাধিত হয়েছিল, তখন সেটা সমগ্র দেশের সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরের বৃহত্তর কর্মসূচির অংশ ছিল। সে কর্মসূচির অধীনে গ্রামে সমতা প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি শহরেরও সমতাধর্মী রূপান্তর সাধিত হয়েছিল। শিল্প, ব্যাংক, বীমাসহ অন্যান্য পুঁজির জাতীয়করণ করা হয়েছিল; শহুরে বিত্তশালীদের সম্পদ খর্ব করা হয়েছিল। ভবিষ্যতে শহরে অসমতা যাতে বৃদ্ধি পেতে না পারে, সেজন্য শহুরে অর্থনীতির বিকাশ মূলত রাষ্ট্রীয় মালিকানায় সম্পাদনের প্রক্রিয়া প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

স্বাধীনতার পর বাংলাদেশেও সমাজতন্ত্রের লক্ষ্য গৃহীত হয়েছিল এবং সে লক্ষ্যে জাতীয়করণের পদক্ষেপ নেয়া হয়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের পরিস্থিতির সঙ্গে বিপ্লবোত্তর রাশিয়া, চীন, কিংবা অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের বিরাট পার্থক্য ছিল। যেমন বাংলাদেশে ব্যক্তি পুঁজি নিষিদ্ধ ছিল না। প্রথমাবস্থায় পুঁজির উপর ২৫ লক্ষ টাকার সিলিং আরোপিত হলেও দ্রুতই তা তিন কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়। অর্থাৎ, শহরে পুঁজি এবং ব্যক্তিগত ধনসম্পদ বজায় থাকছিল। সুতরাং প্রশ্ন ওঠে, শহরে যদি তিন কোটি টাকার বিনিয়োগ-সম্পত্তি থাকা আইনসংগত হয়ে থাকে, তাহলে গ্রামে কেন ১০০ বিঘার বেশি জমি (সে আমলে তিন কোটি টাকার চেয়ে কম মূল্যেরই হওয়ার কথা) রাখার অনুমতি থাকবে না? অর্থাৎ আনুভূমিক (তথা গ্রাম এবং শহর ভেদকারী) সমতার দৃষ্টিকোণ থেকে গ্রামের ধনীদের ভূ-সম্পত্তির উপর আক্রমণ ন্যায্য ছিল না। সুতরাং, সমতার এই বৃহত্তর দৃষ্টিকোণ থেকেও গ্রামের জমি স্বার্থের সঙ্গে একটা আপোষের যৌক্তিকতা ছিলো।[৪৪] বঙ্গবন্ধু অনেকটা স্বজ্ঞাগতভাবে এই যৌক্তিকতা মেনে নিয়েছিলেন। এর মাধ্যমে তিনি একাধারে নিম্নরূপ বেশ কয়েকটি লক্ষ্য অর্জন করতে চেয়েছিলেন: (ক) উৎপাদন বৃদ্ধি; (খ) গ্রামের ভেতরে ন্যায় এবং সমতা প্রতিষ্ঠা; (গ) জমি মালিকদের রাজনৈতিক বাধা প্রশমন; এবং (ঘ) গ্রামের পরিধিতে সমতা এবং জাতীয় পরিধিতে সমতার মধ্যে সঙ্গতি স্থাপন।[৪৫]

****

উপরের অনুচ্ছেদসমূহে আমরা দেখলাম বঙ্গবন্ধুর সমবায়ী গ্রাম প্রস্তাবটি কী ছিল, এবং কী ধরনের আন্তর্জাতিক এবং জাতীয় প্রেক্ষিতে তিনি এই প্রস্তাব করেছিলেন। কিন্তু সেটা ছিল ১৯৭৫ সনের কথা। তারপর থেকে চল্লিশ বছরের বেশি সময় অতিক্রান্ত হয়েছে। এতদিন এবং এত পরিবর্তনের পর আজ বঙ্গবন্ধুর সেই প্রস্তাবের প্রাসঙ্গিকতা এবং উপযোগিতা কতখানি? এই প্রশ্নের উত্তরের জন্য প্রথমেই আন্তর্জাতিক এবং জাতীয় পরিস্থিতির প্রাসঙ্গিক পরিবর্তনসমূহ আরেকটু বিস্তারিতভাবে লক্ষ করা প্রয়োজন । প্রথমে আমরা নজর দেবো আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির পরিবর্তনের উপর।

১০. পরিবর্তিত আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি

বিগত কয়েক দশকে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। পৃথিবীর ভূ-রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক মানচিত্র বদলে গেছে। প্রথমত, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব-ইউরোপীয় দেশসমূহে কমিউনিস্ট পার্টি শাসিত সরকারসমূহের পতন ঘটেছে এবং এসব দেশের "সমাজতান্ত্রিক" সমাজ ব্যবস্থা ভেংগে গিয়েছে। সাধারণভাবে এসব দেশ এখন একটি উত্তরণ প্রক্রিয়ার মধ্যে আছে। তাদের মধ্যে বর্তমানে তিনটি ধারা চিহ্নিত করা যেতে পারে। প্রথম ধারাভুক্ত হলো সেসব দেশ, যেখানে সাধারণ ধরনের পুঁজিবাদ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং পশ্চিমের পুঁজিবাদী দেশসমূহের সঙ্গে রাজনৈতিক এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ ধারার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হলো পোল্যান্ড। চেক, স্লোভাক, স্লোভেনীয়া, প্রাক্তন বাল্টিক প্রজাতন্ত্রসমূহ, প্রভৃতি দেশও এ ধারার অন্তর্ভুক্ত। দ্বিতীয় ধারাভুক্ত হলো সেসব দেশ, যেখানে রাষ্ট্রায়ত্ত্ব খাতের প্রভুত্বসম্পন্ন বিশেষ ধরনের পুঁজিবাদী অর্থনীতির উদ্ভব ঘটেছে, এবং রাজনৈতিক এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটা স্বাধীন ধারা অনুসরণের প্রচেষ্টা চলছে। এ ধারার নেতৃত্বে রয়েছে রাশিয়া। কাজাখাস্তান, বেলোরাশিয়া, আরমেনিয়া, কিরগিস্তান, সার্বিয়াসহ আর কিছু দেশকে এ ধারায় অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। তৃতীয় ধারাভুক্ত হলো সেসব দেশ যেগুলো উপর্যুক্ত দুই ধারার কোনোটির সাথেই পুরোপুরি সম্পৃক্ত হতে পারেনি। এদের মধ্যে রয়েছে মোলদাভিয়া, তুর্কমেনিস্তান, উজবেকিস্তান, এবং অন্যান্য কিছু দেশ।

অন্যদিকে চীন এবং ভিয়েতনামে এক বিশেষ ধরনের উত্তরণের প্রক্রিয়া অগ্রসর হয়েছে। এসব দেশে এখনও কমিউনিস্ট পার্টি শাসিত সরকার বহাল আছে, এবং সমাজের সাধারণ লক্ষ্য হিসেবে সমাজতন্ত্র বজায় আছে। কিন্তু এসব দেশের অর্থনীতিতে বাজারের ভূমিকা প্রসারিত হয়েছে এবং ব্যক্তি মালিকানার বিপুল বিকাশ ঘটেছে। আগামীতে এসব দেশের উত্তরণ প্রক্রিয়ার কী পরিণতি হয়, তা একটি আগ্রহের বিষয়। এসব বিষয় নিয়ে আমরা অন্যত্র বিস্তারিত আলোচনা করেছি।[৪৬] সুতরাং এখানে তার পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নেই। আমাদের জন্য প্রাসঙ্গিক হলো কৃষি ক্ষেত্রে উত্তরণের অভিজ্ঞতা এবং তার মধ্যে বিশেষত চীন এবং ভিয়েতনামের অভিজ্ঞতা। এই অনুচ্ছেদে আমরা সেদিকেই দৃষ্টি দেবো।

১০.১ চীনের অভিজ্ঞতা

প্রথমেই লক্ষণীয়, চীনে কৃষির সাম্প্রতিক রূপান্তরের প্রক্রিয়া ১৯৭৮ সনে – অর্থাৎ সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং পূর্ব ইউরোপীয় সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহের উত্তরণ প্রক্রিয়ার বহু আগেই – সূচিত হয়।[৪৭] আগেই উল্লিখিত হয়েছে, ১৯৪৯ সনের বিপ্লবের পর চীনে পুনর্বিতরণমূলক ভূমি সংস্কার বাস্তবায়িত হয়। এই কর্মসূচির অধীনে ভূস্বামীদের জমি বাজেয়াপ্ত করে মেহনতী কৃষকদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। তারপর থেকে প্রায় এক দশক সেখানে মূলত ক্ষুদে জোত সম্পন্ন পরিবার-ভিত্তিক কৃষিই চালু ছিল। কিন্তু ১৯৫৮ সনে মাও জেদং চীনে "বৃহৎ উল্লম্ফন" কর্মসূচি চালু করেন। এই কর্মসূচির আপাতঃ উদ্দেশ্য ছিল সমাজতন্ত্রের স্তর সংক্ষিপ্ত করে দ্রুততার সঙ্গে (সোভিয়েত ইউনিয়নের আগেই) সাম্যবাদী সমাজে পৌঁছানো। সে উদ্দেশ্যে কৃষিতে ক্ষুদে কৃষক ভিত্তিক চাষ বাতিল করে যৌথচাষের প্রবর্তন করা হয়। গ্রাম-ভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠা সুগম করার লক্ষ্যে বহু গ্রামকে একত্রিত করে কমিউন গঠিত হয়, এবং গ্রামগুলোকে কমিউনের ব্রিগেডে রূপান্তরিত করা হয়। এসব কমিউনে শুধু যে যৌথচাষ প্রবর্তিত হয়, তাই নয়। উপরন্তু বিতরণের ক্ষেত্রে সাম্যবাদী নীতি গ্রহণ করা হয়। অর্থাৎ "শ্রম-অনুযায়ী" বিতরণের পরিবর্তে "চাহিদা-অনুযায়ী" বিতরণ চালু হয়। যেমন, "কম্যুনাল খাবারঘর" চালু হয়, যেখানে কমিউনের সদস্যরা চাহিদা অনুযায়ী খাবার খেতে পারতেন।

কিন্তু মাওয়ের বৃহৎ উল্লম্ফন কর্মসূচি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রে তা বিপর্যয় ডেকে আনে এবং গ্রাম ভিত্তিক ভারি শিল্প প্রতিষ্ঠা (যেমন ক্ষুদ্রাকৃতির ইস্পাত কারখানা স্থাপন) সফল হতে পারে না। অর্থনীতির এসব বিপর্যয় চীনে দুর্ভিক্ষ ডেকে আনে। ১৯৬১-৬৩ সনে চীনে দুর্ভিক্ষে বহু মানুষ প্রাণ হারায়।

বৃহৎ উল্লম্ফন কর্মসূচির ব্যর্থতা এবং পরবর্তী দুর্ভিক্ষ চীনের প্রেসিডেন্ট লিউ শাওচি, চীনের কমিউনিস্ট পার্টির তদানীন্তন সাধারণ সম্পাদক দেং শিয়াওপিং, এবং অন্যান্য যেসব বাস্তববাদী (প্র্যাগমেটিক) নেতারা "বৃহৎ উল্লম্ফন" কর্মসূচির বিরোধিতা করেছিলেন, তাদের অবস্থানের সঠিকতা প্রমাণ করে। চীনের কমিউনিস্ট পার্টিতে মাওয়ের অবস্থান দুর্বল হয়ে পড়ে। মাও তাঁর অবস্থান পুনরুদ্ধারের জন্য ১৯৬৬ সনে তথাকথিত "সাংস্কৃতিক বিপ্লবে"র সূচনা করেন। এই বিপ্লবের মূল উদ্দেশ্য ছিল তার প্রতিদ্বন্দ্বীদের পার্টির নেতৃত্ব থেকে অপসারণ করা এবং বাস্তববাদী ধারার (যাকে মাও "পুঁজিবাদী ধারা" বলে

অভিহিত করেন) অর্থনৈতিক নীতির পরিবর্তে আপাতদৃষ্টিতে বিপ্লবী ধারা বহাল রাখা। এ উদ্দেশ্যে মাও সেনাবাহিনীকে ব্যবহার করেন। তাঁর প্রতি সেনাবাহিনী প্রধান লিন বিয়াও-এর ব্যক্তিগত আনুগত্য এজন্য সহায়ক হয়। ১৯৬৬ থেকে ১৯৭৬ সনে মাওয়ের মৃত্যু পর্যন্ত এই সাংস্কৃতিক বিপ্লব বহাল থাকে।

মাওয়ের মৃত্যুর পর চীনের কমিউনিস্ট পার্টির বাস্তববাদী নেতারা ক্ষমতায় ফিরে আসার সুযোগ পান। প্রেসিডেন্ট লিউ শাওচি অন্তরীণ থাকা অবস্থায় মারা যান। কিন্তু দেং শিয়াওপিং, চেন ইয়েন, এবং অন্যান্য নেতারা জীবিত ছিলেন এবং তাঁরা চীনে বিভিন্ন সংস্কারমূলক কর্মসূচি চালু করেন। ১৯৭৮ সনের ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠকে এই সংস্কারমূলক কর্মসূচি আনুষ্ঠানিকভাবে গৃহীত হয়। কিন্তু চীনের গ্রামাঞ্চলে তার আগেই – নীচ থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এবং বিদ্যমান নিয়ম অমান্য করে, অনেক সময় গোপনে – যৌথচাষ থেকে পরিবার ভিত্তিক চাষে প্রত্যাবর্তনের প্রক্রিয়া শুরু হয়। ১৯৭৮ সনের সিদ্ধান্তের পর এই প্রক্রিয়া আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি লাভ করে এবং বেগবান হয়। প্রায় দু' বছরের মধ্যেই গোটা চীন যৌথচাষ থেকে পরিবার-ভিত্তিক চাষে প্রত্যাবর্তন করে।

আনুষ্ঠানিকভাবে কৃষির এই নতুন নীতির নাম দেয়া হয় "পারিবারিক দায়িত্ব প্রথা" – ইংরেজিতে "হাউসহোল্ড রেসপনসিবিলিটি সিস্টেম"। আগে পরিকল্পনা মোতাবেক কৃষি উৎপাদন সরবরাহের দায়িত্ব ছিল গোটা কমিউন কিংবা ব্রিগেডের উপর। এখন সেটা পরিবারের উপর ন্যস্ত হলো। জমির উপর যৌথ মালিকানা অব্যাহত থাকে। কিন্তু চাষের – তথা ভোগদখলের – জন্য জমি কৃষক পরিবারের মধ্যে ভাগ করে দেয়া হয় (অনেকটা লীজ দেয়ার মতো)। এই বন্দোবস্তের অধীনে কৃষক পরিবারসমূহ একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ উৎপাদন সরকারের নিকট নির্দিষ্ট মূল্যে বিক্রয় করতে বাধ্য; কিন্তু বাকী (উদ্বৃত্ত) ফসল ইচ্ছামতো নিজস্ব ভোগের জন্য কিংবা বাজারে বিক্রয়ের জন্য ব্যবহার করতে পারে। পারিবারিক দায়িত্ব প্রথার প্রবর্তন কৃষকদের জন্য জোরালো প্রণোদনা সৃষ্টি করে। এই প্রণোদনায় সাড়া দিয়ে কৃষকেরা বিপুলভাবে উৎপাদন বৃদ্ধি করেন।

সময়ে পারিবারিক দায়িত্ব প্রথাকে আরও দৃঢ় ভিত্তি দেয়া হয়েছে। যেমন প্রথমাবস্থায় জমি লীজের সময়কাল ছিল ১৫ বছর। পরবর্তীতে তা ৩০ বছর পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। সরকারের নিকট নির্দিষ্ট দামে সরবরাহ করার বাধ্যবাধকতা কমিয়ে আনা হয়েছে; অর্থাৎ আরও বেশি ফসল নিজেদের ভোগে

ব্যবহার কিংবা বাজারে বিক্রয়ের জন্য অনুমতি দেয়া হয়েছে। তবে জমির উপর যৌথ (তথা গ্রামের) মালিকানা এখনও অব্যাহত আছে। কোনো পরিবার যদি চাষবাসে অপারগ হয়, তবে সে জমি গ্রামের নিকট ফিরে যায়, এবং অন্যান্যদের মধ্যে বিতরিত হয়। কিছু বছর পরপর গ্রামের পরিবার সংখ্যা এবং পরিবারের সদস্যসংখ্যা ইত্যাদি বিবেচনায় নিয়ে জমি পুনর্বিতরণ করা হয়। কৃষি জমি সম্পূর্ণরূপে কৃষকদের (ব্যক্তি) মালিকানায় হস্তান্তরের প্রস্তাব আছে। কিন্তু চীনের সরকার এখন পর্যন্ত সে ধারায় অগ্রসর হয় নি।

১০.২ ভিয়েতনামের অভিজ্ঞতা

কৃষি রূপান্তরের প্রশ্নে ভিয়েতনামের অভিজ্ঞতা অনেকটা চীনের অনুরূপ। তবে উত্তর এবং দক্ষিণ ভিয়েতনামে তা বোধগম্য কারণেই কিছুটা ভিন্নতা পায়। উত্তর ভিয়েতনামে ১৯৫৪ থেকে ১৯৫৬ সনের মধ্যেই পুনর্বিতরনমূলক ভূমি সংস্কার সম্পাদিত হয়। ভূস্বামীদের জমি বাজেয়াপ্ত করে তা দরিদ্র ও শ্রমজীবী কৃষকদের মধ্যে বিতরিত হয়; এবং ক্ষুদে, পরিবার-ভিত্তিক চাষ বিস্তৃতি লাভ করে। এরপর কৃষির সমবায়ীকরণের প্রক্রিয়া শুরু হয়। প্রথম পর্যায়ে তা সাধারণ শ্রম-সহযোগিতাতে (আমাদের দেশের বদলি-প্রথার মতো) সীমাবদ্ধ ছিল। দ্বিতীয় পর্যায়ে (১৯৫৮-১৯৫৯ সনে) তা "প্রাথমিক স্তরে"র সমবায় প্রতিষ্ঠার রূপ গ্রহণ করে। এতে জমি মালিকানা অক্ষুণ্ন থাকে, কিন্তু চাষাবাদ যৌথতার ভিত্তিতে পরিচালিত হয়। তৃতীয় পর্যায়ে (১৯৬১ সন থেকে) "অগ্রসর স্তরে"র সমবায় প্রতিষ্ঠিত হয়। এতে জমির উপর ব্যক্তি মালিকানা বাতিল হয়ে যায়, এবং উৎপাদিত ফসল কেবলমাত্র শ্রমের ভিত্তিতে বিতরণের প্রথা চালু হয়।

১৯৭৫ সনের বিজয় এবং ভিয়েতনামের পুনঃএকত্রিকরণের পর দক্ষিণ ভিয়েতনামেও পুনর্বিতরণমূলক ভূমি সংস্কার সম্পাদিত হয় এবং যৌথচাষ ভিত্তিক সমবায়েরও উদ্যোগ গৃহীত হয়; কিন্তু সেখানে এই সমবায়ীকরণ ততোটা অগ্রসর হয় না। ১৯৮৬ সন নাগাদ যেখানে উত্তর ভিয়েতনামের ৯০ শতাংশ কৃষি-পরিবারই যৌথচাষ ভিত্তিক সমবায়ে অন্তর্ভুক্ত ছিল, দক্ষিণ ভিয়েতনামে এর মাত্রা ছিল মাত্র প্রায় ৬ শতাংশ। কিন্তু যৌথচাষ ভিত্তিক সমবায় ব্যবস্থা প্রবর্তনের পর ভিয়েতনামে কৃষি উৎপাদনে স্থবিরতা দেখা দেয়।

১৯৮১ সন থেকেই ভিয়েতনামে কৃষির সংস্কার শুরু হয়। প্রথমে কৃষকদের নির্ধারিত উৎপাদনের অতিরিক্ত ফসল বাজারের বিক্রয়ের অনুমতি দেয়া হয়। কিন্তু তখনও কী ফসল কতটুকু জমিতে আবাদ হবে তা নির্ধারণ এবং

উৎপাদনের উপকরণ বিতরণের এখতিয়ার সরকারের হাতে ছিল। ১৯৮৮ সনে সরকার "১০ নম্বর প্রস্তাব" গ্রহণ করে। এই প্রস্তাব অনুযায়ী পুরোপুরিই যৌথ কৃষি থেকে পারিবারিক কৃষিতে প্রত্যাবর্তন সূচিত হয়। কৃষক পরিবারসমূহ ২০ বৎসরের জন্য জমির লীজ (ভোগদখলের অধিকার) পায়। ১৯৯৩ সনে সরকার নতুন ভূমি আইন চালু করে, যার ফলে কৃষক পরিবারেরা তাদের লীজকৃত জমি বদল, হস্তান্তর, উত্তরাধিকারসূত্রে প্রদান, এবং (ঋণ প্রাপ্তির জন্য) বন্ধকী দেয়ার অধিকার পায়। এসব সংস্কারের ফলে ভিয়েতনামে কৃষি উৎপাদন বিপুলভাবে বৃদ্ধি পায়। ধানের উৎপাদন ১৯৮৭ সনের ১৫১ লক্ষ টন থেকে ২০০৩ সনে ৩২৬ লক্ষ টনে পৌঁছায়। ভিয়েতনাম এখন পৃথিবীর অন্যতম চাল রপ্তানিকারক দেশ।[৪৮]

১০.৩ প্রাক্তন সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রসমূহ এবং পূর্ব-ইউরোপের অভিজ্ঞতা

চীন এবং ভিয়েতনামের অভিজ্ঞতাই বাংলাদেশের জন্য বেশি প্রাসঙ্গিক; তবে প্রসংগসূত্রে প্রাক্তণ সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রসমূহ এবং পূর্ব ইউরোপীয় দেশসমূহের অভিজ্ঞতার কথাও এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। এসব দেশেও সাধারণভাবে কৃষিতে যৌথ মালিকানা এবং চাষ থেকে পরিবার-ভিত্তিক মালিকানা এবং চাষে প্রত্যাবর্তনের প্রক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। তবে সবক্ষেত্রে তা একই ধারায় অগ্রসর হয় না। মোটা দাগে নিম্নরূপ কয়েকটি প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়।[৪৯]

প্রথমটি হলো, যৌথ খামারের জমি প্রাক্তণ মালিকদের নিকট প্রত্যাবর্তন। কোথাও কোথাও এই পদক্ষেপকে অতীতে সংঘটিত একটি "অন্যায়"-এর প্রতিকার হিসেবে গণ্য করা হয়। যেসব দেশে জমির প্রাক্তণ মালিকেরা জীবিত ছিলেন, মূলত সেসব দেশে এই পদক্ষেপ গ্রহণ সম্ভব হয়েছে। বাল্টিক প্রজাতন্ত্রসমূহ এবং চেক, স্লোভাক, বুলগেরিয়া, রোমানিয়াসহ অন্যান্য অনেক পূর্ব ইউরোপীয় দেশে এটা সম্ভব হয়।। এসব দেশে জমির যৌথকরণ করা হয়েছিল চল্লিশের দশকের শেষ ভাগে। তবে তার আগে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরপর, এসব দেশে পুনর্বিতরণমূলক ভূমি সংস্কার বাস্তবায়িত হয়েছিল। এই ভূমি সংস্কারের মধ্য দিয়ে এসব দেশে যে জমি মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, আশির দশকের শেষে কিংবা নব্বইয়ের দশকে মূলত সেই মালিকানায় প্রত্যাবর্তনের উদ্যোগ নেয়া হয় – ভূমি সংস্কার পূর্ববর্তী মালিকানায় নয়। তবে কোথাও কোথাও পরিবারের সদস্য সংখ্যা, ইত্যাদি যেসব পরিবর্তন ইতিমধ্যে সংঘটিত হয়েছে, জমি মালিকানা পুনর্প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সেদিকে লক্ষ রাখা হয়।

আবাদি জমির মালিকানা প্রত্যাবর্তনের পাশাপাশি যৌথ খামারের সদস্যদের সব্জিচাষের জন্য যে ভিটা-সংলগ্ন জমি বরাদ্দ দেয়া হয়েছিল, তার মালিকানাও দেয়া হয়। জমি মালিকানা প্রত্যাবর্তনের ফলে পরিবার-ভিত্তিক, ক্ষুদ্রাকার পরিধির কৃষিকাজ প্রসার লাভ করে। আবার অনেক মালিক বিভিন্ন কারণে চাষকার্য থেকে নিজেদেরকে প্রত্যাহার করে নেয় এবং নিজ জমি অন্যদের নিকট চুক্তি-বর্গা বা লীজ দিয়ে দেয়। এর ফলে এসব দেশে পরিবার ভিত্তিক ক্ষুদ্রাকার খামারের পাশাপাশি লীজকৃত জমির ভিত্তিতে বৃহদাকার বাণিজ্যিক খামারেরও উ দ্ভব ঘটেছে। অনেক ক্ষেত্রে এসব বৃহদাকার খামার পূর্ববর্তী যৌথ বা রাষ্ট্রীয় খামারেরই উত্তরসূরি।

দ্বিতীয় ধারাটি হলো রাষ্ট্রীয় ও যৌথ খামারের বিদ্যমান সদস্যদের মধ্যে জমির শেয়ার (অংশ) বিতরণ। এই ধারাটি মূলত রাশিয়া, মলদোভা, এবং ইউক্রেনের কিছু এলাকায় অনুসৃত হয়েছে। এসব দেশে জমির জাতীয়করণ এবং যৌথ খামারের প্রতিষ্ঠা এত অতীতের ঘটনা যে, প্রাক্তণ মালিক খুঁজে পাওয়ার প্রচেষ্টার তেমন যৌক্তিকতা কিংবা কার্যকারীতা ছিল না। ফলে জমির বিতরণ রাষ্ট্রীয় ও যৌথ খামারের বিদ্যমান সদস্যদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখাই সঙ্গত বিবেচিত হয়। তদুপরি দীর্ঘকাল যাবত যৌথ জমি মালিকানা এবং চাষের সঙ্গে অভ্যস্ততার কারণে এসব দেশে এক লাফে পরিবার-ভিত্তিক জমি মালিকানা এবং চাষকার্য প্রবর্তনে অনেক বাধা ছিল। যেমন জমির শেয়ার বিতরণ করা গেলেও জমি চাষ করার জন্য যে যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য উপকরণ প্রয়োজন, সেসব বিতরণের পদ্ধতি খুঁজে পাওয়া সহজ ছিল না। ফলে এসব দেশে যদিও জমির শেয়ার (অংশ) বিতরিত হয়, কিন্তু বাস্তবে জমি বিভক্ত হয় না এবং যৌথচাষ বহুলাংশে অব্যাহত থাকে। তবে কেউ যদি তার শেয়ারের জমি আলাদা পেতে ইচ্ছা প্রকাশ করে, তবে তাকে তা পাওয়ার ব্যবস্থা করে দেয়ার বিধান আছে, এবং ক্ষেত্র বিশেষে তা হয়েছে এবং হচ্ছে। এভাবে যৌথ খামারের পাশাপাশি পারিবারিক খামারও গড়ে উঠছে। তবে সাধারণভাবে তা এখনও সীমিত পর্যায়ে রয়েছে। লক্ষণীয় যে, বেলোরাশিয়াতে কৃষিব্যবস্থায় কোনো পরিবর্তনই সংঘটিত হয়নি।

তৃতীয় ধারার পরিবর্তন লক্ষ করা যায় ককেশীয় প্রজাতন্ত্র সমূহে। এসব প্রজাতন্ত্রে কৃষির যৌথায়নও অনেক অতীতের ঘটনা। তবে পাহাড়ি এলাকায় অবস্থানের কারণে এসব প্রজাতন্ত্রে কৃষিতে বৃহদাকার প্রযুক্তি ব্যবহারের সুযোগ সীমিত ছিল। ফলে কৃষি জমি ভাগ করে তাতে পরিবার ভিত্তিক চাষে

প্রত্যাবর্তনের পথে প্রযুক্তিগত বাধা কম ছিল। সে কারণে এসব প্রজাতন্ত্রে যৌথ এবং রাষ্ট্রীয় খামারের জমি খামারের সদস্যদের মধ্যে কার্যত বিতরণ এবং তাতে পারিবারিক খামারের প্রতিষ্ঠার ধারাটিই প্রাধাণ্য পায়।

এই তিন মূল ধারার পাশাপাশি অন্যান্য কিছু প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়েছে। যেমন মধ্য এশিয়ার প্রজাতন্ত্রসমূহে কিছুটা রাশিয়া এবং কিছুটা ককেশীয় ধারার সংমিশ্রণ লক্ষ্য করা যায়। মোটা দাগে বর্ণিত উপরের বিভিন্ন ধারা আবার পরিস্থিতিভেদে বিভিন্ন সুনির্দিষ্ট রূপ গ্রহণ করেছে। যেমন কোথাও কোথাও জমি ভাওচার পদ্ধতিতেও বিতরিত হয়। হাংগেরির জন্য এটা বিশেষভাবে প্রযোজ্য। তবে এখানে আমরা সেসব সূক্ষ্মতার মধ্যে যাচ্ছি না। সাধারণভাবে আমরা দেখি যে, কৃষিতে যৌথ মালিকানা এবং চাষের পরিবর্তে পরিবার-ভিত্তিক মালিকানা ও চাষের প্রসার ঘটেছে। কোথাও কোথাও তা পুরোদমে অগ্রসর হয়ে একটা পূর্ণাঙ্গতা অর্জন করেছে। কোথাও তা একটা মাঝামাঝি পর্যায়ে আছে। আবার কোথাও কোথাও বিভিন্ন কারণে তা এখনও তেমনটা অগ্রসর হয় নাই।

সুতরাং, যৌথচাষসম্পন্ন সমাজতন্ত্রের যে আন্তর্জাতিক মডেল দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে বঙ্গবন্ধু ১৯৭৫ সনে সমবায়ী গ্রামের কর্মসূচি ঘোষণা করেছিলেন, সেই মডেল এখন বহুলাংশে অপসৃত। বেশিরভাগ দেশের সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার অবসান ঘটেছে। আর যেসব দেশে এখনও কমিউনিস্ট পার্টির সরকার ক্ষমতায় এবং আর্থ-সামাজিক লক্ষ্য হিসেবে সমাজতন্ত্র অক্ষুণ্ন আছে, সেসব দেশে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যৌথ চাষ থেকে পরিবার ভিত্তিক চাষে প্রত্যাবর্তন ঘটেছে। এই আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতার আলোকে বঙ্গবন্ধুর সমবায়ী গ্রাম প্রস্তাবের যৌথচাষের দিকটি নিয়ে বর্তমান পর্যায়ে উৎসাহিত হওয়ার সুযোগ কম।

১১. পরিবর্তিত জাতীয় পরিস্থিতি

কিন্তু পরিবর্তন শুধু আন্তর্জাতিক প্রেক্ষিতের নয়, গত কয়েক দশকে বাংলাদেশের জাতীয় পরিস্থিতিরও বিরাট পরিবর্তন ঘটেছে। এই পরিবর্তনের বহু দিক। এর কিছু উপরের অনুচ্ছেদে আলোচিত আন্তর্জাতিক অঙ্গনের পরিবর্তনের সঙ্গে সম্পর্কিত। বাকীটা বহুলাংশে অভ্যন্তরীণ কার্যকারণসূত্রের। এসব পরিবর্তনের মধ্যে যেগুলো বর্তমান আলোচনার জন্য বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক তার কয়েকটি নীচে উল্লেখিত হলো।

Northern University * Bangladesh * NUB Library
A-98226

১১.১ *সাধারণ রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক পরিবর্তন*

জাতীয় ক্ষেত্রে পরিবর্তনের প্রসঙ্গে প্রথমেই লক্ষ্য করতে হয় যে, সমাজতন্ত্রের প্রতি যে অংগীকার আগে বাংলাদেশের ছিল এখন তা আর নেই। যদিও আনুষ্ঠানিকভাবে "সমাজতন্ত্র" এখনো সাংবিধানিক চার মূলনীতির একটি হিসেবে বহাল আছে, কিন্তু তার ব্যাখ্যা এমন যে, তার দ্বারা পুঁজিবাদী অর্থনীতি বাতিল হয়ে যায় না। এটা আশ্চর্যের নয়। প্রথমত, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহের সমাজ ব্যবস্থার পতনের পর সমাজতন্ত্র সম্পর্কে বিভিন্ন প্রশ্নের উদ্রেক ঘটেছে। দ্বিতীয়ত, চীন এবং ভিয়েতনামের অর্থনীতিতে ব্যাপক ব্যক্তিখাতের প্রসারের ফলে সমাজতন্ত্রের মডেল সম্পর্কেও অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। এমতাবস্থায় বাংলাদেশেও সমাজতন্ত্রের লক্ষ্য সম্পর্কে সংশয় এবং অস্পষ্টতা দেখা দেয়াটা আশ্চর্যের নয়।

দ্বিতীয়ত, বিগত সময়ে বাংলাদেশে পুঁজিবাদের বিকাশ ঘটেছে। পুঁজিপতি শ্রেণি শক্তিশালী হয়েছে। বহু পুঁজিপতি গ্রুপের আবির্ভাব ঘটেছে। রাষ্ট্রীয় খাত সংকুচিত হয়েছে। শুধু বস্তুগত উৎপাদনশীল খাত নয়; শিক্ষা, স্বাস্থ্যসহ বিভিন্ন সামাজিক সেবামূলক খাতেও ব্যক্তিপুঁজির ব্যাপক প্রসার ঘটেছে।[৫০]

তৃতীয়ত, কৃষিখাতেও ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে। কৃষিখাতের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। শস্য উৎপাদন ছাড়াও মৎস্য, হাঁস-মুরগি ও ডিম (পোল্ট্রি), গবাদি পশু, ইত্যাদি খাতের ব্যাপক বিকাশ ঘটেছে।

চতুর্থত, গ্রামে কৃষি-বহির্ভূত নিয়োজনের ব্যাপক সম্পরসারণ ঘটেছে। এখন গ্রামে নিয়োজনের প্রায় অর্ধেক কৃষি বহির্ভূত বিভিন্ন কাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। এসবের মধ্যে আছে বিভিন্ন সেবামূলক তৎপরতা, গ্রামীণ শিল্প, ইত্যাদি। এসব কাজের উৎপাদনশীলতার অনেক তারতম্য দেখা যায়। কোন কোন ক্ষেত্রে – যেমন গ্রামীণ শিল্পে – তা কৃষির চেয়ে বেশি। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে – যেমন অনেক দেবামূলক খাতে – তা কৃষির চেয়ে কম।

পঞ্চমত, নিম্ন উৎপাদশীলতার কারণে উৎপাদনের অনুপাত হিসেবে কৃষির গুরুত্ব যতোটা কমেছে, জনসংখ্যা অথবা নিয়োজনের অনুপাত হিসেবে গ্রামের গুরুত্ব ততোটা কমে নি। নগরায়ন সত্ত্বেও এখনো প্রায় ৬০ শতাংশ মানুষ গ্রামে বসবাস করেন, এবং যারা নগরে অভিগমন করেছেন, তাদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশও এখনো গ্রামকেই তাদের মূল ঠিকানা হিসেবে গণ্য করেন। সুতরাং নগরায়নের আনুষ্ঠানিক অনুপাত দিয়ে বাংলাদেশের জীবনে গ্রামের ভূমিকার সঠিক পরিমাপ করা ঠিক হবে না। গ্রাম এখনো বাংলাদেশের সমাজের মূল অংশ।

ষষ্ঠত, বাংলাদেশের রাজনৈতিক শক্তির ভারসাম্যের পরিবর্তন ঘটেছে। এটা প্রথমোক্ত পরিবর্তনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। বঙ্গবন্ধুর সময় ক্ষমতায় ছিল "মুজিববাদী সমাজতন্ত্র"; আর মূল বিরোধী রাজনৈতিক শক্তির আপাতঃ দাবি ছিল "বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র"। সে তুলনায় বর্তমানে রাজনীতির ভরকেন্দ্র অনেক দক্ষিণে সরে এসেছে। এর একটি কারণ আন্তর্জাতিক অঙ্গনে সমাজতন্ত্রের বিপর্যয়। অন্যটি হলো দেশের ভেতরে রাজনৈতিক পরিবর্তন এবং পুঁজিবাদী অর্থনীতির বিস্তারলাভ। রাজনৈতিক পরিবর্তনের আরেকটি দিক হলো ধর্মীয় মৌলবাদের প্রসার। মধ্যপ্রাচ্যের তেলসমৃদ্ধ মুসলিম দেশসমূহের শক্তিবৃদ্ধি এবং তাদের অনেকের দ্বারা মৌলবাদী ইসলামের পৃষ্ঠপোষকতা বাংলাদেশে ধর্মীয় মৌলবাদের প্রসারের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

সমবায়ী গ্রাম সংক্রান্ত বঙ্গবন্ধুর প্রস্তাবের যুগোপযোগীতা বিচারে উপর্যুক্ত সাধারণ রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক পরিবর্তনের পাশাপাশি জমি মালিকানা এবং কৃষি রূপান্তরের কিছু দিকের প্রতি বিশেষ নজর দেয়া প্রয়োজন।

১১.২ ভূমি মালিকানা পরিস্থিতি

বিগত সময়কালে বাংলাদেশে জমি মালিকানার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটেছে। এর একটি হলো সাধারণ নিম্নমুখী ধ্বস। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাধারণ কারণে জোতের গড় আয়তন আরও কমেছে। প্রয়াত বিশিষ্ট গবেষক মাহাবুব হোসেনের হিসাব মতে, জোতের গড় আয়তন ১৯৬০ সনের ১.৪ হেক্টরের তুলনায় ২০০৮ সনে ০.৪৬ হেক্টরে হ্রাস পেয়েছে (বায়েস ও হোসেন ২০০৭)। আবাদী জমিহীন গ্রামীণ পরিবারের সংখ্যা মোট পরিবার সংখ্যার অনুপাত হিসেবে ১৯৭০ সনের ২০ শতাংশ থেকে ২০০৮ সনে ৪০ শতাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। এক হেক্টরের কম আবাদী জমি সম্পন্ন পরিবারের সংখ্যা মোট পরিবার সংখ্যার অনুপাত হিসেবে ১৯৮৩-৮৪ সনের ৬২ শতাংশ থেকে ২০০৮ সনে ৮৬ শতাংশে পৌঁচেছে (Sobhan 2010, p. 47 ও বায়েস এবং হোসেন ২০০৭)। জমি মালিকানার বৈষম্যও একই সঙ্গে বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৭৮ সনের "জমি অধিকার জরীপ (Land Occupancy Survey)" অনুযায়ী উপরের ৯ শতাংশ পরিবারের নিয়ন্ত্রণে ৪৮ শতাংশ জমি ছিল (Jannuzi and Peach 1978)। জমি মালিকানার এই মেরুকরণ বর্তমানে আরও বৃদ্ধি পেয়েছে।

জমি মালিকানার নিম্নমুখী ধ্বস এবং বৈষম্যের ফলশ্রুতি হিসেবে আরেকটি যে পরিবর্তন সাধিত হয়েছে, তা হলো "বর্গা প্রথা"র বিস্তৃতি। এখানে বর্গা

বলতে শুধু সনাতনী ভাগচাষ নয় বরং সকল ধরনের বর্গা বোঝানো হচ্ছে। (নীচে এ বিষয়ে আমরা আরও আলোচনা করবো।) বায়েস ও হোসেনের হিসাব অনুযায়ী বর্গায় দেয়া জমির পরিমাণ ১৯৮৮ সনের ১২ শতাংশের তুলনায় ২০০৪ সনে ৩২ শতাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। তাঁরা জানান যে, "মাত্র এক-পঞ্চমাংশ বড় চাষী আজকাল নিজের জমি নিজেরাই চাষ করে থাকে (বায়েস ও হোসেন ২০০৭, পৃ. ৫৫)।" তাঁদের হিসেবে, বর্তমানে বড় চাষীদের প্রায় অর্ধেক জমি বর্গায় চাষ হয়। ১৯৮৮ সনে এর পরিমাণ ছিল এক-পঞ্চমাংশ। এমনকি মাঝারি কৃষকেরাও জমি বর্গায় দিয়ে দিচ্ছেন। শেষোক্তদের মধ্যে মাত্র এক-তৃতীয়াংশ এখন নিজের জমি নিজে চাষ করেন। অবস্থাদৃষ্টে বায়েস ও হোসেন মন্তব্য করেন যে, "গ্রামীণ এলাকায় চাষের কাজে বড় এবং মাঝারি চাষীরা যেন হারিয়ে যাচ্ছে (ঐ)"। তাঁরা উল্লেখ করেন যে, "বিগত বছরগুলোতে মাঝারি ও বড় চাষীরা যেন কৃষিকাজ একরকম ছেড়েই দিয়েছে (ঐ, পৃ. ৫৪)"। অর্থাৎ অর্ধেক জমির মালিকেরা এখন বহুলাংশে খাজনাভোগী (রেন্টিয়ার), পরজীবী শ্রেণিতে পরিণত হয়েছে। নিজ মালিকানার জমি তারা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত কম জমির কৃষকদের নিকট বর্গায় দিয়ে চাষ করাচ্ছেন।[৫১]

১১.৩ পুনর্বিতরণমূলক ভূমি সংস্কারের অব্যাহত প্রয়োজন এবং প্রতিবন্ধকতা

ভূমি মালিকানাগত উপর্যুক্ত পরিস্থিতির আলোকে স্পষ্ট যে, বাংলাদেশে ভূমি সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা অব্যাহত আছে। উপরে আমরা লক্ষ্য করলাম, প্রায় অর্ধেক গ্রামীণ পরিবারের কোন আবাদী জমি নেই, এবং দেশের মোট কৃষি জমির প্রায় এক-তৃতীয়াংশের বেশি বিভিন্ন ধরনের বর্গায় চাষ হচ্ছে। বলাবাহুল্য, এরূপ মালিকানাগত পরিস্থিতি জমির সর্বোত্তম ব্যবহারের জন্য উপযোগী নয় কেননা পূর্বোল্লিখিত গবেষণা সাক্ষ্য দেয় যে, বড় জোতের তুলনায় ছোট জোতের এবং বর্গা জমির তুলনায় নিজ জমির উৎপাদনশীলতা সাধারণত বেশি হয় (অনুচ্ছেদ ৬ দ্রষ্টব্য)।

কিন্তু পাশাপাশি একথাও স্পষ্ট, পুনর্বিতরণমূলক ভূমি সংস্কারের পথে যে দুই সমস্যা – তথা রাজনৈতিক শক্তি ভারসাম্যের সমস্যা এবং জমি স্বল্পতার সমস্যা – সত্তরের দশকে বঙ্গবন্ধুর আমলে পরিদৃষ্ট হয়েছিল তা এখনও অব্যাহত আছে। বস্তুত সময়ে উভয় সমস্যা আরও তীব্র হয়েছে। রাজনৈতিক ভারসাম্যের বিষয়টি ইতিমধ্যেই উল্লিখিত হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে

বাংলাদেশে একটি সামাজিক বিপ্লবের সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছিল। সমাজতন্ত্র জাতীয় লক্ষ্য হিসেবে গৃহীত হয়েছিল। আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে অনেক র‍্যাডিক্যাল পদক্ষেপ গ্রহণ সম্ভব হয়েছিল। সে রাজনৈতিক পরিস্থিত এখন নেই। ভূমি সংস্কারের জন্য যে রাজনৈতিক ভারসাম্য প্রয়োজন, তা থেকে বাংলাদেশ আরও দূরে সরে এসেছে।[৫২]

দ্বিতীয়ত, জমি স্বল্পতার যে সমস্যা সত্তরের দশকে ভূমি সংস্কারের পথে বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল, সে সমস্যাও আর তীব্র হয়েছে। বায়েস ও হোসেন তাঁদের বইতে প্রকট জমি-স্বল্পতার কারণে বাংলাদেশে পুনর্বিতরণমূলক ভূমি সংস্কার সম্ভব কিনা সে বিষয়ে সংশয় প্রকাশ করেছেন। তাঁদের ভাষায়,

> বড় আকারের খামারের অনুপস্থিতি এবং ভূমিহীন ও প্রায় ভূমিহীনদের সংখ্যাধিক্যের কারণে, জমির মালিকানার ঊর্ধসীমা নির্ধারণ এবং সীমা উদ্বৃত্ত জমি ভূমিহীনদের মধ্যে বন্টন – এ জাতীয় ভূমি সংস্কার জমির মালিকানার বন্টন ব্যবস্থা ও কৃষি আয়ের বন্টনের অসমতা দূরীকরণে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে পারবে বলে মনে হয় না। আর সে কারণেই পুনর্বন্টিত ভূমি সংস্কারের ইস্যুটি বাংলাদেশে প্রশ্নবিদ্ধই থেকে যাচ্ছে (বায়েস এবং হোসেন ২০০৭, পৃ. ৫৩)।

বঙ্গবন্ধুর সমবায়ী গ্রাম বিষয়ক প্রস্তাবের যুগোপযোগীকরণ প্রয়াসের ক্ষেত্রে ভূমি সংস্কারের উপর্যুক্ত অব্যাহত প্রয়োজনীয়তা এবং তা সম্পাদনের পথে অব্যাহত বাধা – এই উভয় দিকের কথাই মনে রাখা প্রয়োজন হবে।

১১.৪ বর্গার রূপের বিবর্তন – ভাগচাষ থেকে চুক্তিপ্রথা

গ্রাম ও কৃষি সম্পর্কে আরেকটি যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় লক্ষ্য করা দরকার তা হলো, বিগত দশকগুলোতে বর্গার বিস্তৃতির পাশাপাশি বর্গার চরিত্রের একটি বড় পরিবর্তন ঘটেছে। আগে বাংলাদেশে বর্গার সাধারণ রূপ ছিল "ভাগ-চাষ"। ফসলে কার "ভাগ" কতো হবে সেটাই ছিল সংগ্রামের কেন্দ্রবিন্দু। এক্ষেত্রে "আধা-আধি" ভাগই বেশি প্রচলিত ছিল। অর্থাৎ, ফসলের অর্ধেক পেতেন জমির মালিক এবং অর্ধেক পেতেন বর্গাচাষী। তখন বীজ ধান ছাড়া ফসল উৎপাদনের বস্তুগত উপকরণ বাবদ তেমন খরচ ছিল না। উৎপাদনের মূল উপকরণ ছিল শ্রম। বর্গাচাষী এই শ্রম যোগাতেন। তার সঙ্গে হাল-বলদও বর্গাচাষী যোগাতেন। বস্তুত হাল-বলদ না থাকলে কারো পক্ষে বর্গায় জমি পাওয়া দুষ্কর হতো। আধিভাগের বিপরীতে তেভাগা আন্দোলনের দাবি ছিল যে, ফসল হবে তিন ভাগ, যার দু'ভাগ পাবে কৃষক (বর্গাচাষী), আর এক ভাগ পাবে

জমির মালিক। কিন্তু তেভাগা আন্দোলনের ঐতিহ্য সত্ত্বেও বাংলাদেশে সাধারণভাবে আধিভাগই প্রচলিত ছিল।

সময়ে এ পরিস্থিতির পরিবর্তন হতে থাকে। রাসায়নিক সার, কীটনাশক ঔষধ, এবং যান্ত্রিক সেচের আবির্ভাবের পর বস্তুগত উৎপাদন খরচ ফসল উৎপাদনের জন্য একটি বড় বিষয় হয়ে ওঠে, এবং এর অভিঘাতে বাংলাদেশে বর্গাশর্তের বিবর্তন শুরু হয়। বস্তুগত উৎপাদন খরচ কে কতটুকু বহন করবে এবং ফসল ভাগাভাগির ক্ষেত্রে তার প্রভাব কী হবে, তা নিয়ে দর-কষাকষি শুরু হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে মালিকেরা উৎপাদনের বস্তুগত উপকরণ খরচেরও অর্ধেক বহন করা শুরু করে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তারা এই খরচ পুরোপুরিই বর্গাচাষির উপর চাপিয়ে দেয়। এই দর-কষাকষির ধারাতেই বর্গার রূপটি এখন বহুলাংশে "ভাগচাষ" থেকে "চুক্তি-প্রথা"তে বিবর্তিত হয়েছে। বর্গাদারেরা এখন মালিকদের কাছ থেকে নির্দিষ্ট অর্থের বিনিময়ে জমি নেন এবং ফসল উৎপাদনের সকল খরচ বহন করেন ও পুরো ফসলের অধিকারী হয়। এটা অনেকটা ইংল্যান্ডের "ফার্মার মডেলে"র (কৃষি-উদ্যোক্তা মডেল) মতো (অনুচ্ছেদ ৫ দ্রষ্টব্য)। এই মডেলে ভূস্বামীদের নিকট থেকে কৃষি-উদ্যোক্তারা নির্দিষ্ট খাজনার (রেন্ট) বিনিময়ে জমি ভাড়া নেয়, এবং কৃষি-শ্রমিক নিয়োজিত করে জমি চাষ করে। কৃষি শ্রমিকেরা মজুরি পায়; আর উৎপাদন থেকে লাভ পায় কৃষি-উদ্যোক্তা।

তবে উপর্যুক্ত সমধর্মিতার পাশাপাশি ইংল্যান্ডের ফার্মার মডেল আর বাংলাদেশের বর্তমানের চুক্তি-প্রথার মধ্যে অনেক পার্থক্যও আছে। প্রথমত, বাংলাদেশের বর্তমান জমি মালিকেরা ঠিক ইংল্যান্ডের সামন্তযুগের ধারাবাহিকতা সম্পন্ন ভূস্বামীদের মতো নয়। এরা অধিকাংশই ধনী এবং মাঝারী কৃষকের পর্যায়ে পড়েন। এদের মধ্যে অনেকে আবার এখন অনুপস্থিত মালিক। দ্বিতীয়ত, ইংল্যান্ডের ফার্মারেরা সম্পূর্ণতই কৃষি মজুর নিয়োগ করে চাষ করতো। বিপরীতে বাংলাদেশে চুক্তিতে জমি গ্রহণকারীরা অনেক ক্ষেত্রে নিজেরাই জমি চাষ করেন। তাদের কর্তৃক মজুরী শ্রম ব্যবহারের মাত্রা তুলনামূলকভাবে কম। সুতরাং, চুক্তিতে বিবর্তন সত্ত্বেও বাংলাদেশে বর্গার তলবর্তী কার্য-কারণসমূহ এখনও অনেকটা আগের মতোই রয়ে গেছে। তবে চুক্তিতে বিবর্তিত হওয়ার মধ্য দিয়ে বর্গাপ্রথা কৃষির পরিবর্তিত প্রযুক্তিগত পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেয়ার চেষ্টা করেছে।

বর্গা সংক্রান্ত অর্থনীতিবিদদের আলোচনার সঙ্গে পরিচিতরা জানেন যে, সাধারণভাবে ভাগচাষের একটি অদক্ষতার দিক থাকে। যেহেতু উৎপাদন বৃদ্ধি পেলে বর্ধিত উৎপাদনের পুরোটা বর্গাচাষী পায় না, সেহেতু উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে তাঁর প্রণোদনায় ঘাটতি থাকে। তবে অন্যদিকে ভাগচাষের একটি অর্থনৈতিক যৌক্তিকতাও ছিল। সেটি নিম্নরূপ আগে ফসলের পরিমাণ ছিল অনিশ্চিত, কারণ তা বৃষ্টি, বন্যা, খরা, ইত্যাদি প্রাকৃতিক ঘটনার উপর নির্ভর করতো। এসব ঘটনার উপর বর্গাচাষীর নিয়ন্ত্রণ থাকতো না। ভাগচাষ প্রথার মাধ্যমে মালিক এবং কৃষক এই অনিশ্চয়তা ভাগাভাগি করে নিতো। এরূপ অনিশ্চয়তার পরিস্থিতিতে চুক্তিপ্রথা অবলম্বন করা কঠিন ছিল, কারণ বর্গাচাষীদের পক্ষে পূর্বনির্ধারিত অর্থ পরিশোধ করা সহজ হতো না।

কিন্তু বিগত সময়কালে কৃষিতে বস্তুগত উপকরণ খরচ বৃদ্ধি পাওয়ার পাশাপাশি আরেকটি যে বড় পরিবর্তন ঘটেছে তা হলো, উৎপাদনের অনিশ্চয়তার হ্রাস। এর একটি বড় কারণ হলো বৃষ্টি নির্ভর সেচের পরিবর্তে এখন যান্ত্রিক সেচের প্রসার ঘটেছে। আগে বাংলাদেশে প্রধান উৎপাদিত শস্য ছিল আমন এবং আউস ধান। এ দু'য়ের জন্যই বৃষ্টির এবং নদীর (প্লাবনের) পানির পরিমাণ এবং সময়োপযোগিতা বড় বিষয় ছিল। কিন্তু এখন বাংলাদেশে বোরো ধান প্রধান শস্যে পরিণত হয়েছে। শীতকালে উৎপাদিত বোরো ধান বহুলাংশে যান্ত্রিক (মূলত নলকূপ দ্বারা উত্তোলিত ভূগর্ভস্থ পানি দ্বারা) সেচের উপর নির্ভর করে। ফলে ফসলের পরিমাণ সম্পর্কে অনিশ্চয়তা বহুলাংশে হ্রাস পেয়েছে। এই পরিস্থিতিতে বর্গাচাষীদের পক্ষে জমি মালিকদের পূর্বনির্দিষ্ট পরিমাণ টাকার প্রতিশ্রুতি দেয়া সম্ভব হচ্ছে। ফলে বর্গা এখন ভাগচাষের পরিবর্তে চুক্তিপ্রথায় রূপান্তরিত হতে পেরেছে। এই রূপান্তর ভাগচাষের যে অদক্ষতা ছিলো, তা কমানোতে সহায়ক হয়েছে। ফলে মোট জমির প্রায় এক-তৃতীয়াংশ এখন বর্গার অধীন থাকা সত্ত্বেও সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশের কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে।

উপর্যুক্ত ঘটনাবলীর আলোকে বলা যেতে পারে, বাংলাদেশের কৃষিতে উৎপাদন সম্পর্ক স্বতস্ফূর্তভাবেই প্রযুক্তিগত বিকাশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিচ্ছে। এর জন্য জমির পুনর্বিতরণ বা এ ধরনের কোনো রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের প্রয়োজন হয় নি। অন্য ভাষায়, ভূমি সংস্কার ছাড়াই বাংলাদেশের কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। এমতাবস্থায়, কৃষি উৎপাদন সম্পর্কের ক্ষেত্রে কোন রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের প্রয়োজনীয়তা আছে কী?

এ প্রশ্নের উত্তরে প্রথমে বলা দরকার যে, ভাগচাষ থেকে চুক্তি-প্রথাতে বিবর্তনের ফলে উৎপাদন প্রণোদনা সমস্যার পূর্ণ লাঘব হয়েছে কিনা, তা স্পষ্ট নয়। অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানিক পরিবর্তন যে এক্ষেত্রে আরও কার্যক্ষম হতে পারতো না, তা নিশ্চিত করে বলা কঠিন। দ্বিতীয়ত, আয় বিতরণের উপর ভাগচাষের পরিবর্তে চুক্তিপ্রথার প্রবর্তন কী প্রভাব ফেলেছে তা দেখা প্রয়োজন। ভাগচাষের তুলনায় চুক্তিপ্রথার অধীনে যে অধিকতর সমতাধর্মী বিতরণ অর্জিত হবে এমন কোনো কথা নেই; বরং বিপরীত হতে পারে। কাজেই সে বিষয়টিও বিবেচনায় নেয়া দরকার। এ প্রসঙ্গে প্রতিবেশী পশ্চিমবঙ্গের "অপারেশন বর্গা" কর্মসূচির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এই কর্মসূচির একটি লক্ষ্য ছিল বর্গাচাষীর জন্য অনিশ্চয়তা হ্রাস। তবে তা এমনভাবে করার প্রয়াস গৃহীত হয়েছিল যাতে অধিকতর সমতা অথবা ন্যায্যতাও প্রতিষ্ঠিত হয়।[৫৩]

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো যে, সমবায়ী গ্রামের উপযোগিতা শুধুমাত্র মাইক্রো পরিধির প্রণোদনা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ নয়। এই উপযোগিতা আরও বৃহত্তর পরিধির। ইতিপূর্বেই সে বিষয়ে কিছুটা ইংগিত দেয়া হয়েছে। এখন সে বিষয়টি আরেকটু বিস্তারিত দেখা প্রয়োজন।

১২. সমবায়ী গ্রামের অব্যাহত প্রয়োজনীয়তা

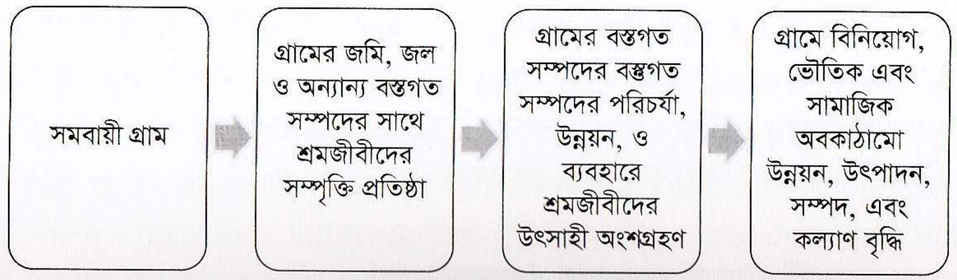
গ্রামের সমবায়ীকরণের পক্ষে যুক্তি ব্যাপক পরিধির। আন্তর্জাতিক এবং জাতীয় পরিস্থিতির উপর্যুক্ত বিভিন্ন পরিবর্তন সত্ত্বেও এসব যুক্তি এখনও প্রযোজ্য। উপরন্তু জলবায়ু পরিবর্তন এবং অন্যান্য কিছু কারণে এই প্রয়োজনীয়তা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। নীচে আমরা তার কিছু দিকের প্রতি দৃষ্টি দেব।

১২.১ নিয়োজন এবং বিনিয়োগ বৃদ্ধি

বাংলাদেশে সমবায়ী গ্রামের পেছনে মূল যুক্তিটি পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে (অনুচ্ছেদ ৭ দ্রষ্টব্য)। সংক্ষেপে তা নিম্নরূপ। গ্রামের প্রধান সম্পদ হলো জন-জমি-জল। এসব সম্পদের সুষ্ঠ ব্যবহারের জন্য প্রয়োজন জন সম্পদ নিয়োজনের মাধ্যমে জমি ও জল সম্পদের যথাযথ উন্নয়ন ও ব্যবহার। ঘনিষ্ঠ বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, এই বিনিয়োগ এবং ব্যবহার অর্জিত না হওয়ার পথে মূল বাধাটি হলো প্রতিষ্ঠানিক (তথা মালিকানাগত)। জমি এবং জল সম্পদের উন্নয়ন এবং সুষ্ঠু ব্যবহারের লক্ষ্যে নিয়োজিত শ্রম এবং বিনিয়োগ দ্বারা উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। কিন্তু যেহেতু গ্রামের শ্রমজীবীদের মূল অংশটি এসব সম্পদের

মালিকানা থেকে বঞ্চিত, সেহেতু তারা এই উৎপাদন বৃদ্ধির যথাযথ অংশ পায় না; ফলে তারা এসব সম্পদের উন্নয়ন ও ব্যবহারে স্বেচ্ছাশ্রম অথবা স্বল্প মুজুরির ভিত্তিতে অংশগ্রহণের আগ্রহ বোধ করে না। গ্রামের সমবায়ীকরণ এই প্রাতিষ্ঠানিক বাধা লাঘব করতে পারে। গ্রামের সমবায়ীকরণ জমি এবং জল সম্পদের সঙ্গে সকল শ্রমজীবীকে প্রত্যক্ষভাবে সম্পৃক্ত করতে পারে। ফলে তা গ্রামের শ্রম সম্পদের বিভিন্নমুখী বিনিয়োগ এবং নিয়োজনের ক্ষেত্র উন্মোচিত করতে পারে, এবং গ্রামের জীবনে আমূল ইতিবাচক পরিবর্তন ডেকে আনতে পারে।[৫৪] চিত্র-১ এই কার্যকারণ সম্পর্ককে সংক্ষেপে প্রকাশ করে।

চিত্র-১। সমবায়ী গ্রামের পক্ষে মূল যুক্তি



গ্রামের সমবায়ীকরণ যে গ্রামাভ্যন্তরে বিনিয়োগ এবং নিয়োজন বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে, তা সত্তর দশকে যেসব অর্থনীতিবিদেরা জমি স্বল্পতার কারণে যৌথচাষের প্রস্তাব করেছিলেন তাঁরাও লক্ষ্য করেছিলেন। বস্তুত এই সম্ভাবনাকেই তাঁরা সমবায়ীকরণের একটি মূল যুক্তি হিসেবে দেখেছিলেন। যেমন ফা'ল্যান্ড এবং পারকিনসন তাঁদের আলোচনায় লক্ষ্য করেন যে, সমবায়ীকরণ

> যে গ্রামীণ সমাজের অভ্যন্তরে তাঁরা বসবাস করেন, তার মধ্যেই বিভিন্ন ধরণের কাজে শ্রমজীবীদের নিয়োজনের সুযোগ করে দিবে; এবং জমির উৎপন্ন থেকে প্রাপ্ত আয় দ্বারা এই নিয়োজনের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থসংস্থান সম্ভব হবে (Faaland and Parkinson 1976, p. 88)।[৫৫]

বস্তুত, স্বাধীনতার পর প্রণীত বাংলাদেশের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় জন সম্পদ নিয়োজনের বিষয়টির উপর বেশ জোর দেয়া হয়েছিল। রেঁনে দুঁমোর মন্তব্যের প্রতিধ্বনি করে সেখানে লক্ষ্য করা হয়েছিল যে, বাংলাদেশে সবচেয়ে দৃশ্যগোচর বিষয় হলো, "প্রচুর কাজ সম্পাদনের অপেক্ষায় পড়ে আছে, অথচ

প্রচুর লোক কাজ ছাড়া বিচরণ করছে।" এ অবস্থা প্রতিকারের লক্ষ্যে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা দলিলে "উন্নয়নের জন্য শ্রম মবিলাইজেশন" শিরোনামে একটি পৃথক পরিচ্ছেদ সংযোজিত হয়েছিল, এবং তাতে কিভাবে বাংলাদেশের বিপুল শ্রমশক্তিকে অন-টাকাকৃত (নন-মনেটাইজড) ও অন-বাজার (নন-মার্কেট) পদ্ধতিতে বিভিন্ন উন্নয়ন অভিমুখী কাজে নিয়োজিত করা যায়, সে বিষয়ে মূল্যবান আলোচনা পরিবেশিত হয়েছিল। এই পরিকল্পনা কমিশনের উপ-সভাপতি, বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ, নূরুল ইসলাম পরবর্তীতে তাঁর বিভিন্ন পুস্তকে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা অব্যাহত রাখেন। যেমন, *ডেভেলপমেন্ট প্ল্যানিং ইন বাংলাদেশ* (বাংলাদেশে উন্নয়ন পরিকল্পনা) শীর্ষক পুস্তকে তিনি লক্ষ্য করেন যে,

> বর্তমানে এবং আগামী বহু বছর যাবত জনশক্তিই হবে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় এবং গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ। সুতরাং কিভাবে উৎপাদনশীল কাজ সবচেয়ে শ্রমঘন পদ্ধতিতে এবং সবচেয়ে কম বাড়তি মজুরী-দ্রব্যাদির প্রয়োজনীয়তা উদ্রেক করে সম্পাদন করা যায়, বাংলাদেশের নীতি নির্ধারকদের জন্য তা একটা জরুরী প্রশ্ন হিসেবে বিরাজ করবে (Islam 1978, p. 211)[৫৬]।

প্রায় একই সময় প্রকাশিত *ডেভেলপমেন্ট স্ট্র্যাটেজি অফ বাংলাদেশ* (বাংলাদেশের উন্নয়ন কৌশল) বইতে তিনি আরও লক্ষ্য করেন যে, প্রত্যক্ষ কৃষিকাজ ছাড়াও গ্রামাঞ্চলে বিভিন্ন পুঁজি নির্মাণমূলক কাজে, যেমন ভৌতিক অবকাঠামো নির্মাণে শ্রমের উৎপাদনশীল নিয়োগের বহু এবং বিভিন্ন সুযোগ রয়েছে (Islam 1979, p. 208)।

গ্রামের জমি ও জল সম্পদের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে বাংলাদেশের বিপুল শ্রমশক্তির নিয়োজন সুগম করার বিষয়ে অর্থনীতিবিদদেরা উপরোদ্ধৃত যেসব চিন্তা ও প্রস্তাব সত্তরের দশকে উত্থাপন করেছিলেন, তা আজও প্রযোজ্য। যদিও বিগত সময়কালে বাংলাদেশের গ্রামে কৃষি এবং কৃষি বহির্ভূত নিয়োজন বৃদ্ধি পেয়েছে, কিন্তু একই সময়ে জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে শ্রমশক্তির পরিমাণও বৃদ্ধি পেয়েছে। গ্রামের সমবায়ীকরণ এই শ্রমশক্তির আরও পূর্ণাংগ নিয়োজনের পথটি উন্মোচিত করবে; এর জন্য যে যৌথ উদ্যোগ প্রয়োজন তা সুগম করবে।

১২.২ নদ-নদী এবং জলাশয়সমূহের সংস্কার এবং উন্নয়ন

শ্রম নিয়োজনের লক্ষ্য হিসেবে জমি এবং জল সম্পদের উন্নয়ন ও পরিচর্যার যে কথা উপরে উল্লিখিত হয়েছে, তা বাস্তবায়নের জন্য বহু ধরনের

কর্মধারার প্রয়োজন হবে। এর একটি হলো নদ-নদী, খাল-বিল, দীঘি-পুকুর, এবং অন্যান্য জলাধারের সংস্কার এবং উন্নয়ন। প্রয়োজনীয় সংস্কারের অভাবে এসব আজ বহুলাংশে বিনষ্ট কিংবা ভরাট হয়ে গেছে। এ কারণে এবং সাধারণভাবে নদ-নদীর অব্যবস্থাপনার ফলে বাংলাদেশে এখন জলাবদ্ধতা এক বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে (এ বিষয়ে নীচে আমরা আরও আলোচনা করবো)। অনেক ক্ষেত্রে এই জলাবদ্ধতা জাতীয় পর্যায়ে নীতিমালার পরিবর্তন এবং পদক্ষেপ গ্রহণ ছাড়া সমাধান সম্ভব নয়। আবার অন্যান্য ক্ষেত্রে এসব জলাবদ্ধতার প্রতিকার স্থানীয় পর্যায়ে পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমেই সম্ভব। কোথাও এর জন্য প্রয়োজন একটি খাল সংস্কার অথবা খনন; কোথাও এর জন্য প্রয়োজন একটি ভ্রান্ত বাঁধের কিংবা স্লুইস গেটের অপসারণ। এসব কাজ গ্রামবাসীদের আয়ত্বের মধ্যে। কিন্তু গ্রাম পর্যায়ে প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর অনুপস্থিতিতে যৌথ উদ্যোগের মাধ্যমে গ্রামের নিজস্ব শক্তি ব্যবহৃত হতে পারছে না। ফলে এসব সহজ কাজও সম্পাদিত হয় না; মাসের পর মাস, বছরের পর বছর সকল গ্রামবাসী ভুগতে থাকে। সমবায়ীকরণ গ্রামকে এরূপ স্থবিরতা ও "চলৎশক্তিহীনতা" থেকে মুক্তি দিতে পারে।

১২.৩ নদ-নদী সংস্কার ও পরিচর্যা এবং আন্তঃগ্রাম সহযোগিতা

নদ-নদী সংস্কারের জন্য স্বাভাবিকভাবেই আন্তঃগ্রাম সহযোগিতার প্রয়োজন হবে। কোনো নদীই এক গ্রামে সীমাবদ্ধ নয়। কাজেই বহু গ্রামের সহযোগিতা ভিন্ন নদ-নদীর সংস্কার সম্ভব নয়। গ্রামের সমবায়ীকরণ আন্তঃগ্রাম সহযোগিতাকে সহজ করবে, কেননা তখন গ্রামের পক্ষ থেকে কথা বলার, দেন-দরবার করার, গ্রামের স্বার্থ রক্ষার জন্য একটি প্রতিষ্ঠান থাকবে।

লক্ষণীয়, নদ-নদীর পুনরুজ্জীবন একটি বিশাল করণীয়। এটা কতিপয় ড্রেজার আমদানী করে কেবল নৌযান চলাচলের জন্য চ্যানেল উন্মুক্ত করার বিষয় নয়। নদী খাতসমূহের যৌক্তিকীকরণ ও স্থিতিশীলীকরণ এবং তার মাধ্যমে নদী ভাংগনের প্রশমণ কিংবা অবসানও এ করণীয়র অন্তর্ভুক্ত। তদুপরি, এটা কেবল একবার সম্পাদিতব্য করণীয় নয়। বাংলাদেশের নদ-নদী (ও অন্যান্য জলাশয়ের) পরিচর্যা ও জল-জমির মধ্যকার প্রয়োজনীয় সম্পর্ক ও ভারসাম্য বজায় রাখা একটি স্থায়ী করণীয়, যা কখনো শেষ হবে না। এটা কোটি কোটি মানুষের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের বিষয়। সুতরাং এই করণীয় সম্পাদনের জন্য স্থায়ী প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর প্রয়োজন। সমবায়ীকরণের মাধ্যমে গ্রামের

জমি ও জল সম্পদের উপর গ্রামের সকলের অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠা দ্বারাই এ কর্মোদ্যোগ সম্ভব হতে পারে।

বড় নদ-নদীগুলির সংস্কার, নদী-শাসন, এবং নদীখাত স্থিতিশীল করা, ইত্যাদি নিঃসন্দেহে জাতীয় পরিধির করণীয় বিষয়। তবে এ ধরনের জাতীয় পরিকল্পনা বাস্তবায়নেও সমবায়ী গ্রাম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। লক্ষণীয়, বাংলাদেশের গড় জনসংখ্যা ইতিমধ্যেই প্রতি বর্গমাইলে ১,০০০ ছাড়িয়ে গেছে। যদি বড় নদ-নদী খাতের আয়তন বাংলাদেশের মোট আয়তনের ৫ শতাংশ হয়, তাহলে প্রতি বর্গমাইল নদীখাতের জন্য ২০,০০০ বাংলাদেশী পাওয়া সম্ভব। এই বিপুল পরিমাণ জন সম্পদ দ্বারা নিশ্চয়ই নদীখাতের এক বর্গমাইল সংস্কার করা সম্ভব। নদ-নদী পুনঃখননের পাশাপাশি "যতিপূর্ণ বাধ" নির্মাণও একটি বিপুল কর্মাধারা হতে পারে। নদ-নদীর প্রতি সঠিক পন্থা অনুসরণের প্রশ্নের সঙ্গে জড়িত এই বিষয়টি নিয়ে আমরা নীচে আরও আলোচনা করেছি।

১২.৪ সমবায়ী গ্রাম এবং বিকল্প নদী কৌশল

বদ্বীপ পরিস্থিতিতে নদীখাত এবং প্লাবনভূমি একে অপরের পরিপূরক। বর্ষাকালে নদীখাতে পানির স্থানের সংকুলান হয় না; প্লাবনভূমিতে তা উপচে পড়ে, এবং প্লাবনভূমি তা ধারণে সহায়তা করে। এর মধ্য দিয়ে প্লাবনভূমিও নদীর পানি এবং পলিমাটি দ্বারা বিভিন্নভাবে উপকৃত হয়, যেমন: (ক) প্লাবনভূমির উচ্চতা বাড়ে; (খ) আউস-আমন ধান ও অন্যান্য ফসল প্রাকৃতিক পদ্ধতির সেচ পায়; (গ) প্লাবনভূমির জলাশয়সমূহের নবায়ন ঘটে; (ঘ) ভূ-গর্ভস্থ পানির নবায়ন বৃদ্ধি পায়; (ঙ) প্লাবন ভূমিতে সঞ্চিত পানি শীতকালের বিভিন্ন প্রয়োজন মেটায় এবং নদীপ্রবাহ বৃদ্ধিতেও সহায়তা করে; (চ) উন্মুক্ত মাছ সম্পদের সংরক্ষণ করে; (ছ) নৌপরিবহন সুগম করে; (জ) সাধারণভাবে প্লাবনভূমির উদ্ভিদ ও প্রাণীজগতের পরিচর্যা করে এবং পরিচ্ছন্নতা রক্ষা করে। অন্যদিকে প্লাবনভূমিতে পানি ও পলিমাটি বিস্তৃত হওয়ার ফলে নদীখাতে কম পলিমাটি জমে; ফলে নদীখাতের গভীরতা বজায় থাকে, এবং নদীর পাড় ভাংগণের চাপ প্রশমিত হয়।

বদ্বীপ পরিস্থিতির সঙ্গে যাদের পরিচিতি কম তাদের পক্ষে নদীখাত এবং প্লাবনভূমির মধ্যকার এই পরস্পর নির্ভরশীলতা ও অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক বোঝা কঠিন। ফলে তারা অনেকসময় ভ্রান্ত ধারণা দ্বারা পরিচালিত হয় এবং নদ-নদীর প্রতি

"অবরোধ পন্থা" সুপারিশ ও অবলম্বন করে। এই পন্থা নদ-নদীর প্রতি সাধারণভাবে অনুসৃত "বাণিজ্যিক পন্থা"র একটি সুনির্দিষ্ট রূপ, এবং তা প্লাবনভূমি এবং বদ্বীপ অঞ্চলে পরিদৃষ্ট হয়। অবরোধ পন্থার পেছনের মূল চিন্তাটি হলো, যতিহীন বাঁধ (বা বেড়ীবাঁধ) নির্মাণের মাধ্যমে প্লাবনভূমিকে নদী খাত থেকে অবরুদ্ধ বা বিচ্ছিন্ন করে ফেলা। ধারণা করা হয় যে, এর ফলে প্লাবন ভূমি বন্যা থেকে রক্ষা পাবে এবং তাতে বেশি ফসল উৎপন্ন করা যাবে।

ষাটের দশকে বিদেশি পরামর্শকেরা বাংলাদেশের উপর অবরোধ পন্থাটি আরোপ করে। পঞ্চাশের দশকে একাধিকবার সংঘটিত বড় বন্যার প্রেক্ষিতে পাকিস্তান সরকারের আমন্ত্রণে জাতিসংঘের কারিগরি সহায়তা কার্যক্রমের আওতায় বিদেশ থেকে ক্রুগ কমিশন আসে। এই কমিশন পানি ও বিদ্যুৎ উন্নয়নের লক্ষে একটি পৃথক সংস্থা গঠনের সুপারিশ করে। সেই সূত্রে "পূর্ব পাকিস্তান পানি ও বিদ্যুৎ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (ইপিওয়াপদা)" প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৬৪ সনে এই সংস্থার করণীয় হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের ইন্টারন্যাশনাল ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানি (আই-ই-সি) অবরোধ পন্থা অনুসারী একটি মাস্টার প্ল্যান (মহা-পরিকল্পনা) প্রণয়ন করে।[৫৭] ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ-ডেমরা (ডি-এন-ডি) প্রকল্প,ব্রহ্মপুত্র ডান তীরবর্তী বাঁধ প্রকল্প, উপকূলীয় বাঁধ প্রকল্প, ইত্যাদিসহ প্রায় ২৭টি প্রকল্প এই মহা-পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত হয়। এর কিছু আগে থেকেই বাস্তবায়নের পথে ছিল, আর বাকী ছিল নতুন। তারপর থেকে এসব প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ শুরু হয়। প্রতি বছর দেশের উন্নয়ন বাজেটের প্রায় বিশ শতাংশ এসব প্রকল্পের বাস্তবায়নে ব্যয়িত হয়।

প্রথমাবস্থায় এসব প্রকল্প কোনো কোনো ক্ষেত্রে কিছু সাফল্য প্রদর্শন করলেও, সময়ে তাদের বিভিন্ন ত্রুটি এবং কুফলসমূহ স্পষ্ট হতে থাকে। একদিকে পলিমাটির অভাবে প্লাবনভূমির উচ্চতাবৃদ্ধির প্রক্রিয়া থমকে যায়; এমনকি ক্ষেত্রবিশেষে উচ্চতা হ্রাস পায়। অন্যদিকে, অতিরিক্ত পলিমাটিভরণের কারণে নদীখাত ভরাট হয়ে যায়। ফলে এক বিপজ্জনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। অবরোধ পন্থার অন্যতম ক্ষতিকর অভিপ্রকাশ হলো জলাবদ্ধতার প্রসার। বেড়িবাঁধ যেমন নদীর পানি প্লাবন ভূমিতে প্রসারিত হতে দেয় না, তেমনিভাবে তা বৃষ্টির পানি প্লাবনভূমি থেকে নদীখাতে সরে যাওয়া (তথা নিষ্কাশন)-কে বাধাগ্রস্থ করে। ফলে সেচ এবং নিষ্কাশন উভয়ের জন্যই স্বাভাবিক প্রাকৃতিক পন্থার পরিবর্তে যান্ত্রিক পাম্পের উপর নির্ভর করতে হয়, এবং প্রায়শ তা অপর্যাপ্ত এবং অকার্যকর বলে প্রমাণিত হয়। ফলে জলাবদ্ধতা দেখা দেয়। শহর

এবং গ্রামাঞ্চল – উভয়স্থানেই এখন জলাবদ্ধতা বিস্তৃত হচ্ছে। বাংলাদেশের নদ-নদী এবং জলাশয়ের বর্তমান দুরাবস্থা এবং ক্রমবর্ধমান জলাবদ্ধতার জন্য অবরোধ পন্থাই মূলত দায়ী। প্লাবন ভূমি এবং নদী খাত – উভয়ের জন্যই এই পন্থা ক্ষতিকর হয়েছে। অবরোধ পন্থার বিভিন্ন কুফল নিয়ে আমরা অন্যত্র বিস্তারিত আলোচনা করেছি; সুতরাং এখানে তার পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নেই।[৫৮]

উপরের অভিজ্ঞতার আলোকে পরিষ্কার, অবরোধ পন্থা বাংলাদেশের জন্য উপযোগী নয়। বাংলাদেশের জন্য প্রয়োজন হলো নদ-নদীর প্রতি "উন্মুক্ত পন্থা"।[৫৯] এই পন্থার মূল লক্ষ্য হলো প্লাবনভূমির সঙ্গে নদীখাতের সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখা এবং আরও গভীর করা, যাতে এই সম্পর্কের সুফল থেকে উভয়ের উপকৃত হওয়ার ধারা অব্যাহত থাকতে পারে। সেজন্য প্রয়োজন নদী ও প্লাবনভূমির মধ্যকার এবং প্লাবনভূমিতে পানির চলাচলের উপর সৃষ্ট বাধাসমূহের অপসারণ; নদীর সঙ্গে প্লাবনভূমির সংযোগ রক্ষাকারী খালসমূহের পুনরুজ্জীবন ও সম্প্রসারণ; প্রয়োজনবোধে নতুন খাল খনন; প্লাবনভূমিতে অবস্থিত সকল পুকুর, দীঘি, বিল, অন্যান্য জলাশয়সমূহের সংস্কার, যাতে বর্ষাকালে নদীর পানি প্লাবন ভূমিতে সর্বাধিক বিস্তৃত হওয়ার ও সঞ্চিত থাকার সুযোগ পায় এবং সে পানি শীতকালে ব্যবহার করা যায়, এবং যাতে প্রাকৃতিক পদ্ধতির সেচ এবং নিষ্কাশন ব্যবস্থা সচল থাকে এবং এসবের জন্য পাম্পের উপর নির্ভর করতে হয় না।

বলাবাহুল্য যে, গ্রামের সমবায়ীকরণ নদ-নদীর প্রতি অবরোধ পন্থা পরিত্যাগ করে উন্মুক্ত পন্থা গ্রহণের জন্য বিশেষভাবে উপযোগী। উন্মুক্ত পন্থা বাস্তবায়নের জন্য যে বিপুল পরিমাণ শ্রমের প্রয়োজন হবে, তা গ্রামের সমবায়ীকরণ ভিন্ন সংগঠিত করা কঠিন। স্পষ্টতই, উন্মুক্ত পন্থাজনিত কর্মকান্ডের ফলে জমি ও পানি সম্পদের উন্নয়ন সাধিত হবে। আগেই উল্লিখিত হয়েছে, সমবায়ীকরণের মাধ্যমে গ্রামের বিপুল শ্রমজীবী অংশকে এসব সম্পদের অংশীদার করা গেলে তারা এসব সম্পদ উন্নয়নের কাজে শ্রম দিতে এগিয়ে আসবেন, কেননা তখন এসব সম্পদ উন্নয়নের সুফলের তাঁরাও ভাগীদার হবেন। সুতরাং, নদ-নদীর প্রতি উন্মুক্ত পন্থা বাস্তবায়নের জন্যও গ্রামের সমবায়ীকরণ প্রয়োজন।

লক্ষণীয়, বর্তমানের অবরোধ পন্থাপ্রসূত প্রকল্প প্রণয়ণে গ্রামবাসীদের সাধারণত তেমন কোনো ভূমিকা থাকে না, এবং এসব প্রকল্প বাস্তবায়নেও তাদের কোনো সমষ্টীগত ভূমিকা থাকে না। শুধুমাত্র শ্রমজীবীরা মুজুরীর

বিনিময়ে এসব প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজে অংশগ্রহণ করে থাকেন। অন্য ভাষায়, অবরোধ পন্থা হলো উপর থেকে চাপানো একটি আমলাতান্ত্রিক পন্থা। কিন্তু দুঃখজনক, এসব প্রকল্পের কুফল দ্বারা গ্রামের সকলেই আক্রান্ত হয়। বিপরীতে, উন্মুক্ত পন্থার অধীনে সমবায়ী গ্রামসমূহই প্রকল্প নির্বাচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে। গৃহীত প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের জন্য গ্রামের সদস্যরা নিজেরাই কী কী সম্পদ যোগাতে পারে, উপরিস্থিত সরকারের কাছ থেকে কী কী সম্পদ প্রয়োজন, এবং কীভাবে এসব সম্পদের দক্ষ ব্যবহার অর্জিত হতে পারে, ইত্যাদি বিষয়ে গ্রামসমূহ সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে পারবে। সুতরাং, উন্মুক্ত পন্থা হবে নীচ-থেকে উৎসারিত গণমুখী পন্থা।

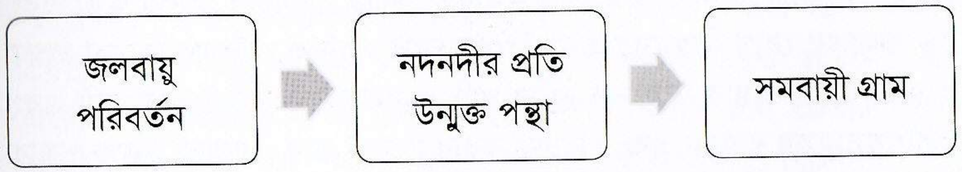
লক্ষ্যনীয়, বাংলাদেশের নদ-নদীর বর্তমান দুরাবস্থার জন্য কেবল দেশের অভ্যন্তরে অনুসৃত অবরোধ পন্থা এবং অন্যান্য ক্ষতিকর ক্রিয়াকাণ্ড (যেমন নদী দূষণ ও দখল) দায়ী নয়। আরেকটি বড় কারণ হলো বহিস্থ চরিত্রের। সেটা হলো, উজানের দেশসমূহ, বিশেষত ভারত কর্তৃক বাংলাদেশের নদ-নদীর পানি প্রত্যাহার বা অপসারণ। ভারতের এই আচরণের মূলেও রয়েছে নদ-নদীর প্রতি অনুসৃত বাণিজ্যিক পন্থা এবং তার অনুসারী অবরোধ পন্থা। সে কারণে বাংলাদেশ যদি আন্তরিকতার সঙ্গে উন্মুক্ত পন্থা গ্রহণ করে তবে তা ভারত কর্তৃক পানি প্রত্যাহার প্রতিরোধে বাংলাদেশের প্রচেষ্টাকে যুক্তিনিষ্ঠতা দিবে এবং জোরালো করবে।

১২.৫ জলবায়ু পরিবর্তন ও সমবায়ী গ্রাম

লক্ষণীয়, জলবায়ু পরিবর্তন বাংলাদেশের গ্রামের সমবায়ীকরণের প্রয়োজনীয়তাকে আরও জরুরী করে তুলেছে। উপরে আমরা লক্ষ্য করেছি, জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলার জন্য নদ-নদীর প্রতি উন্মুক্ত পন্থা প্রয়োজন। আবার নদ-নদীর প্রতি উন্মুক্ত পন্থা বাস্তবায়নের জন্য সমবায়ী গ্রামের প্রয়োজন। চিত্র-২ এই কার্যকারণ সম্পর্ক বোঝার জন্য সহায়ক:

জলবায়ু পরিবর্তন বাংলাদেশকে বিভিন্ন ধারায় আক্রান্ত করবে। তবে তার মধ্যে অন্যতম পাঁচটি ধারা হলো: (ক) নিমজ্জন, (খ) লবণাক্ততার প্রসার, (গ) নদ-নদীসমূহের প্রবাহের আন্ত-ঋতু চরমভাবাপন্নতা বৃদ্ধি; (ঘ) চরম আবহাওয়ামূলক ঘটনার – তথা ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, ইত্যাদির – প্রকোপ বৃদ্ধি; এবং (ঙ) রোগ-মহামারীর প্রকোপ বৃদ্ধি। এই প্রতিটি ধারা প্রতিরোধের জন্যই নদনদীর প্রতি বর্তমানের অবরোধ পন্থা পরিত্যাগ করে উন্মুক্ত পন্থা গ্রহণ করা

চিত্র ২। জলবায়ু পরিবর্তন এবং সমবায়ী গ্রাম



প্রয়োজন।[৬০] এ বিষয়ে আমরা অন্যত্র বিশদ আলোচনা করেছি (Islam 2016c দ্রষ্টব্য); সুতরাং এখানে তার বিস্তারিত পুনরুল্লেখের প্রয়োজন নেই। মূল কথাটি সংক্ষেপে নিম্নরূপ লক্ষ্য করা যেতে পারে।

প্রথমত, সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধিহেতু নিমজ্জনের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বর্ম হলো পলিমাটিভরণ। যুগ যুগ ধরে প্রতি বছর প্রায় দু'শ কোটি টন পলিমাটি বাংলাদেশের নদ-নদীসমূহ বয়ে এনেছে, এবং তা দিয়ে এই বদ্বীপ গঠন করেছে। পলিমাটিভরণ সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির বিরুদ্ধে এ বদ্বীপকে টিকে থাকতে সহায়তা করেছে। দুঃখজনকভাবে, ভারত কর্তৃক পানি প্রত্যাহার ও অন্যান্য কারণে এ পলিমাটির পরিমাণ ক্রমাগতভাবে হ্রাস পাচ্ছে। ইতিমধ্যে তা কমে বাৎসরিক প্রায় এক'শ কোটি টনে দাঁড়িয়েছে, এবং সেটুকুও অবরোধ পন্থা অনুসরণের ফলে সঠিকভাবে প্লাবনভূমিতে বিস্তৃত হতে পারছে না। নদ-নদীর প্রতি উন্মুক্ত পন্থা প্লাবনভূমিতে পলিমাটির প্রসারণকে সুগম করবে।[৬১] বাংলাদেশের মতো যদি ভারতও নদ-নদীর প্রতি উন্মুক্ত পন্থা গ্রহণ করে তবে তা পলির পরিমাণ বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে, এবং নিমজ্জন সমস্যাকে প্রশমিত করবে। দ্বিতীয়ত, নিমজ্জনের সমস্যা প্রশমিত হলে তা লবণাক্ততা প্রসারের সমস্যাও লাঘব করবে। উন্মুক্ত পন্থার মাধ্যমে যদি নদ-নদীর প্রবাহ বৃদ্ধি করা যায়, তবে তা সমুদ্রের জোয়ারের লবণাক্ত পানির দেশের আর ভেতরে প্রবেশকে প্রতিহত করতে পারবে। তৃতীয়ত, উন্মুক্ত পন্থা নদীপ্রবাহের আন্ত-ঋতু চরমভাবাপন্নতা বৃদ্ধি প্রশমণেও সহায়ক হবে, কেননা এ পন্থার ফলে প্লাবনভূমিতে বর্ষাকালের প্রবাহ আরও বেশি পরিমাণে সঞ্চিত করা সম্ভব হবে, এবং তা শীতকালের প্রবাহ বৃদ্ধিতে ব্যবহার করা যাবে। চতুর্থত, ঘুর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, ইত্যাদি চরম আবহাওয়ামূলক ঘটনার সময় সমুদ্রের পানি এবং বৃষ্টির পানি উভয়ই বৃদ্ধি পায়। এই পানি যতো দ্রুত সরে যেতে পারে ততোই মঙ্গল। কিন্তু উপকূলীয় এলাকায় অবরোধ পন্থা অনুসারী পোল্ডারসমূহ নির্মাণের

ফলে এই পানি দ্রুত নেমে যেতে পারে না; ফলে জলাবদ্ধতা দেখা দেয়। নদ-নদীর প্রতি উন্মুক্ত পন্থা এই জলাবদ্ধতা হ্রাস করে বাংলাদেশকে চরম আবহাওয়ামূলক ঘটনা মোকাবেলায় সহায়তা করবে। পঞ্চমত, জলাবদ্ধতা এবং বদ্ধ জলাশয় রোগ বিস্তারের জন্য বিশেষভাবে সহায়ক। উপরে আমরা লক্ষ্য করেছি, উন্মুক্ত পন্থার ফলে নদ-নদীর পানি প্লাবনভূমিতে বিস্তৃত হয়ে জমি এবং জলাশয়সমূহের নবায়ন এবং পরিচ্ছন্ন করার সুযোগ পায়। এছাড়া উন্মুক্ত পন্থার ফলে উপকূলীয় এলাকা এবং দেশের সর্বত্র জলাবদ্ধতা হ্রাস পাবে। সুতরাং পরিচ্ছন্নকরণ, নবায়ন, এবং জলাবদ্ধতা হ্রাসের মাধ্যমে নদ-নদীর প্রতি উন্মুক্ত পন্থা রোগ-মহামারীর বিপদ মোকাবেলাতেও বাংলাদেশকে সহায়তা করবে।

সুবিদিত, জলবায়ু পরিবর্তন আর ভবিষ্যতের বিষয় নয়; তা বর্তমান বাস্তবতার অংশ। আরও মনে রাখা প্রয়োজন, ইতিমধ্যেই বায়ুতে এত বেশি পরিমাণ কার্বন ডাই অক্সাইড সঞ্চিত হয়েছে যে, এখন যদি কার্বন ডাই অক্সাইড উদগীরণের পরিমাণ সবিশেষভাবে হ্রাস করাও হয়, তবু আগামীতে বেশ কিছু সময় ধরে জলবায়ু পরিবর্তন আরও ঘনীভূত হবে। কাজেই বাংলাদেশের জন্য আরও জলবায়ু পরিবর্তন প্রত্যাশা করা এবং তার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেয়া – তথা উপযোগীকরণ (এডাপটেশন) – ছাড়া আর কোনো উপায় নেই।

কিন্তু বাংলাদেশ কীভাবে জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য উপযোগীকরণ করতে পারে? নদ-নদীর প্রতি অবরোধ পন্থা পরিত্যাগ করে উন্মুক্ত পন্থা গ্রহণ নিঃসন্দেহে তার অন্যতম। কিন্তু এছাড়া কিংবা এর সঙ্গে সম্পর্কিত অন্যান্য বিভিন্ন পদক্ষেপেরও প্রয়োজন। যেমন বাস্তুভিটার উচ্চতা বৃদ্ধি, আবাদি জমির সমতলীকরণ (টেরাসিং), ইত্যাদির প্রয়োজন হবে। গ্রামের সদস্যদের বিচ্ছিন্নভাবে এগুলো করা কঠিন। কী কী ফসল চাষ করা প্রয়োজন, তা সমন্বিত করা দরকার হবে। বিভিন্ন ভৌতিক (ফিজিক্যাল) অবকাঠামো – রাস্তাঘাট, সেতু, বাঁধ, ইত্যাদি – প্রয়োজন হবে। এসব কিছুর জন্যই সমষ্টীগত প্রয়াস প্রয়োজন হবে। বিশেষত, দেশের উপকূলীয় অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, প্রভৃতি দুর্যোগ মোকাবেলার জন্য বিভিন্ন ধরনের সমষ্টিগত প্রয়াস অপরিহার্য। বলাবাহুল্য, এসব বিভিন্ন ধারার সমষ্টিগত প্রয়াস সংগঠিত করার জন্য সমবায়ী গ্রাম অধিকতর উপযোগী হবে। সুতরাং, বিভিন্ন বিচারেই স্পষ্ট যে, জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের টিকে থাকার জন্য গ্রামের সমবায়ীকরণ বিশেষভাবে জরুরী।

১২.৬ *নিয়োজন ও বিনিয়োগের অন্যান্য ধারা*

লক্ষণীয়, গ্রামের সমবায়ীকরণ যেসব লক্ষ্যে শ্রম নিয়োজনকে সুগম করবে তা শুধু জল এবং জমি সম্পদ উন্নয়নের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। আর বহু লক্ষ্য এবং ক্ষেত্রের জন্য এই সুযোগ বিরাজমান। সাধারণভাবে উন্নত জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় ভৌতিক এবং মানব অবকাঠামোর অভাব প্রায় প্রতিটি গ্রামেই প্রকট। রাস্তাঘাট, পুল-সাঁকো, স্কুল, পাঠাগার, চিকিৎসালয়, বিনোদন কেন্দ্র, ইত্যাদি সবকিছুই হয় পরিমাণগতভাবে অপর্যাপ্ত কিংবা গুণগতভাবে নিম্ন মানের। বর্তমানে এ সবকিছুর জন্যই গ্রামবাসীদেরকে হয় সরকারের কিংবা বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থা, কিংবা ব্যক্তিবিশেষের বদান্যতার উপর নির্ভর করতে হচ্ছে। অথচ উপযোগী প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর উপস্থিতিতে গ্রামবাসীরা নিজেরাই স্বনির্ভরতার ভিত্তিতে এসব উদ্যোগ নিতে পারে।

কৃষি উৎপাদন ছাড়াও গ্রামীণ অর্থনীতি অন্যান্য বিভিন্ন ধারায় বিকশিত হতে পারে। বিগত দশকগুলোতে তা কিছু কিছু হয়েছেও। এরজন্য অনেক ক্ষেত্রে যৌথ বিনিয়োগ প্রয়োজন। যেমন, গ্রামে একটি হিমাগারের উপস্থিতি দুধ, সবজি, ফল, ও অন্যান্য কৃষি উৎপন্নের ন্যায্য মূল্য পাওয়ায় প্রভূত সহায়ক হতে পারে। গ্রামে উৎপাদিত ফসলের প্রক্রিয়াজাতকরণের লক্ষ্যে শিল্প প্রতিষ্ঠার জন্যও যৌথ বিনিয়োগ প্রয়োজন। বর্তমানে এসব বিনিয়োগের জন্য হয় সরকারী অথবা ব্যক্তিবিশেষের উদ্যোগের উপর নির্ভর করতে হয়। কিন্তু নিজেদের বস্তুগত ও শ্রম সম্পদের একত্রীকরণের মাধ্যমে গ্রামবাসীরা নিজেরাই এরূপ বিনিয়োগে অগ্রসর হতে পারে। গ্রামে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রতিষ্ঠা এখন একটি জরুরী কাজ। এ লক্ষ্যেও গ্রামবাসীদের যৌথ প্রয়াস কার্যকর হতে পারে। আর্সেনিক-মুক্ত পানির সরবরাহ এরূপ আরেকটি কাজ। গ্রামবাসীরা যৌথতার ভিত্তিতে সংগঠিত হলে এসব বিভিন্ন উদ্যোগ আত্মনির্ভরতার ভিত্তিতে গ্রহণ করা সম্ভব। গ্রামে সোলার প্যানেল, বায়ুচালিত টারবাইন, কম্প্যুটার কেন্দ্র ইত্যাদি স্থাপনেও গ্রাম স্বনির্ভরভাবে উদ্যোগ নিতে পারে।[৬২]

১২.৭ *আন্তঃখাত সংযোগ, শিল্প, ও বৃহত্তর গ্রামীণ অর্থনীতি*

আন্তঃগ্রাম সহযোগিতার বিষয়টি পানি সম্পদ উন্নয়নের প্রসঙ্গে ইতিমধ্যেই উল্লিখিত হয়েছে। তবে আন্তঃগ্রাম সহযোগিতা অন্যান্য ক্ষেত্রের জন্যও প্রযোজ্য। যেমন, রাস্তাঘাট, পুল-সাঁকো, প্রভৃতি নির্মাণের ক্ষেত্রেও আন্তঃগ্রাম সহযোগীতা প্রয়োজন, কেননা অধিকাংশ ক্ষেত্রে একাধিক গ্রামের অধিবাসীরা

এসব ব্যবহার করবে। একইভাবে, গ্রামীণ শিল্প প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ অনেক ক্ষেত্রেই "আকার-সাশ্রয়" (স্কেল ইকনমি)-র কারণে এক গ্রামের ভিত্তিতে উপযোগী হবে না। একাধিক গ্রামের সম্পদ ও সংখ্যা যোগ হলেই এ ধরনের উদ্যোগ ফলপ্রসূ হতে পারবে।[৬৩] সমবায়ী গ্রাম এই সহযোগিতাকে সুগম করবে। অন্যান্য উৎপাদনশীল কর্মকান্ড এবং ভৌতিক ও সামাজিক অবকাঠামো নির্মাণ ও পরিচর্যার ক্ষেত্রেও আন্তঃগ্রাম সহযোগীতা প্রয়োজন।

১২.৮ জনসংখ্যা উত্তরণ

সমবায়ীকরণ গ্রামের জীবনে একটা গুণগত পরিবর্তনের সূচনা করার মাধ্যমে অন্যান্য বৃহত্তর উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনকে সুগম করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ জনসংখ্যা উত্তরণের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। বিগত কয়েক দশকে বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধিহার হ্রাস পেয়েছে সত্য; কিন্তু যেহেতু ভিত্তি জনসংখ্যা বেড়েছে, সেহেতু মোট হিসেবে বার্ষিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির পরিমাণ তেমন হ্রাস পায় নি। যেমন স্বাধীনতা অর্জনের সময় বাংলাদেশের জনসংখ্যা ছিল সাড়ে সাত কোটি। সে সময় জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল ২.৫ শতাংশের মতো। সুতরাং মোট হিসেবে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছিল বছরে ১৮.৭৫ লক্ষ। বর্তমানে মোট জনসংখ্যা প্রায় ১৬ কোটি। সুতরাং, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার এখন যদি ১.৪ শতাংশে হ্রাস পেয়ে থাকে, তবু মোট হিসেবে জনসংখ্যা বছরে বৃদ্ধি পাচ্ছে ২২.৪ লক্ষ। এমনকি যদি মনে করা হয় যে, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১.২ শতাংশে হ্রাস পেয়েছে, তাহলেও মোট হিসেবে বার্ষিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির পরিমাণ দাঁড়ায় ১৯.২ লক্ষ। সুতরাং জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কিছুট হ্রাস পেলেও মোট জনসংখ্যা ক্রমাগতভাবে বেড়েই চলেছে। জনসংখ্যার এই নিরন্তর বৃদ্ধি দেশের অর্থনীতি ও প্রকৃতির উপর চাপ বাড়িয়ে তুলছে।

স্পষ্টতই, বাংলাদেশে জনসংখ্যা উত্তরণের প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হতে পারছে না। এ প্রসঙ্গে লক্ষণীয়, বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধি হ্রাসের মূল কারণ হলো সমাজের অপেক্ষাকৃত সচ্ছল পরিবারের সদস্য সংখ্যা হ্রাস। বিপরীতে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে এখনও অধিক সন্তান গ্রহণের প্রবণতা অব্যাহত আছে। এর অন্যতম কারণ হলো, সমাজের দরিদ্রদের জীবনে এমন অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তন সাধিত হয় নি যে, তাদের অধিক সন্তান ধারণের প্রয়োজনীয়তা হ্রাস পাবে।

গ্রামের সমবায়ীকরণ এক্ষেত্রেও একটি গুণগত পরিবর্তন আনতে পারে। প্রথমত, সমবায়ী গ্রামে শ্রমজীবী দরিদ্রদের জীবনে অর্থনৈতিক নিশ্চয়তা বৃদ্ধি পাবে। ফলে অধিক (পুত্র) সন্তান গ্রহণের মাধ্যমে অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা হ্রাসের যে প্রবণতা বর্তমানে দরিদ্রদের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়, তা হ্রাস পাবে। দ্বিতীয়ত, এই পরিবর্তন শুধু অর্থনৈতিক নয়। গ্রামের বিভিন্ন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নে অংশগ্রহণের সুযোগ তাদেরকে একটা নতুন মর্যাদাশীল অবস্থানে উন্নীত করবে। সুতরাং আদর্শিক ও মনস্তাত্ত্বিক ক্ষেত্রেও পরিবর্তন সাধিত হবে। এরূপ গুণগত পরিবর্তন তাদের সামগ্রীক চিন্তাধারা ও আচরণকে প্রভাবিত করবে। এই উভয়বিধ কারণেই গ্রামের সমবায়ী রূপান্তর বাংলাদেশে জনসংখ্যা উত্তরণ অর্জনে সহায়ক হবে।[৬৪]

১২.৯ গ্রামের স্বস্থানভিত্তিক নগরায়ন

গ্রামের সমবায়ীকরণের আরেকটি যে সম্ভাব্য সুফল তা হলো, গ্রামের "স্বস্থানভিত্তিক নগরায়ন" (আরবানাইজেশন ইন-সিটু)-কে সুগম করা।[৬৫] লক্ষণীয়, বাংলাদেশে জনসংখ্যার উচ্চ ঘনত্ব এবং নিকটবর্তী শহর থেকে গ্রামের স্বল্প দূরত্বের কারণে এই দেশে ধ্রুপদী ধারার নগরায়নের তেমন প্রয়োজন নেই। ধ্রুপদী ধারার নগরায়নে মানুষ গ্রাম ছেড়ে শহরে অভিগমন করে। এরূপ নগরায়নের সুফলের পাশাপাশি বহু অর্থনৈতিক ও সামাজিক নেতিবাচক প্রতিফল আছে। বাংলাদেশে মানুষ স্বল্প দূরত্বের কারণে গ্রামে বসবাস করেও শহরে কাজ করতে পারে। এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করে নগরায়নের কুফল পরিহার করে সুফলসমূহ অর্জন করা যেতে পারে। তার জন্য প্রয়োজন গ্রামের স্বস্থানভিত্তিক নগরায়ন। এ ধরনের নগরায়নে নাগরিক জীবনের সুযোগ-সুবিধা গ্রামের মানুষের নিকট পৌঁছে দেয়া হয়। লক্ষণীয়, নাগরিক জীবনের সুবিধাদি দুই ধরনের। একটি হলো ভৌতিক উপযোগসমূহ, যেমন বিদ্যুৎ, গ্যাস, পানি, পয়-নিষ্কাশন, ইত্যাদি। অন্যটি হলো, সামাজিক উপযোগসমূহ, যেমন শিক্ষা, চিকিৎসা, সাংস্কৃতিক সেবা। এই দুই ধরনের উপযোগ যদি গ্রামে পৌঁছানো যায়, এবং গ্রামের মানুষ যদি অনায়াসে শহরে কাজ করার জন্য যাতায়াত করতে পারে, তবে তাদের শহরে অভিগমনের প্রয়োজনীয়তা এবং প্রণোদনা হ্রাস পাবে। জাপানসহ অনেক দেশে স্বস্থানভিত্তিক নগরায়নের দৃষ্টান্ত দেখা যায়।

সমবায়ীকরণ গ্রামের স্বস্থানভিত্তিক নগরায়নের জন্য সহায়ক হবে। সমবায়ীকরণ যে ভৌতিক এবং সামাজিক উপযোগসমূহ সরবরাহের জন্য সহায়ক হবে, তা উপরের আলোচনা থেকে স্পষ্ট। তবে সমবায়ীকরণ আরেকটি ভাবে গ্রামের স্বস্থানভিত্তিক নগরায়নের জন্য সহায়ক হতে পারে, তা হলো, গ্রামের বর্তমান ছড়ানো-ছিটানো আবাসন ধারা পরিবর্তন করে আরও সংহত আবাসন, এমনকি ঘনবদ্ধ শহরধর্মী আবাসনের দিকে অগ্রসর হওয়াকে সুগম করতে পারে।

লক্ষণীয়, গ্রামের বর্তমান আবাসন ধারার পেছনে অর্থনৈতিক, ভৌতিক, এবং সামাজিক যুক্তি আছে। বস্তুত, বিদ্যমান কৃষিভিত্তিক জীবনধারার জন্য এরূপ আবাসন অর্থনৈতিকভাবে যেন অপরিহার্য। যেমন, উঠোন এবং গোয়াল ঘর ছাড়া সনাতনী গৃহস্থ অর্থনীতি পরিচালনা ভাবা যায় না। তবে গ্রামীণ অর্থনীতি ও সমাজের দ্রুত পরিবর্তন ঘটছে। প্রথমত গ্রামের অর্ধেকের বেশির মূল পেশা এখন আর কৃষি কাজ নয়। দ্বিতীয়ত, কৃষিতে যান্ত্রিক প্রযুক্তির প্রসার ঘটছে। হাল-বলদ দিয়ে চাষের পরিবর্তে পাওয়ার টিলার দিয়ে জমি চাষ হচ্ছে। ধান শুকানো এবং মাড়াইয়ের কাজ যন্ত্র দিয়ে করা হচ্ছে। এহেন পরিবর্তিত অর্থনৈতিক এবং প্রযুক্তিগত পরিস্থিতিতে গ্রামের সকলের জন্য আর মাটি-সংলগ্ন, ছড়ানো-ছিটানো (তথা বিক্ষিপ্ত) আবাসন ধারা ততোটা প্রয়োজন নয়। ফলে গ্রামে সংহত আবাসন ধারায় উত্তরণের সুযোগের সৃষ্টি হচ্ছে।[৬৬]

লক্ষ্য করা প্রয়োজন, সংহত আবাসন ধারার বিভিন্ন সুফল আছে। প্রথমত, এতে জমির সাশ্রয় হবে। বিভিন্ন কারণে দেশের আবাদি জমির পরিমাণ হ্রাস পাচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে সংহত আবাসনের মাধ্যমে যদি আবাদি জমির পরিমাণ বাড়ানো যায়, তবে তা বাংলাদেশের জন্য নিশ্চয়ই উপকারী হবে। দ্বিতীয়ত, আমরা লক্ষ্য করেছি, অনেক স্থানেই জলবায়ু পরিবর্তন ও নদ-নদীর প্রতি উন্মুক্ত পন্থা অবলম্বনের জন্য বসতভিটার উচ্চতা বৃদ্ধির প্রয়োজন হবে। বলাবাহুল্য যে, বিক্ষিপ্ত আবাসনের পরিবর্তে সংহত আবাসনের গ্রামে এরূপ উচ্চতা বৃদ্ধি সহজ হবে। তৃতীয়ত, গ্রামের স্বস্থানভিত্তিক নগরায়নের জন্য প্রয়োজনীয় ভৌতিক ও সামাজিক উপযোগ সরবরাহ করার কাজটিও সংহত আবাসনের গ্রামের জন্য তুলনামূলকভাবে সহজ হবে।

বলা নিষ্প্রয়োজন, সমবায়ী গ্রামের পক্ষে সংহত আবাসন অর্জন সহজতর হবে। তবে এ ব্যাপারে কোনোরূপ বলপ্রয়োগ সঙ্গত হবে না। সংহত আবাসনে উত্তরণকে সম্পূর্ণরূপে একটি স্বেচ্ছামূলক প্রক্রিয়া হতে হবে। বিভিন্নমুখী

প্রণোদনা সৃষ্টি হলে গ্রামের মানুষ নিজেরাই এই পরিবর্তনে এগিয়ে যাবে। নতুবা তাঁরা যে ধরনের আবাসনে স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করে তাই বহাল রাখা উচিত হবে।

১২.১০ সমবায়ী গ্রামের অন্যান্য সম্ভাবনা

সমবায়ী গ্রামের বিভিন্ন সম্ভাবনার উপরিল্লিখিত তালিকা আরও দীর্ঘ করা যায়। এর সবটা আগে থেকে অনুমান করাও সম্ভব নয়।[৬৭] গ্রামকে একটি যূথবদ্ধ এককে রূপান্তরিত করা গেলে তা এক নতুন প্রাণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করতে পারে। গ্রামের মানুষদের মধ্যে বিভিন্নমুখী সহযোগীতা স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিকশিত হতে পারে। যেকোনো যৌথ প্রয়াসের একটা নিজস্ব আনন্দ আছে, এবং গ্রামে সে আনন্দ বিস্তৃত হতে পারে। গ্রামের জীবন আরও বেশি অর্থবহ ও প্রীতিকর হয়ে উঠতে পারে।[৬৮]

এই অনুচ্ছেদের আলোচনায় আমরা মূলত সমবায়ী গ্রামের অর্থনৈতিক সুফলের দিকে নজর দিয়েছি। কিন্তু গ্রামে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা, আইন শৃঙ্খলা বজায়, ন্যায় বিচার নিশ্চিত করা, ইত্যাদি বিভিন্ন দিকেও গ্রামের সমবায়ীকরণ গুরুত্বপূর্ণ ইতিবাচক ভূমিকা পালন করতে পারে। বর্তমানে এসব বিষয়ে দূরবর্তী ইউনিয়ন পরিষদ কিংবা উপজেলা কর্তৃপক্ষের উপর নির্ভর করতে হচ্ছে। সমবায়ী গ্রামে এসব ইস্যুতে প্রয়োজনীয় ভূমিকা পালনের জন্য অত্যন্ত নিকটবর্তী একটি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো সৃষ্টি হবে, এবং তার ফলে একদিকে অনভিপ্রেত ঘটনা পরিহার করা, অন্যদিকে ঘটনা-পরবর্তীতে দায়ী ব্যক্তিদের চিহ্নিতকরণ এবং তাদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ সুগম হবে। এসব বিষয় আমরা পরে (১৬ নং অনুচ্ছেদে) আরও আলোচনা করবো।

১৩. সমবায়ী গ্রাম ও স্বেচ্ছামূলক ভূমি সংস্কার

উপরের অনুচ্ছেদের আলোচনা থেকে পরিষ্কার, সমবায়ী গ্রামের বহুবিধ সম্ভাবনা, এবং ভূমি সংস্কার ছাড়াও এসব অনেক সম্ভাবনা বাস্তবায়িত হতে পারে। তবে আমূল (র‍্যাডিক্যাল) ভূমি সংস্কার এবং জমির সমতাধর্মী মালিকানা নিঃসন্দেহে গ্রামের সমবায়ীকরণকে আরও বেশি অর্থবহ করবে। এমনকি সীমিত ধরনের ভূমি সংস্কারও সমবায়ী গ্রামের বহুমুখী সম্ভাবনা বাস্তবায়নের জন্য সহায়ক হবে। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে কোনো ধরনের ভূমি সংস্কারের কথা ভাবার সুযোগ আছে কী?

লক্ষণীয়, ভূমি সংস্কারের বিষয়ে সমবায়ী গ্রামের ভূমিকা দুই ধরনের হতে পারে। একটি হলো জাতীয় পর্যায়ে গৃহীত উদ্যোগের বাস্তবায়নে সহায়তা করা। যেমন পশ্চিমবঙ্গে বাম ফ্রন্ট সরকারের "অপারেশন বর্গা" এবং খাস জমি বিতরণ কর্মসূচি বাস্তবায়নে সেখানকার গ্রাম পঞ্চায়েতসমূহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। (এ বিষয়ে ১৯ নং অনুচ্ছেদে আমরা আরও আলোচনা করবো।) দ্বিতীয়টি হলো সমবায়ী গ্রামের নিজস্ব উদ্যোগ। এই উদ্যোগ নিঃসন্দেহে জাতীয় ভিত্তিক আইন ও নীতি কাঠামোর মধ্যেই হতে হবে। লক্ষণীয়, নতুন কোনো আইন প্রণয়ন ছাড়াই – তথা বিদ্যমান আইনের অধীনেই – সমবায়ী গ্রামের পক্ষে বিভিন্ন উদ্যোগ নেয়া সম্ভব। তা সত্ত্বেও প্রাসঙ্গিক জাতীয় ভিত্তিক আইন ও নীতি নমনীয় হলে গ্রাম সমূহ কর্তৃক স্বীয় অবস্থা অনুযায়ী সৃষ্টিশীল উদ্যোগ নেয়া সুগম হবে। উপরিল্লিখিত দুই ধরনের উদ্যোগের কথা মনে রেখেই বর্তমান পরিস্থিতিতে ভূমি সংস্কারের সম্ভাব্যতার কথা ভাবা যেতে পারে।

আগেই উল্লিখিত হয়েছে, বিগত সময়কালে ভূমি সংস্কারের পথে রাজনৈতিক বাঁধা আরও প্রবল হয়েছে। এ পরিস্থিতিতে বাধ্যতামূলক (বলপূর্বক) এবং বাজেয়াপ্তমূলক ভূমি সংস্কারের প্রস্তাব করা দুরূহ। তবে অধুনাকালে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে স্বেচ্ছামূলক, বাজারভিত্তিক ভূমি সংস্কারের প্রস্তাবও করা হয়েছে। কিছু কিছু দেশে এ ধরনের প্রস্তাব বাস্তবায়নের উদ্যোগও গৃহীত হয়েছে। সবক্ষেত্রে যে তা সফল হয়েছে, বলা যাবে না। তবে ভূমি সংস্কারের পথে দুরূহ রাজনৈতিক বাঁধার পরিস্থিতিতে এ ধরনের বিকল্প পদ্ধতির ভূমি সংস্কারের কথা ভাবার সুযোগ আছে, এবং বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে তার উপযোগীতা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করা যেতে পারে।[৬৯] এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতির নিম্নরূপ কয়েকটি দিকের প্রতি দৃষ্টি দেয়া যেতে পারে।

প্রথমত, আমরা উপরে লক্ষ্য করেছি, ধনী কৃষকেরা বেশিরভাগ এখন চাষকার্য ছেড়ে দিয়েছে। নিজেদের জমি বর্গায় দিয়ে তারা এখন মূলত কৃষি বহির্ভূত অন্যান্য পেশায় নিয়োজিত। দ্বিতীয়ত, তাদের অনেকে এখন আর গ্রামেও বসবাস করেন না। বেশিরভাগ সময় শহরে থাকেন এবং মাঝেমধ্যে গ্রামে যান। তৃতীয়ত, তারা নিজেরা গ্রামে থাকলেও তাদের সন্তানেরা বেশিরভাগ শহরে কিংবা বিদেশে স্থানান্তরিত হয়েছেন। জমির সঙ্গে তাদের বিশেষ সম্পৃক্তি নেই; বরং অনেক ক্ষেত্রে জমির দেখাশোনা তাদের জন্য একটা "ঝামেলা"র বিষয়ে পরিণত হয়েছে।

উপর্যুক্ত পরিস্থিতিতে এসব পরিবারদের পক্ষে বাজার মূল্য পেলে নিজেদের কৃষি জমি গ্রাম কর্তৃপক্ষ (অথবা সরকারের) নিকট হস্তান্তরে রাজী হওয়াটা অযৌক্তিক নয়। লক্ষণীয়, সবক্ষেত্রে তাদের কাছ থেকে নগদ অর্থে জমি কিনে নিতে হবে, এমন নাও হতে পারে। আগেই উল্লিখিত হয়েছে, গ্রামের ধনীরা বেশিরভাগই এখন কৃষি ছেড়ে বিভিন্ন অকৃষিজ এবং শহর-ভিত্তিক অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে নিয়োজিত। এসব কর্মকান্ডের উদ্যোগ গ্রহণে ও সম্প্রসারণে প্রায়শ ব্যাংক ঋণের প্রয়োজন হয়। এদিকে সরকারও শিল্প সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ব্যাংক ঋণসহ অন্যান্য সুযোগ সুবিধা প্রদানে আগ্রহী; কাজেই সরকারী ঋণ ও অন্যান্য সুবিধাদির বিনিময়ে জমি হস্তান্তরও অনেক পরিবারের নিকট গ্রহণযোগ্য হতে পারে।

বস্তুগত প্রণোদনার পাশাপাশি বিভিন্ন ভাবগত (তথা সম্মানগত) প্রণোদনার কথাও ভাবা যেতে পারে। যেমন স্বেচ্ছায় জমিদানকারী কোন ব্যক্তির নামে গ্রামের স্কুল অথবা পাঠাগারের নামকরণ করা যেতে পারে। গ্রামের অনেক পরিবার এখন শহরেও এত বিশাল পরিমাণ বিত্ত অর্জন করেছেন যে, সম্পদ হিসেবে গ্রামের জমি তাদের কাছে আর ততো গুরুত্বপূর্ণ নয়। ফলে ভাবগত বা সম্মানগত প্রণোদনা তাদের কাছে মূল্যবান হতে পারে।

উপর্যুক্ত বিভিন্ন উপায়ে গ্রাম কর্তৃপক্ষের নিকট বেশ কিছু পরিমাণ জমি হস্তান্তরিত হতে পারে। এর পরিমাণ ঠিক কতোটা হবে, তা আগে থেকে বলা কঠিন। তবে অনেকটাই নির্ভর করবে সুনির্দিষ্ট গ্রামের পরিস্থিতির উপর। এ পরিস্থিতির দুটি পরস্পর সম্পর্কিত দিক। একটি হলো বিষয়গত (অবজেকটিভ); অর্থাৎ গ্রামে কি পরিমাণ জমি লভ্য, কি তার বিতরণ, ইত্যাদি। দ্বিতীয়টি হলো বিষয়ীগত (সাবজেকটিভ), অর্থাৎ গ্রামে সচেতনতার মাত্রা কতখানি, প্রগতিশীল চিন্তাভাবনা সম্পন্ন কর্মীদের উপস্থিতি কতটুকু, গ্রামের শ্রমজীবী এবং দরিদ্ররা কতখানি সংগঠিত, ইত্যাদির উপর। পাশাপাশি বহিস্থ, তথা জাতীয় পর্যায়ের রাজনৈতিক শক্তি ভারসাম্যও এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। বলাবাহুল্য যে, গ্রাম কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তরিত জমির পরিমাণ যতো বেশি হবে, ততোই জমি ও জল সম্পদের সঙ্গে শ্রমজীবীদের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি পাবে এবং গ্রামের সমবায়ীকরণ অর্থবহ ও গভীর হবে।

লক্ষণীয়, জমি সরবরাহের পাশাপাশি জমি চাহিদার দিকটিও স্বেচ্ছামূলকতার ভিত্তিতে নিয়ন্ত্রণ করা শ্রেয় হবে। পূর্বের (৭ নং অনুচ্ছেদের) আলোচনা থেকে পরিষ্কার, সকল জমি প্রত্যাশীকে কার্যক্ষম জোতাকারসম্পন্ন জমি দেয়া সম্ভব নয়। অন্যদিকে সংকুচিত পরিধির যৌথতার কথাও প্রস্তাব করা

হচ্ছে না। সুতরাং, জমি প্রত্যাশীদের মধ্যে কে জমি পাবে, আর কে পাবে না, সেটি নির্ধারণ একটি কঠিন বিষয় হবে। এই সমস্যা সমাধানের জন্য বাজার মূল্যের ব্যবহার করা যেতে পারে। অর্থাৎ, "উদ্বৃত্ত" জমি *সংগ্রহের* ক্ষেত্রে যেমন বাজার মূল্য প্রয়োগের কথা ভাবা যায়, তেমনি এই জমি *বিতরণের* ক্ষেত্রেও তা ব্যবহার করা যেতে পারে। যেমন, জমি প্রত্যাশীদের মধ্যে যারা বাজার মূল্যে জমি কিনে নিতে ইচ্ছুক, সংগৃহীত জমির বিতরণ তাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা যেতে পারে। বস্তুত, জমি বিতরণের ক্ষেত্রে "নিলাম পদ্ধতি"র প্রয়োগ করা যেতে পারে। এতে একসঙ্গে কয়েকটি উদ্দেশ্য সাধিত হবে। প্রথমত, জমির সরবরাহ ও চাহিদার মধ্যে সমতা রক্ষিত হবে। দ্বিতীয়ত, যারা জমির যথাযথ ব্যবহারে আগ্রহী (কেননা তারা সর্বোচ্চ মূল্য দিয়ে জমি গ্রহণ করছে), তাদের হাতে উদ্বৃত্ত জমি পৌঁছানো সহজ হবে। তৃতীয়ত, বিতরণ পদ্ধতিটি স্বচ্ছ এবং কারো ব্যক্তিগত ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর নির্ভর করবে না। বিতরণ পদ্ধতিটি "ন্যায্য" বলে প্রতিভাত হবে; ফলে যারা জমি পাবেন না, তাদের মধ্যে বঞ্চনাবোধ কম হবে।

বাজার পদ্ধতিতে জমি বিতরণের নেতিবাচক দিক হলো, এর ফলে উদ্বৃত্ত জমি বিতরণ "সমতাধর্মী" নাও হতে পারে। জমি পুনরায় আর্থিকভাবে অপেক্ষাকৃত সমর্থদের হাতেই ন্যস্ত হতে পারে। কিন্তু বাজার পদ্ধতিতে উদ্বৃত্ত জমি বিতরণও যাতে সমতাধর্মী হয়, সে লক্ষ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে। যেমন উদ্বৃত্ত জমির নিলামে কারা অংশগ্রহণ করতে পারবে, সে ব্যাপারে বিধি-নিষেধ আরোপ করা যেতে পারে, যাতে জমি কেবল আর্থিকভাবে অধিকতর সমর্থদের হাতে ন্যস্ত না হয়। একইভাবে বিভিন্ন শর্তাদি আরোপের মাধ্যমে বিতরিতব্য জমি যাতে কৃষিকাজে সক্ষম পরিবারদের হাতে ন্যস্ত হয় তা নিশ্চিত করা যেতে পারে। দ্বিতীয়ত, জমি পাওয়ার জন্য উপযুক্ত কিন্তু আর্থিকভাবে অসমর্থ পরিবারদের জন্য ব্যাংক ঋণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে, যাতে তাঁরা প্রতিযোগী দাম দিয়ে জমি কিনে নিতে পারে। এভাবে বাজার-নির্ভর প্রক্রিয়ার অধীনেও তুলনামূলকভাবে সমতাধর্মী জমি পুনর্বিতরণ সম্ভব। তবে একেবারে ভিটাহীন পরিবারদের ভিটা গড়ে তোলার জন্য কিছু জমি দেয়ার একটা বিশেষ ব্যবস্থা করা প্রয়োজন হতে পারে।

পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে, ভূমি সংস্কারের বিষয়ে সমবায়ী গ্রামের ভূমিকা হতে পারে দুই ধরনের: (ক) জাতীয় উদ্যোগের বাস্তবায়নকারী; (খ) স্বীয় উদ্যোগ গ্রহণকারী। দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে যে সমবায়ী গ্রামের গুরুত্বপূর্ণ

সিদ্ধান্তগ্রহণকারী ভূমিকা থাকবে তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু লক্ষণীয়, জাতীয় উদ্যোগ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রেও সমবায়ী গ্রামের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হবে। এর কারণ, উদ্বৃত্ত জমি সংগ্রহ এবং বিতরণের পদ্ধতিকে যতই ব্যক্তি ইচ্ছা-নিরপেক্ষ করার চেষ্টা করা হোক না কেন, যারা শেষাবধি এসব পদ্ধতি বাস্তবায়িত করবে, তাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার ভূমিকা সম্পূর্ণ বাতিল করা কখনোই সম্ভব হবে না। সে কারণে এক্ষেত্রে মূল করণীয় হলো গৃহীত নিয়মাবলী এবং তার বাস্তবায়ন পদ্ধতিকে সকলের নিকট স্বচ্ছ রাখা, এবং গ্রামের সকলের সমান ভিত্তিতে (গণতান্ত্রিক) অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

লক্ষণীয়, উপর্যুক্ত স্বেচ্ছামূলক ভূমি সংস্কারের প্রস্তাবের প্রেক্ষিত হলো আমূল (র‍্যাডিক্যাল) ভূমি সংস্কারের জন্য প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক শক্তিসাম্যের অভাব এবং গ্রামের পরিধির অসমতা ও জাতীয় পরিধির অসমতার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের আবশ্যকতা। এসব ক্ষেত্রে যদি গুণগত পরিবর্তন ঘটে, তবে ভিন্ন ধরনের ভূমি সংস্কারের কথাও ভাবা যেতে পারে, যদিও জমি স্বল্পতার সমস্যা এবং তদ্ভূত সীমাবদ্ধতা থেকেই যাবে। তবে যতোদিন সে ধরনের পরিস্থিতির উদ্ভব না ঘটছে ততোদিন পর্যন্ত বসে থাকার কারণ নেই। মনে রাখা প্রয়োজন, ছোট পরিবর্তনের মধ্য দিয়েই বড় পরিবর্তনের পটভূমি ও পূর্বশর্ত সৃষ্টি হয়। এক লাফে বড় পরিবর্তন কদাচিৎ ঘটে।

১৪. সমবায়ী গ্রাম এবং গ্রাম তহবিল

সৌভাগ্যক্রমে, আমূল ভূমি সংস্কার ছাড়াও, অথবা সীমিত ধরনের স্বেচ্ছামূলক ভূমি সংস্কারের ভিত্তিতেও, সমবায়ী গ্রাম যথেষ্ট সম্ভাবনা বহন করে, কেননা তা গ্রামের দরিদ্র শ্রমজীবী পরিবারসমূহকে গ্রামের জমি এবং জল সম্পদের সঙ্গে সম্পৃক্ত করবে। এই সম্পৃক্তির মূল মাধ্যম হলো "গ্রাম তহবিল"।

সমবায়ী গ্রামে গ্রাম তহবিলের মৌলিক ভূমিকা। স্বেচ্ছামূলক ভূমি সংস্কার সত্ত্বেও অনেক ভূমিহীন ও ভূমিস্বল্প পরিবার জমি পুনর্বিতরণের পরিধির বাইরে থেকে যাবেন। সুতরাং গ্রামের জল ও জমি সম্পদ থেকে প্রাপ্ত আয়ের একটি অংশ গ্রাম তহবিলে জমা হতে হবে। তবেই এসব সম্পদের উপর যাদের প্রত্যক্ষ মালিকানা নেই তারাও (তথা দরিদ্র শ্রমজীবীরা) এসব সম্পদের উন্নয়নের কাজে শরীক হওয়ার প্রণোদনা অনুভব করবে। সেটাই হলো সমবায়ী গ্রামের সম্ভাবনার চাবিকাঠি।

এটা ঠিক যে, গ্রাম-তহবিলের মাধ্যমে গ্রামের জমি ও জল সম্পদের সঙ্গে গ্রামের ভূমিহীন ও প্রায় ভূমিহীন পরিবারদের যে অংশীদারীত্ব, তা কিছুটা অ-প্রত্যক্ষ চরিত্রের, প্রত্যক্ষ নয়। যেহেতু সকলকে দেয়ার মতো জমি নেই, অন্যদিকে রাজনৈতিক কারণে জমির উপর যৌথ মালিকানা প্রতিষ্ঠাও সম্ভব নয়, সেহেতুই এরূপ অ-প্রত্যক্ষ অংশীদারীত্বের প্রস্তাবনা। কিন্তু অ-প্রত্যক্ষ এবং কিছুটা দ্রবীভূত ধরনের হলেও এটা অংশীদারিত্ব, এবং গ্রামীণ জীবনের জন্য তা একটি মৌলিক পরিবর্তন ডেকে আনার সম্ভাবনা রাখে। ১২ নং অনুচ্ছেদে আমরা লক্ষ্য করেছি কীভাবে এই অংশীদারিত্ব গ্রামের জমি, জল, ও জন সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার ও অন্যান্য যৌথ বিনিয়োগের পথটি উন্মুক্ত করবে। প্রশ্ন হলো, কী কী সুনির্দিষ্ট উপায়ে গ্রাম তহবিলের জন্য আয় সংগ্রহ করা যেতে পারে।

১৯৭৫ সনে বঙ্গবন্ধু ঘোষিত সমবায়ী গ্রামের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান ছিল গ্রাম তহবিল। তিনি গ্রাম তহবিলের আয়ের দুই উৎসের কথা উল্লেখ করেছিলেন। একটি হলো গ্রামের অভ্যন্তরীণ সূত্রের; অন্যটি হলো বহিস্থ সূত্রের। অভ্যন্তরীণ সূত্রের যে আয়ের কথা বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন তা হলো, যৌথচাষের ভিত্তিতে উৎপাদিত ফসলের এক-তৃতীয়াংশ। বহিস্থ সূত্রের আয়ের বিষয়ে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন যে, উন্নয়ন কার্যক্রমের সরকারী অর্থ গ্রাম তহবিলে যাবে এবং এই তহবিলের মাধ্যমে ব্যয়িত হবে।

লক্ষণীয়, গ্রাম তহবিলের বহিস্থ সূত্রের অর্থ সম্পর্কে বঙ্গবন্ধুর প্রস্তাবের বিশেষ কোনো পরিবর্তনের প্রয়োজন নেই। স্মরণযোগ্য, এ প্রসঙ্গে বঙ্গবন্ধু "ইউনিয়ন পরিষদের টাউটদের বিদায় করে দেয়ার" কথা বলেছিলেন। অর্থাৎ, তিনি সমবায়ী গ্রাম গঠনের পর আর ইউনিয়ন পরিষদের কোনো প্রয়োজনীয়তা দেখেন নি, এবং সরকারের যে অর্থ ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে ব্যয়িত হয়, তা সরাসরি সমবায়ী গ্রামের নিকট পৌঁছানোর কথা ভেবেছিলেন। ইউনিয়ন পরিষদের বাতিলকরণ সমবায়ী গ্রাম প্রতিষ্ঠা কর্মসূচির অংশ হবে কিনা, এবং সাধারণভাবে স্থানীয় সরকার কাঠামোতে কয়টি ধাপ থাকবে, এসব বিষয় আমরা পরে (১৬ নং অনুচ্ছেদে) আলোচনা করবো। আপাতত, আমরা গ্রামের অভ্যন্তরীণ সূত্রের আয়ের আলোচনায় মনোযোগ দিতে পারি। যেহেতু পরিবর্তিত পরিস্থিতির কারণে বর্তমান পর্যায়ে যৌথচাষের প্রস্তাবনা করা হচ্ছে না – ফলে উৎপাদিত ফসলের এক-তৃতীয়াংশ গ্রাম তহবিলে জমা হচ্ছে না – সে অবস্থায় অভ্যন্তরীণ সম্পদ সংগ্রহের আর কী উপায় হতে পারে?

এ প্রসঙ্গে লক্ষণীয়, গ্রাম তহবিলের অভ্যন্তরীণ উৎসসমূহের মধ্যে কিছু হবে স্থানীয় সরকার আইনের অধীনে গ্রামকে প্রদত্ত বিভিন্ন কর, মাশুল, ফী, ইত্যাদি আদায়ের জন্য অধিকারের সূত্রে প্রাপ্ত আয়। থোক বরাদ্দের সঙ্গে এসব আয়ের পার্থক্য স্পষ্ট। প্রথমোক্তটি (থোক বরাদ্দ) সম্পূর্ণতই বহিঃস্থ চরিত্রের। পক্ষান্তরে দ্বিতীয়টি গ্রামের অভ্যন্তরে সংগৃহীত, যদিও তার আইনি ভিত্তিটি বহিস্থ সূত্রের। এই আয়ের বিষয়ে আমরা ১৬নং অনুচ্ছেদে আলোচনা করবো। কিন্তু লক্ষণীয়, সম্পূর্ণত গ্রামের উদ্যোগেও অভ্যন্তরীণ সূত্রের আয় অর্জন সম্ভব। অর্থাৎ, এ ধরনের আয়ের জন্য বহিস্থ আইনের প্রয়োজন নেই। গ্রামের সকলের সম্মতির ভিত্তিতে তা অর্জিত হতে পারে।[৭০]

এটা পরিষ্কার যে, বহিস্থ আইনের ভিত্তিতে হোক কিংবা শুধুমাত্র গ্রামের ঐক্যমত্যের ভিত্তিতে হোক, জমি ও জলসম্পদের উপর এক ধরনের "খাজনা" গ্রাম তহবিলের অভ্যন্তরীণ উৎস হতে পারে। যেহেতু গ্রামবাসীরা নিজেরাই এই খাজনার মালিক হবেন, সুতরাং এটাকে খাজনা না বলে বরং গ্রাম তহবিলের জন্য "চাঁদা" বলাই শ্রেয়। প্রশ্ন হতে পারে, গ্রামের জমি ও জল সম্পদের প্রত্যক্ষ মালিক পরিবারসমূহ এরূপ চাঁদা দিতে রাজী হবেন কেন? এ প্রসংগে লক্ষ্য করা যেতে পারে যে, যদি ভূমি সংস্কার বাস্তবায়িত হয়, তাহলে সমবায়ী গ্রামের জমিকে দু'ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। একটি হলো, ভূমি সংস্কার সূত্রে পুনর্বিতরিত উদ্বৃত্ত জমি – যেটাকে সংক্ষেপে বলা যেতে পারে "প্রাপ্ত-জমি"; আর দ্বিতীয়টি হলো পুনর্বিতরণ-পূর্ব জমি, সংক্ষেপে "নিজ-জমি"। প্রাপ্ত-জমির ক্ষেত্রে এই চাঁদা আরোপের বিষয়টি অপেক্ষাকৃত সহজ; কেননা এরূপ চাঁদা প্রদান জমি পাওয়ার একটি শর্তই হতে পারে। যত সুলভে ভূমি সংস্কার সূত্রে জমি পাওয়া যাবে, ততোই উৎসাহের সঙ্গে জমি প্রত্যাশীরা সে শর্ত মেনে নিবে।[৭১]

কিন্তু প্রাপ্ত-জমির উপর চাঁদা আরোপ সম্ভব হলেও নিজ-জমির উপর এরূপ চাঁদা আরোপ সম্ভব কি? এটা ঠিক যে, প্রাপ্ত-জমির তুলনায় নিজ-জমির উপর চাঁদা আদায় একটি কঠিন প্রস্তাব, বিশেষত যদি বিদ্যমান পরিস্থিতির মধ্যে কোনো বিপ্লবী উপাদান না থাকে। তবে এ প্রসঙ্গে নিম্নরূপ কয়েকটি বিষয় লক্ষ্য করা যেতে পারে। প্রথমত, যেহেতু এটা খাজনা নয়, বরং চাঁদা, এবং এই চাঁদা-সৃষ্ট তহবিল মূলতঃ বিভিন্ন বিনিয়োগ-মূলক কর্মকান্ডে ব্যয়িত হবে, এবং সেসব বিনিয়োগ থেকে জমি মালিকেরাই সরাসরি উপকৃত হবেন, সেহেতু এই চাঁদা অধিকতর গ্রহণযোগ্য হওয়ার কথা। দ্বিতীয়ত, গ্রাম যতো গণতান্ত্রিক হবে, গ্রাম-তহবিল পরিচালনা যতো স্বচ্ছ, সৎ, ও দক্ষ হবে, ততোই গ্রাম-তহবিলে

চাঁদা প্রদানে অনীহা কম হবে। বলা নিষ্প্রয়োজন, পুনর্বিতরণমূলক ভূমি সংস্কারের মাধ্যমে গ্রামীণ জীবনের ও ক্ষমতা-কাঠামোর গণতন্ত্রায়ণ চাঁদা আদায়ের লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক হবে। তৃতীয়ত, প্রাপ্ত-জমির তুলনায় নিজ-জমির উপর আরোপিত চাঁদার হার কম রাখা যাতে পারে, যাতে তা মালিকদের নিকট গ্রহণযোগ্য হয়। চতুর্থত, পুনর্বিতরণমূলক ভূমি সংস্কার এটাও প্রমাণ করবে যে, জমি পুনর্বিতরিতও হতে পারে। সুতরাং, পুনর্বিতরণের মাধ্যমে জমি "হারানো"র চেয়ে জমির উপর নির্ধারিত চাঁদা প্রদান জমি মালিকদের নিকট শ্রেয় বোধ হতে পারে। সব মিলিয়ে, গ্রাম-তহবিলের জন্য নিজ-জমির উপর চাঁদা আরোপ অসম্ভব নয়। অনেকটাই নির্ভর করবে গ্রামাভ্যন্তরে এবং সমাজে বিরাজমান রাজনৈতিক শক্তি ভারসাম্যের উপর।[৭২]

আগেই উল্লিখিত হয়েছে, জমি ও জল সম্পদের উপর চাঁদা আরোপই গ্রাম-তহবিলের একমাত্র অভ্যন্তরীণ উৎস নয়। অন্যান্য উপায়েও গ্রাম তহবিলের জন্য অভ্যন্তরীণ সূত্র থেকে অর্থ সংগ্রহ করা যেতে পারে। তবে জমি ও জল সম্পদের উপর চাঁদা সমবায়ী গ্রামের সাফল্যের জন্য গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এই চাঁদার মাধ্যমেই গ্রামের শ্রমজীবীদের কাছে দৃশ্যমান হবে যে, তাদের শ্রম নিয়োজনের ফলে সাধিত জমি ও জল সম্পদের উন্নয়নের সুফলের ভাগীদার তাঁরাও হতে পারছেন। সমবায়ী গ্রামের সাফল্যের চাবিকাঠি এই সংযোগ প্রতিষ্ঠার মধ্যেই বহুলাংশে নিহিত।

১৫. সমবায়ী গ্রাম কর্মসূচি বাস্তবায়নের বিভিন্ন ইস্যু

উপরের আলোচনা থেকে আমরা দেখতে পাই, বঙ্গবন্ধুর সমবায়ী গ্রামের স্বপ্নটি এখনও প্রাসঙ্গিক, এবং যৌথচাষের প্রবর্তন ছাড়াও তা গ্রামের জীবনে মৌলিক পরিবর্তন ডেকে আনতে পারে এবং সামগ্রিকভাবে দেশের উন্নয়ন প্রক্রিয়ার গণতন্ত্রায়ণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। প্রশ্ন হলো, কিভাবে এই সমবায়ীকরণের প্রক্রিয়া বাস্তবে অগ্রসর হতে পারে? এ প্রসঙ্গে নিম্নরূপ কিছু বিষয় লক্ষ্য করা যেতে পারে।

১৫.১ অভ্যন্তরীণ সক্ষমতা

আমরা লক্ষ্য করেছি, স্বেচ্ছামূলক ভূমিসংস্কারের মাধ্যমে গ্রামের সমবায়ীকরণকে কতখানি গভীরতা দেয়া সম্ভব হবে, তা বহুলাংশে গ্রামের নিজস্ব পরিস্থিতি, তথা অভ্যন্তরীণ সক্ষমতার উপর নির্ভর করে। একইভাবে, গ্রাম

তহবিল সংগ্রহ এবং পরিচালনা কতোখানি সততা এবং দক্ষতার সঙ্গে করা যাবে সেটাও গ্রামের অভ্যন্তরীণ সক্ষমতার উপর নির্ভর করে। এক্ষেত্রে আনন্দের বিষয় যে, বিগত বছরগুলোতে বাংলাদেশের গ্রামের সাংগঠনিক সক্ষমতার বিশেষ অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে। প্রথমত, গ্রামে শিক্ষিত লোকের সংখ্যা এখন আগের তুলনায় বেশি। দ্বিতীয়ত, যোগাযোগ ও প্রচার মাধ্যমের উন্নতির – টেলিভিশন, মোবাইল ফোন এবং ইন্টারনেট, ইত্যাদির ব্যাপক প্রসারের – ফলে গ্রামের মানুষ এখন আগের তুলনায় অনেক বেশি অবহিত ও সচেতন। তৃতীয়ত, যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নতির ফলে গ্রাম এখন অনেক বেশি শহরের সঙ্গে এবং একে অপরের সঙ্গে সংযুক্ত। চতুর্থত, বিদেশে জনশক্তি রপ্তানীর ফলে গ্রামের মানুষের দৃষ্টি আজ বহুদূর প্রসারিত। পঞ্চমত, কয়েক দশক ধরে বিভিন্ন ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচির প্রসারের ফলে গ্রামের মানুষ এবং গ্রামের মহিলারা আয়-ব্যয়, লাভ-ক্ষতির হিসাবের সঙ্গে অনেক বেশি অভ্যস্ত। ষষ্ঠত, বিভিন্ন বে-সরকারী সংস্থার কাজ ও উপস্থিতির ফলে গ্রামের মানুষের সাংগঠনিক অভিজ্ঞতা এখন আগের চেয়ে বেশি। সব মিলিয়ে, গ্রামের মানব সম্পদ এখন অনেক বেশি উন্নত, এবং গ্রামকে একটি সমবায় হিসেবে পুনর্গঠিত ও পরিচালনার করার মতো অভ্যন্তরীণ সক্ষমতা এখন আগের চেয়ে বেশি।

পাশাপাশি, বিগত সময়কালে অনেক নেতিবাচক পরিবর্তনও সংঘটিত হয়েছে। যেমন, বৈষম্য, স্বার্থপরতা, সংকীর্ণ বাণিজ্যিক মনোভাব, সাম্প্রদায়িকতা, সহিংসতা, ইত্যাদি বৃদ্ধি পেয়েছে। মূল্যবোধের ব্যাপক অবক্ষয় সাধিত হয়েছে। গ্রামের অভ্যন্তরে এসব নেতিবাচকতার প্রসার বহুলাংশে জাতীয় পরিস্থিতির ফলশ্রুতি। সে কারণে জাতীয় পরিস্থিতির অনুকূল পরিবর্তন গ্রামের অভ্যন্তরের এসব নেতিবাচক প্রবণতাকে প্রতিহত করায় সহায়তা করবে। তবে গ্রামের সমবায়ীকরণ এক্ষেত্রে একটি পৃথক ইতিবাচক প্রক্রিয়ার সূচনা করতে পারে; গ্রামের মানুষদের মধ্যে সহযোগিতা এবং সহমর্মিতা বৃদ্ধি করতে পারে; সময়ে গ্রামের এই ইতিবাচক পরিবর্তন জাতীয় পরিস্থিতির উপরও শুভ প্রভাব ফেলতে পারে।

ইতিহাসের আলোচনা থেকে আমরা দেখি যে, বাংলাদেশের গ্রামের সমতাধর্মীতা ও স্বশাসনের অতীত ঐতিহ্য রয়েছে।[৭৩] (নীচের ১৬ নং অনুচ্ছেদে আমরা এ বিষয়টি নিয়ে আরও আলোচনা করবো।) এই অতীত ঐতিহ্যের সঙ্গে বর্তমানের নবার্জিত সক্ষমতা যোগ করে বাংলাদেশের মানুষ গ্রামের সমবায়ীকরণে অবশ্যই এগিয়ে যেতে পারবে বলে আশা করা যায়।

১৫.২ পর্যায়ক্রমতা

লক্ষ্য করা প্রয়োজন, গ্রামের সমবায়ীকরণ এক সঙ্গে সারা দেশে করে ফেলতে হবে এমন কোনো কথা নেই। বরং এক্ষেত্রে ধীরে ধীরে, পর্যায়ক্রমে অগ্রসর হওয়ার সুযোগ আছে। প্রথমে কিছু গুচ্ছ-গ্রাম নিয়ে সমবায়ীকরণের সূচনা ("পাইলট") প্রকল্প গ্রহণ করা যেতে পারে এবং পরে এসব সূচনাকারী গ্রামের অভিজ্ঞতার প্রেক্ষিতে অন্যত্র তা সম্প্রসারিত করা যেতে পারে। বলাবাহুল্য, সূচনাকারী গ্রাম নির্বাচনের ক্ষেত্রে গ্রামের অভ্যন্তরীণ সাংগঠনিক ক্ষমতার প্রতি দৃষ্টি দিতে হবে। অতীত ঐতিহ্যের কারণে অগ্রসর রাজনৈতিক চেতনার উপস্থিতি, কোনো জাতীয় রাজনৈতিক নেতা/নেত্রীর প্রত্যক্ষ উপস্থিতি ও অংশগ্রহণের সম্ভাবনা, শক্তিশালী কৃষক সংগঠনের উপস্থিতি, প্রভৃতি কারণে কোনো কোনো স্থানে গ্রাম সমবায়ী রূপান্তরের জন্য অধিকতর প্রস্তুত হতে পারে। তবে লক্ষণীয়, বাংলাদেশ অত্যন্ত ঘনবদ্ধ দেশ। এই দেশে সফল অভিজ্ঞতার প্রচার ও প্রসার অত্যন্ত দ্রুত হওয়া সম্ভব। যদি দক্ষ পরিচালনার মাধ্যমে সূচনাকারী গ্রামসমূহের সমবায়ীকরণকে সফল করা যায়, তাহলে প্রতিবেশী এবং দেশের অন্য এলাকার গ্রামের মানুষও এই কর্মসূচি গ্রহণে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে আসবে। সুতরাং, প্রয়োজন হলো একটি সফল সূচনার।

১৫.৩ বৈচিত্র্যের স্বীকৃতি

আরেকটি লক্ষণীয় বিষয় হলো, বাংলাদেশের সকল গ্রাম এক রকম নয়। ভূ-প্রাকৃতিক অবস্থান; প্রাকৃতিক সম্পদ পরিস্থিতি; পরিবারের সংখ্যা; মোট জমির পরিমাণ; জমির বিতরণ; নদ-নদী ও বিভিন্ন জলাশয়ের অবস্থান, আকার, মালিকানার চরিত্র; গ্রামের অর্থনৈতিক স্বরূপ; পেশাগত কাঠামো; রাজনৈতিক-সাংগঠনিক পরিস্থিতি; ক্ষমতা কাঠামোর চরিত্র; শহর থেকে দূরত্ব; যোগাযোগ ব্যবস্থা; ধর্মীয় পরিস্থিতি; ইতিহাস ও ঐতিহ্য; ইত্যাদি বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকেই বাংলাদেশের একটি গ্রাম আরেকটি থেকে পৃথক। কাজেই সমবায়ী রূপান্তরের কর্মসূচি প্রণয়নের ক্ষেত্রে প্রতিটি গ্রামের বিশেষ পরিস্থিতির দিকে নজর দিতে হবে। অন্যভাষায়, সমবায়ীকরণ কতিপয় সাধারণ নীতিমালার ভিত্তিতে অগ্রসর হলেও এর সুনির্দিষ্ট রূপটি সুনির্দিষ্ট গ্রামের সুনির্দিষ্ট পরিস্থিতির ভিত্তিতেই নির্ণীত হতে হবে।

তবে যে কোনো কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য একটি শুরুর বিন্দু প্রয়োজন। গ্রামের সমবায়ীকরণের শুরুর বিন্দু হবে গ্রাম পর্যায়ে একটি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর প্রতিষ্ঠা। এই কাঠামোটি কী হতে পারে, সেটাই পরবর্তী আলোচনার বিষয়।

১৬. "গ্রাম-পরিষদ" গঠন – সমবায়ী গ্রামের লক্ষ্যে প্রথম পদক্ষেপ

বাংলাদেশে সমবায়ী গ্রাম প্রতিষ্ঠার শুরুর বিন্দু হতে পারে গ্রামের সকল প্রাপ্ত বয়স্কদের প্রত্যক্ষ ভোট দ্বারা নির্বাচিত "গ্রাম-পরিষদ" গঠন। এই গ্রাম পরিষদের দ্বৈত ভূমিকা হবে। একদিকে তা গ্রাম পর্যায়ে "স্থানীয় সরকারে"র ভূমিকা পালন করবে। অন্যদিকে তা একটি "অর্থনৈতিক একক" হিসেবে সমবায়ী গ্রামের পরিচালনা পরিষদ হিসেবে কাজ করবে। পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে, যেহেতু গ্রামের সকলেই সমবায়ের অন্তর্ভুক্ত হবেন, সেহেতু এ দু'য়ের জন্য পৃথক পরিষদের প্রয়োজন নেই।

লক্ষণীয়, বাংলাদেশে গ্রাম পর্যায়ে আনুষ্ঠানিক প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর বর্তমান অনুপস্থিতি বেশ আশ্চর্যের, কেননা এ দেশের মানুষের আত্ম-পরিচয়ে গ্রামের ভূমিকাই গুরুত্বপূর্ণ। ইতিহাসের সূচনা থেকেই এ অঞ্চলে গ্রাম মানুষের অর্থনৈতিক ও সামাজিক একক হিসেবে কাজ করেছে, এবং গ্রাম পর্যায়ে আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো বিদ্যমান ছিল।

এটা ঠিক, বিশেষ ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্টের কারণে বাংলাদেশের গ্রামের সঙ্গে ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলের গ্রামের ভৌতিক (ফিজিক্যাল) গঠন কাঠামোর কিছু পার্থক্য ছিল এবং এখনও আছে। উত্তর ভারতে গ্রাম যেমন সাধারণত একটি ভৌতিকভাবে ঘনবদ্ধ রূপ পেয়েছিল, বাংলাদেশের নদ-নদী, জলাভূমি, ও জংগল আকীর্ণ পরিস্থিতিতে অনেক সময় তেমন হতে পারেনি এবং গ্রাম অনেক ক্ষেত্রে ছড়ানো-ছিটানো রূপ পেয়েছে। কেউ কেউ সে কারণে ভৌগলিক এবং সামাজিক একক হিসেবে গ্রামের যথার্থতা সম্পর্কে সন্দেহও প্রকাশ করেছেন।[৭৪]

কিন্তু ভৌতিক ঘনবদ্ধতার ঘাটতি সামাজিক একক হিসেবে বাংলাদেশের গ্রামের যথার্থতা বাতিল করে না। গ্রামের সীমা চিহ্নিত করার জন্যও সেটা কোনো সমস্যার ব্যাপার নয়। কে কোন গ্রামের, তা সাধারণত বাংলাদেশের মানুষ নিজেরাই জানে। এ বিষয়ে কোনো সংশয়ের ক্ষেত্রে তাঁদের

আত্ম-পরিচয়ের উপরেই নির্ভর করা যেতে পারে। অধ্যাপক অমর্ত্য সেনের আত্মপরিচয় সংক্রান্ত আলোচনাও সেই পরামর্শ দেয়।[৭৫] কাজেই বাংলাদেশের সামাজিক একক হিসেবে গ্রামের যথার্থতা সম্পর্কে সংশয়ের কোনো কারণ নেই। বিপরীতে, ইউনিয়ন অথবা ওয়ার্ড, উভয়ই বৃটিশ প্রবর্তিত সামাজিক-ভৌগলিক একক। এই শব্দগুলিই বিদেশি। এ দেশের অতীত ইতিহাসে এসবের স্থান ছিল না। বাংলাদেশের গ্রাম পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো কীরূপ হওয়া প্রয়োজন, তা বোঝার জন্য এ সংক্রান্ত অতীত ইতিহাসটি একটু সংক্ষেপে দেখে নেয়া দরকার।[৭৬]

১৬.১ প্রাক-ঔপনিবেশিক আমল

বাংলাদেশের গ্রামের ইতিহাস নিয়ে আমরা অন্যত্র বিস্তারিত আলোচনা করেছি (দ্রষ্টব্য, ইসলাম ২০১১)। সেখানে আমরা দেখেছি, বেদ আমলের কৌম (ট্রাইবাল বা কনসেনগুইন, অর্থাৎ রক্তসম্পর্ক ভিত্তিক) সমাজেও "গ্রাম" সামাজিক একক হিসেবে কাজ করেছে এবং "গ্রাম-সভা"র গুরুত্বপূর্ণ প্রাতিষ্ঠানিক ভূমিকা ছিল। পরবর্তীতে কৌম সমাজের বিবর্তনের মধ্য দিয়ে অঞ্চল বা এলাকা-ভিত্তিক (টেরিটোরিয়াল) সমাজের অবির্ভাব ঘটে, এবং পুনরায় সে সমাজের একক হিসেবে "গ্রাম" কাজ করে। মৌর্য সাম্রাজ্যের "সীতা" ভূমিতেই রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে প্রথম এলাকা-ভিত্তিক গ্রামের পত্তন ঘটে। সে কারণে এসব গ্রামকে "সম্রাটের গ্রাম" (ক্রাউন ভিলেজ) বলে আখ্যায়িত করা হতো। কৌটাল্যের "অর্থশাস্ত্রে" এ ধরনের গ্রামের বিবরণ পাওয়া যায়। অকৃষিজ পণ্য ও সেবার জন্য এসব গ্রামের কৃষকেরা নগর ভিত্তিক হস্ত বা কারুশিল্পীদের উপর নির্ভর করতেন। এসব কারুশিল্পীরাও রাষ্ট্র দ্বারা সংগঠিত ছিল, এবং রাষ্ট্রই এই বিনিময়ের ব্যবস্থা করতো। পরবর্তীতে নগরের এসব কারুশিল্পীদের গ্রামে ছড়িয়ে দেয়া হয়। এভাবেই ভারতবর্ষের "স্বয়ংসম্পূর্ণ" গ্রামের উদ্ভব ঘটে।[৭৭] মধ্যযুগ অতিক্রম করে একেবারে বৃটিশ শাসনের সূচনা পর্যন্ত মূলত এ ধরনের গ্রামই ভারতবর্ষে, এবং সেই সূত্রে, বাংলাদেশে বিরাজমান ছিল।

লক্ষণীয়, ভারতবর্ষে পরিদৃষ্ট গ্রামের স্বয়ংসম্পূর্ণতা একবারে অভিনব ছিল না। মধ্যযুগে পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই অর্থনীতি ছিল কৃষিপ্রধান; এবং এই অর্থনীতি ক্ষুদ্রাকার, স্থানীয় উৎপাদন ভিত্তিক, এবং বহুলাংশে স্বয়ংসম্পূর্ণ চরিত্রের ছিল। ভারতবর্ষের মূল যেটা ভিন্নতা, তা হলো বর্ণ প্রথা। ভারবর্ষে শ্রম বিভক্তি বর্ণ বিভক্তির রূপ গ্রহণ করে। বর্ণের অভ্যন্তরে পেশা অনুযায়ী "জাতি" বিভক্তির

প্রসার ঘটে এবং এই জাতি বিভক্তি বংশানুক্রমিক চরিত্র গ্রহণ করে। কোন গ্রামের কোন পেশার কত সংখ্যক পরিবার থাকবে, এবং হস্তশিল্পী পরিবারদের ভরণপোষণের জন্য গ্রামের কৃষিজীবী পরিবারদের নিকট থেকে কী পরিমাণ শস্য "চাঁদা" হিসেবে পাবে, এসব বিষয় প্রথাসিদ্ধ উপায়ে কিংবা গ্রামবাসীদের সিদ্ধান্তক্রমেই নির্ধারিত হতো। বৃটিশ পার্লামেন্টের পঞ্চম নির্বাচিত কমিটির প্রতিবেদনে এসব প্রথার বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়।[৭৮]

সুতরাং গ্রাম পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের একটি কাঠামো বরাবরই বিরাজ করতো। বেশিরভাগ স্থানে "গ্রাম পঞ্চায়েত"-এর উদ্ভব ঘটে। ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষ কিংবা বহিস্থ কোন সংস্থা বা ব্যক্তির সঙ্গে গ্রাম পঞ্চায়েতই গ্রামের প্রতিনিধিত্ব করতো। অনেক স্থানে গ্রাম পঞ্চায়েতের অংশ হিসেবেই "গ্রাম প্রধান"-এর সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। গ্রামের প্রভাবশালী পরিবারদের মধ্য থেকেই গ্রাম প্রধান আবির্ভূত হতেন। কোথাও কোথাও গ্রাম প্রধানের পদটি উত্তরাধিকার চরিত্র লাভ করে। সামন্ত আমলে খাজনা আদায়ের ক্ষেত্রে যে নমনীয়তা ছিল, তা ব্যবহার করে গ্রাম পঞ্চায়েতসমূহ গ্রামের স্বার্থ রক্ষা করতো।

১৬.২ বৃটিশ আমল

বৃটিশ আমলে গ্রাম পর্যায়ে বিরাজমান সনাতনী প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোসমূহ স্থানভেদে বিভিন্ন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়। লক্ষণীয়, যে বৃটিশরা ষোড়শ শতাব্দী থেকে ভারতবর্ষে আগমন করে তারা ছিল "বাণিজ্যবাদ" (মার্কেন্টাইলিজম)-এর প্রতিভূ। এই বাণিজ্যবাদ পুঁজিবাদেরই সূচনাকারী এবং বুর্জোয়া মালিকানার উদগাতা। সে কারণে, ভারতবর্ষের তদানীন্তন সামন্ত শাসকদের বিপরীতে বৃটিশদের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল "ব্যবসায়িক"। খাজনা আদায়কে তারা একটি জীবনধারার পরিবর্তে নিছক আরেকটি ব্যবসায়িক তৎপরতা হিসেবে দেখেছে। সে কারণে তারা খাজনাকে "মুনাফা" হিসেবে গণ্য করেছে, এবং কীভাবে তার পরিমাণ সর্বোচ্চ করা যায়, সেই লক্ষ্যে ব্যস্ত থেকেছে।

খাজনার পরিমাণ সর্বোচ্চ করার লক্ষ্যে বৃটিশেরা বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষায় অবতীর্ণ হয় এবং সময়ে ও স্থানভেদে বিভিন্ন ধরনের ভূমি বন্দোবস্তের প্রবর্তন করে। সুবিদিত যে, তার মধ্যে মূল তিনটি রূপ ছিল। এগুলি হলোঃ (ক) জমিদারী বন্দোবস্ত; (খ) মহলাওয়ারী বন্দোবস্ত; এবং (গ) রায়তওয়ারী বন্দোবস্ত।[৭৯] এর মধ্যে জমিদারী বন্দোবস্তই ছিল ভারতবর্ষে বৃটিশ প্রবর্তিত প্রথম ভূমি বন্দোবস্ত। ১৭৯৩ সনে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যায় প্রবর্তিত এই

বন্দোবস্ত অনুযায়ী বাৎসরিক খাজনার পরিমাণ নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়; এবং অনাদায়ে জমিদারী নিলামে বিক্রয়ের প্রথা চালু করা হয় (অনুচ্ছেদ ৫ দ্রষ্টব্য)। পরবর্তীতে উত্তর ভারতে তাদের শাসন বিস্তারের পর সেখানে বৃটিশেরা পূর্বতন জমিদারদের পরিবর্তে "মহল" সমূহের সঙ্গে খাজনার বন্দোবস্ত চালু করে। অর্থাৎ মহলসমূহকে নির্দিষ্ট পরিমাণ খাজনা আদায়ের দায়িত্ব দেয়া হয়। মহল বলতে মূলত গ্রামকেই বোঝানো হয়েছিল। আগেই উল্লিখিত হয়েছে, ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্টের কারণে উত্তর ভারতে গ্রামসমূহ অধিকতর ভৌতিক এবং সামাজিকভাবে ঘনবদ্ধ রূপ পরিগ্রহ করে। বৃটিশ কর্তৃক উত্তর ভারতে মহলাওয়ারী বন্দোবস্তের মধ্যে তারই প্রতিফলন দেখা যায়। সবশেষে, দক্ষিণ ভারত জয় করার পর সেখানে বৃটিশেরা মূলত রায়তওয়ারী বন্দোবস্ত চালু করে। এই বন্দোবস্তে সরাসরিভাবে রায়তদের নির্দিষ্ট পরিমাণ খাজনা প্রদানের জন্য দায়ী করা হয়।

বিভিন্ন ভূমি বন্দোবস্ত গ্রামের বিদ্যমান স্বশাসন কাঠামোর উপর বিভিন্ন ধরনের প্রভাব ফেলে। রায়তওয়ারী বন্দোবস্ত গ্রামের স্বশাসন কাঠামোর জন্য সবচেয়ে বেশি বিপরীতধর্মী হয়, কেননা এর ফলে উপরিস্থ রাষ্ট্র আর কৃষকদের মধ্যে মধ্যস্থতামূলক বিশেষ কোনো ভূমিকা গ্রামভিত্তিক সংস্থার থাকে না। মহলাওয়ারী বন্দোবস্তে এ সংক্রান্ত পরিস্থিত ছিল বিপরীত, কারণ – যে বিষয়টি আমরা উপরে লক্ষ্য করলাম – প্রায়শ গ্রামসমূহই "মহল" হিসেবে বিবেচিত হয়েছিল। ফলে এই বন্দোবস্তে গ্রামের স্বাশাসনমূলক প্রশাসনিক কাঠামোর গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছিল। বলাবাহুল্য, আমাদের জন্য প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন হলো, গ্রামের স্বশাসনমূলক প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর উপর "জমিদারী" বন্দোবস্তের কী প্রতিফল হয়েছিল।

এই প্রশ্নের উত্তর অনেকটা নির্ভর করে বৃটিশ নির্ধারিত খাজনার পরিমাণ এবং সে খাজনা আদায়ের পদ্ধতির বিষয়ে জমিদারদের আচরণের উপর। উপরে (অনুচ্ছেদ ৫) আমরা লক্ষ্য করেছি, ভূমি মালিকানা সম্পর্কে বৃটিশদের ধারণা ছিল সামন্ত ভারতের ভূমি মালিকানা থেকে মৌলিকভাবে ভিন্ন। বৃটিশরা ভারতে জমির উপর "বুর্জোয়া মালিকানা" প্রবর্তনে প্রবৃত্ত হয়েছিল। বুর্জোয়া মালিকানার মূল বৈশিষ্ট হলো মালিকানার "নিরঙ্কুশ" (এবসল্যুট) চরিত্র। বিপরীতে, সামন্ত জমি মালিকানার মূল বৈশিষ্ট হলো মালিকানার "আপেক্ষিক" (রিলেটিভ) চরিত্র। প্রাক-ঔপনিবেশিক সামন্ত বাংলায় জমির উপর একদিকে যেমন কৃষকের অধিকার (মালিকানা) ছিল, তেমনি ছিল জমিদারের অধিকার

(মালিকানা); আরও ছিল রাজা বা সম্রাটের অধিকার (মালিকানা)। কার কতোটুকু অধিকার তা নির্দিষ্ট সময়ে বিরাজমান প্রথা এবং আপেক্ষিক শক্তি ভারসাম্যের উপর নির্ভর করতো।

এই পটভূমিতে যখন বৃটিশেরা জমিদারদের "বুর্জোয়া" মালিকে রূপান্তরিত করতে সচেষ্ট হয়, তখন স্বাভাবিক কারণেই তা শুধু জমির উপর কৃষকের অধিকার (মালিকানা)-কে খর্ব করে না; তা জমির উপর গ্রামের স্বশাসনমূলক প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর অধিকারকেও খর্ব করে। তদুপরি, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অধীনে খাজনার হার বেশ উঁচুতেই নির্ধারিত হয়। সামন্তযুগে পরিস্থিতি সাপেক্ষে *নির্ধারিত* খাজনা থেকে *আদায়কৃত* খাজনা ভিন্ন হওয়াটা স্বাভাবিক গণ্য হতো। কিন্তু বৃটিশ প্রবর্তিত বন্দোবস্তে এ ধরনের নমনীয়তার কোনো সুযোগ ছিল না। ৫ নং অনুচ্ছেদে আমরা লক্ষ্য করেছি, খাজনা আদায়ে ঘাটতির কারণে জমিদারী নিলামে বিক্রয়ের বিধান ছিল। (জমিদারী নিলামে বিক্রয়ের বিধান সামন্ত যুগে চিন্তারও অতীত ছিল।) ফলে জমিদারেরা যে কোনো প্রকারে খাজনা আদায়ে বাধ্য ছিল। আমরা আরও লক্ষ্য করেছি যে, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির পরিবর্তে নব্য বেনিয়া জমিদারেরা মূলত কৃষক নিগ্রহের পথ বেছে নেয়। এ ধরনের পরিস্থিতিতে কৃষক আর জমিদারের মধ্যে মধ্যস্থতামূলক ভূমিকা পালনের সুযোগ গ্রামের স্বশাসনমূলক কাঠামোসমূহের কমে যায়। সুতরাং, একদিকে "মালিকানা চরিত্রে"র নীতিগত পরিবর্তন এবং অন্যদিকে উদ্ভূত পরিস্থিতির ফলশ্রুতি হিসেবে "বিদ্যমান প্রথা"র অবক্ষয়, এই উভয় কারণেই জমিদারী বন্দোবস্তের অধীনেও বৃটিশ আমলে গ্রামের স্বশাসনমূলক প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর ভূমিকা খর্বিত হয়।

জমিদারী বন্দোবস্ত দ্বারা জমির উপর সনাতনী অধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণে বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে কৃষক সমাজের ক্ষোভ বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং বিভিন্ন বিদ্রোহের রূপ নেয়। বিশেষত, ১৮৫৭ সনের সিপাহী বিদ্রোহের পর বৃটিশ শাসকেরা কৃষক এবং সাধারণ জনগণের মধ্যে ক্ষোভ প্রশমণের তাগিদ অনুভব করে। ১৮৭০ সনে প্রবর্তিত "গ্রাম চৌকিদার আইন" তারই একটি উদাহরণ। এই আইনের মাধ্যমে সনাতনী গ্রাম পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকে পুনরুজ্জীবিত করা হয়, এবং জেলার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটকে গ্রামের অধিবাসীদের মধ্য থেকে তিন থেকে পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েত গঠন করার ক্ষমতা দেয়া হয়। এই পঞ্চায়েত গ্রামের চৌকিদার নিয়োগের ক্ষমতা পায়। আইন অনুযায়ী চৌকিদারের মূল কাজ ছিল আইন শৃঙ্খলা রক্ষা এবং

পঞ্চায়েতের অন্যান্য আদেশ বাস্তবায়িত করা। এছাড়া গ্রামে সংঘটিত অপরাধ সম্পর্কে নিকটস্থ থানাকে অবহিত করাও তার অন্যতম দায়িত্ব ছিল। এ থেকে বোঝা যায় যে, গ্রাম পঞ্চায়েতের পুনরুজ্জীবন ছিল মূলত আইন-শৃখংলা পরিস্থিতি সামাল দেয়ার একটি কৌশল মাত্র; (অনেকের মতে, এটা ছিল মূলত গ্রামের ভেতর থেকে চৌকিদারদের বেতন সংগ্রহের ব্যবস্থা); ফলে এতে প্রাক ঔপনিবেশিককালে গ্রাম পঞ্চায়েতের যে বৃহত্তর অর্থনৈতিক ও সামাজিক ভূমিকা ছিল তার তেমন স্বীকৃতি বা প্রতিফলন ছিল না।

চৌকিদার আইন যে পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য পর্যাপ্ত নয়, বৃটিশ শাসকেরা সময়ে নিজেরাই তা উপলব্ধি করে। জমিদারী বন্দোবস্তের মাধ্যমে জমির উপর রায়তদের অধিকার যেরূপ অন্যায্যভাবে হরণ করা হয়েছিল, তার কিছুটা প্রতিকারের উদ্দেশ্যে ১৮৮৫ সনে "বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন" (বেঙ্গল টেন্যান্সী এক্ট) পাশ করা হয়। এর ফলে জমির উপর রায়তদের হৃত অধিকার কিছুটা পুনর্প্রতিষ্ঠিত হয় বটে; কিন্তু ততোদিনে ভূমি অনুপাতে জনসংখ্যার বৃদ্ধির কারণে এই আইনের কার্যকারিতা বহুলাংশে হ্রাস পায়। কৃষকের উদ্বৃত্ত অধিগ্রহণের জন্য রাজনৈতিক বলপ্রয়োগের চেয়ে অর্থনৈতিক বলপ্রয়োগ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়।

লক্ষণীয়, প্রায় একই সময়ে (১৮৮২ সনে) লর্ড রিপন প্রণীত প্রস্তাব অনুযায়ী তৃণমূল পর্যায়ে স্থানীয় সরকার গঠনের উদ্যোগ নেয়া হয়, এবং সে উদ্দেশ্যে "বঙ্গীয় স্থানীয় স্বশাসন সরকার আইন, ১৮৮৫" (বেঙ্গল লোকাল সেলফ গভর্নমেন্ট এক্ট, ১৮৮৫) গৃহীত হয়। এটা কাকতালীয় নয় যে, রায়তদের অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রজাস্বত্ব আইন আর স্থানীয় সরকার গঠনের আইন একই সময়ে গৃহীত হয়। শেষোক্ত আইন অনুযায়ী জেলা পর্যায়ে "জেলা বোর্ড," মহকুমা পর্যায়ে "লোকাল বোর্ড," এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে "ইউনিয়ন কমিটি" গঠিত হয়। একই সঙ্গে এই আইন দ্বারা গ্রাম পঞ্চায়েত সমূহ বাতিল হয়ে যায়। ১৯১৯ সনে আবার "বঙ্গীয় গ্রাম স্বশাসন সরকার আইন" (বেঙ্গল ভিলেজ সেলফ গভর্নমেন্ট এক্ট) পাশ হয়। এই আইন মোতাবেক "ইউনিয়ন কমিটি"কে "ইউনিয়ন বোর্ড" দ্বারা প্রতিস্থাপিত করা হয়। ১৯৩৬ সনে লোকাল বোর্ডকে বাহুল্য বিবেচনা করে বাতিল করা হয়।

লর্ড রিপনের প্রস্তাব অনুযায়ী এসব স্থানীয় সরকারের দায়িত্ব আর শুধু আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় সীমাবদ্ধ ছিল না। স্বীয় এলাকার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজও তাদের এখতিয়ারের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়। এসব বোর্ডে দুই-তৃতীয়াংশ

নির্বাচত সদস্য থাকা, এবং প্রশাসনের বাইরে থেকে কাউকে সভাপতি (চেয়ারম্যান) করার বিধান ছিল। নতুন করে "স্বশাসন" (সেলফ গভার্নেন্স) কথাটির প্রচলন ঘটে। এসব বৈশিষ্টের কারণে অনেকে ভারতবর্ষে স্থানীয় সরকার গঠনে ১৮৮২ সনের রিপন প্রস্তাবকে "ম্যাগনা কার্টা" বলে অভিহিত করেছেন। তা সত্ত্বেও গ্রামের দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা যেটা লক্ষ্য করতে পারি তা হলো, গ্রাম-পঞ্চায়েত ব্যবস্থাটি রিপনের প্রস্তাবে এবং সে অনুযায়ী গৃহীত ১৮৮৫ সনের আইনে উপেক্ষিত হয়। ভারত বিভক্তি এবং পাকিস্তান গঠন পর্যন্ত গ্রাম পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো বিবর্তনের প্রক্রিয়াটি মোটামুটি এ পর্যন্তই অগ্রসর হয়।

১৬.৩ পাকিস্তান আমল

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ১৯৫০ সনে "পূর্ব বঙ্গীয় রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ এবং জমিস্বত্ব আইন" (ইস্ট বেঙ্গল স্টেট একুইজিশন এন্ড টেন্যান্সী এক্ট – ইবিএসএটিএ) গৃহীত এবং বাস্তবায়িত হওয়ার ফলে বাংলাদেশে মূলত রায়তওয়ারী ভূমি বন্দোবস্ত চালু হয়। উপরের আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা ইতিমধ্যেই লক্ষ্য করেছি যে, এই বন্দোবস্তে গ্রাম পর্যায়ে স্বশাসনমূলক কাঠামোকে অবহেলা করা হয়। ফলে পূর্ব পাকিস্তান পর্বে বাংলাদেশে গ্রাম পর্যায়ে কোন আনুষ্ঠানিক প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো বিকশিত হতে পারে না। অনানুষ্ঠানিকভাবে অবশ্য সমগ্র গ্রামকে অন্তর্ভুক্ত করে কিংবা গ্রামের কোনো বিশেষ অংশজুড়ে বহু ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো অথবা তার অবশিষ্টাংশ বিরাজ করতে থাকে।

এরই মধ্যে আইয়ুব খান ক্ষতাসীন হওয়ার পর ১৯৫৯ সনে "বুনিয়াদী গণতন্ত্র অধ্যাদেশ" (বেসিক ডেমোক্র্যাসি অর্ডিন্যান্স) জারি হয়। এই অধ্যাদেশ অনুযায়ী চার স্তর বিশিষ্ট স্থানীয় সরকার কাঠামো প্রবর্তিত হয়। এর সর্বনিম্ন স্তরে ছিল প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটে নির্বাচিত ইউনিয়ন "পরিষদ" ("বোর্ড"-এর পরিবর্তে)। উপরের স্তরসমূহের সদস্যদের কিছু নীচের স্তরের সদস্যদের ভোটে (অপ্রত্যক্ষভাবে) নির্বাচিত হতেন; এবং বাকীরা সরকার দ্বারা মনোনীত হতেন। শেষোক্তদের মধ্য থেকেই সভাপতি (চেয়ারম্যান) নিযুক্ত হতেন। বলাবাহুল্য, আইয়ুব খান প্রবর্তিত স্থানীয় সরকার কাঠামো লর্ড রিপনের প্রস্তাবানুযায়ী বৃটিশ আমলে ১৮৮৫ সনে প্রবর্তিত স্থানীয় সরকার কাঠামোর অনুরূপ। কিন্তু এতে সরকারী নিয়ন্ত্রণ আরও বৃদ্ধি পায় এবং গ্রাম পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর

প্রয়োজনীয়তা প্রতিফলিত হয় না। বস্তুত এই স্থানীয় সরকার কাঠামোর মূল উদ্দেশ্য ছিল আইয়ুব খানের ক্ষমতা গ্রহণ এবং শাসনকে বৈধতা ও সমর্থন প্রদান। বিষয়টি আরও স্পষ্ট হয় যখন ১৯৬২ সনে গৃহীত শাসনতন্ত্র মোতাবেক ৮০,০০০ তথাকথিত বুনিয়াদী গণতন্ত্রীদের ভোটে প্রেসিডেন্ট এবং জাতীয় ও প্রাদেশিক সংসদ নির্বাচনের বিধান ঘোষিত হয়। এসব বুনিয়াদী গণতন্ত্রীদের সঙ্গে পূর্বসৃষ্ট স্থানীয় সরকার কাঠামোসমূহের সঙ্গে বহুক্ষেত্রে অসামঞ্জস্যতা দেখা দেয়।

১৬.৪ বঙ্গবন্ধু আমল

স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের ক্ষমতা গ্রহণের পর বঙ্গবন্ধু স্থানীয় সরকার ইস্যুর প্রতিও মনোযোগ দেন। ১৯৭২ সনের ৭নং আদেশ দ্বারা তিনি "ইউনিয়ন কাউন্সিলে"র নাম বদলিয়ে "ইউনিয়ন পঞ্চায়েত" করেন, এবং তা নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা সার্কেল অফিসার (উন্নয়ন)-এর উপর ন্যস্ত করেন। প্রেসিডেন্টের ২২ নং আদেশ ইউনিয়ন পঞ্চায়েতকে সম্পূর্ণ নির্বাচত করার বিধান দেয়। ১৯৭৩ সনে "ইউনিয়ন পঞ্চায়েতে"র নাম পুনরায় "ইউনিয়ন পরিষদে" পরিবর্তিত করা হয়।

১৯৭২ সনে গৃহীত বাংলাদেশের সংবিধান স্থানীয় সরকারের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে (দ্রষ্টব্য, সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৫৯ এবং ৬০)। নির্বাচনের মাধ্যমে এসব সংস্থা গঠিত হওয়া এবং সংসদ প্রণীত আইন দ্বারা সেসবের কার্যক্রম পরিচালিত হওয়ার বিধান করা হয়। সংবিধানে বর্ণিত স্থানীয় সরকারের করণীয় হলো প্রশাসন, আইন-শৃংখলা রক্ষা, জনসেবা এবং উন্নয়নমূলক কার্যক্রম সম্পাদন। স্থানীয় সরকারের জন্য নির্দিষ্ট এলাকা চিহ্নিত করার বিধান দিয়েছে সংবিধান। সুতরাং গ্রাম পর্যায়ে স্থানীয় সরকার কাঠামো সৃষ্টির পথে সাংবিধানিক কোন বাধা নেই; বরং সংবিধান তা উৎসাহিত করে।

১৯৭২-৭৩ সনে ইউনিয়নের প্রতি মনোযোগ দেয়া সত্ত্বেও এটা পরিষ্কার যে, বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক একক হিসেবে গ্রামকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। বাংলাদেশের আবহমানকালের ইতিহাস ও ঐতিহ্য যে গ্রামকে ঘিরেই আবর্তিত হয়েছে এ বিষয়ে তিনি সচেতন ছিলেন। তিনি জানতেন যে, ইউনিয়ন এবং ওয়ার্ড হলো বৃটিশ প্রবর্তিত কৃত্রিম একক। এগুলোর কোনো ঐতিহাসিক শেকড় নেই। তদুপরি তিনি ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যদের দুর্নীতি নিয়ে বিরক্ত ছিলেন। সে কারণেই তিনি ১৯৭৫ সনে সরাসরি গ্রামে পৌঁছানোর উদ্যোগ নেন। তিনি "ইউনিয়ন পরিষদের টাউটদের বিদায় করার" আহ্বান জানান। তিনি প্রতি গ্রামে সকলকে অন্তর্ভুক্ত করে সমবায় গঠনের কর্মসূচি

ঘোষণা করেন। তবে কীভাবে এই সমবায় পরিচালিত হবে এবং গ্রাম পর্যায়ে স্বশাসিত স্থানীয় সরকার সংস্থার সঙ্গে এর কী সম্পর্ক হবে, সেসব প্রশ্ন নিয়ে তিনি বিস্তারিত ভাবার সুযোগ পান নাই। খন্দকার মোশতাকের নেতৃত্বে ষড়যন্ত্রকারীরা তার আগেই তাঁকে সপরিবারে হত্যা করে এবং তাঁর সরকারের পতন ঘটায়।

এখন যদি বাংলাদেশের গ্রাম বিষয়ক বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন বাস্তবায়িত করতে হয়, তবে এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হবে। তার আগে বঙ্গবন্ধুর সরকারের পর থেকে এ পর্যন্ত অন্যান্য সরকারের আমলে গ্রাম পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠান গঠনে আর কী কী উদ্যোগ গৃহীত হয়েছে, তা সংক্ষেপে দেখে নেয়া প্রয়োজন।

১৬.৫ জিয়াউর রহমান আমল

জিয়াউর রহমানের আমলে ১৯৭৬ সনে "স্থানীয় সরকার অধ্যাদেশ" জারি করা হয়। এই অধ্যাদেশ অনুযায়ী ইউনিয়ন পরিষদকেই স্থানীয় সরকারের সর্বনিম্ন স্তর হিসেবে গণ্য করা হয়। এতে নির্বাচনের মাধ্যমে একজন সভাপতি এবং নয় জন সদস্য থাকার বিধান হয়। তার সঙ্গে দু'জন মহিলা এবং দু'জন কৃষক প্রতিনিধি মনোনয়নের ব্যবস্থা রাখা হয়। পরবর্তিতে জিয়াউর রহমান গ্রাম পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়ার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। সে লক্ষ্যে তিনি ১৯৮০ সনে "স্বনির্ভর গ্রাম সরকার" বিধিমালা জারি করেন।[৮০] এই বিধিমালা অনুযায়ী একজন গ্রাম প্রধান হবেন। বাকী ১২ জন সদস্য হবেন, তার মধ্যে কমপক্ষে দু'জন মহিলা থাকবেন। গ্রাম সরকারের করণীয় হিসেবে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ উল্লিখিত হয়: (ক) খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি, (খ) গণ-সাক্ষরতা অর্জন, (গ) পরিবার-পরিকল্পনা এবং জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, এবং (ঘ) আইন-শৃংখলা রক্ষা, শালিস করা এবং স্থানীয় বিবাদ-বিরোধ নিষ্পত্তি। এ সংক্রান্ত গেজেটের টীকায় আরও উল্লেখ করা হয় যে, গ্রাম সমবায় এবং সমবায় ব্যাংক উৎসাহিত করাও গ্রাম সরকারের কাজের অন্তর্ভুক্ত হবে। গ্রাম সরকারকে প্রয়োজনে ঊর্ধপক্ষে চার সদস্য বিশিষ্ট বিভিন্ন কমিটি গঠনের এখতিয়ার দেয়া হয়। স্বনির্ভর গ্রাম সরকার আইন অনুযায়ী "স্বনির্ভর গ্রাম তহবিল" গড়ার বিধান হয়। বলা হয় যে, এই তহবিলের আয়সূত্র হবে: (ক) ব্যক্তির অনুদান, (খ) গ্রাম সমবায় সমিতি অথবা কোন প্রতিষ্ঠান কিংবা কর্তৃপক্ষ সূত্রে আয় অথবা অনুদান, এবং (গ) অন্য কোন বৈধসূত্রের আয়।

১৯৮০ সনে গ্রাম সরকার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, এবং নির্বাচিত সদস্যদের একটি মহা-সমাবেশ রাজধানী ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু ১৯৮১ সনে জিয়াউর রহমানের মৃত্যু এবং ক্ষমতার পরিবর্তনের ফলে গ্রাম সরকার সংক্রান্ত নিরীক্ষাটি বেশিদূর অগ্রসর হতে পারে না।[৮১]

১৬.৬ এরশাদ আমল

১৯৮২ সনে সামরিক আইন জারি করার মধ্য দিয়ে এরশাদ ক্ষমতাসীন হওয়ার কিছুকালের মধ্যেই গ্রাম সরকার বাতিল ঘোষণা করেন। তিনি বরং থানা পর্যায়ে স্থানীয় সরকারের উপর বিশেষ মনোযোগ দেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি থানাসমূহকে উপজেলা নামকরণ করেন (এবং পূর্বতন মহকুমাসমূহ জেলায় পরিণত করেন)। আগে যেখানে থানা পর্যায়ে প্রশাসনিক কাঠামো মূলত রাজস্ব আদায়ে নিয়োজিত "সার্কেল অফিসার" এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত "অফিসার-ইন-চার্জ")-এ সীমাবদ্ধ ছিল, সে স্থলে তিনি উপজেলা পর্যায়ে জাতীয় সরকারের প্রায় সকল মূল বিভাগের প্রতিনিধি নিয়োগ করেন। উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউ-এন-ও) এই সকল বিভাগের কাজের সমন্বয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত হন। প্রশাসনিক এই কাঠামোর পাশাপাশি নির্বাচিত উপজেলা পরিষদ গঠিত হয়, এবং এই পরিষদের চেয়ারম্যান (উপজেলা চেয়ারম্যান) আইনগতভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হন। প্রশাসনিক ও নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত উপজেলা পর্যায়ের এই সরকার কাঠামোকে শক্ত ভিত্তি দেয়ার জন্য প্রয়োজনীয় ভৌতিক অবকাঠামো নির্মাণের উপর জোর দেয়া হয়। প্রথম পর্যায়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে উপজেলা চেয়ারম্যানের অধীনস্থ করা হয়; কিন্তু প্রশাসনিক ক্যাডারের সদস্যরা এই ব্যবস্থাকে সুনজরে দেখে নি। উপজেলা চেয়ারম্যান আর ইউ-এন-ও-র মধ্যকার ক্ষমতার দ্বন্দ্বের কোনো চূড়ান্ত সমাধান হয়েছে বলে আজও বলা কঠিন।

উপজেলা পর্যায়ে সরকার কাঠামো গড়ে তোলার পাশাপাশি এরশাদ নিজেকে "পল্লীবন্ধু" হিসেবে জাহির করেন এবং ১৯৮৯ সনে "পল্লী পরিষদ আইন" প্রণয়ন করেন। তবে শেষোক্ত আইনটি সেভাবে কার্যকর হওয়ার আগেই ১৯৯০ সনে তিনি গণ-অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতা থেকে উৎখাত হয়ে যান।

১৬.৭ খালেদা জিয়া সরকার (১৯৯১-১৯৯৬)

সামরিক শাসন পর্বের অবসানের পর ১৯৯১ সনে বিএনপি-র নেতৃত্বে নির্বাচিত সরকার গঠিত হয়। এ সময় "স্থানীয় সরকার কাঠামো পর্যালোচনা

কমিশন" (লোকাল গভর্ণমেন্ট স্ট্রাকচার রিভিউ কমিশন) গঠিত হয়। এই কমিশন "গ্রাম সভা" গঠনের সুপারিশ করে। এই প্রস্তাবমতে গ্রাম সভার দশজন সদস্য হবেন – তারমধ্যে দু'জন মহিলা, দু'জন কৃষক, এবং দু'জন কৃষি-শ্রমিক থাকবেন। কিন্তু এই সুপারিশ বাস্তবায়িত হয় না। ফলে ইউনিয়ন পরিষদই সর্বনিম্ন প্রতিষ্ঠান থেকে যায়। এই সরকার উপজেলা পরিষদের ব্যাপারে নিস্পৃহ থাকে।

১৬.৮ শেখ হাসিনা সরকার (১৯৯৬-২০০১)

১৯৯৬ সনে নির্বাচনের মধ্য দিয়ে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সরকার গঠিত হয়। এই সরকার স্থানীয় সরকার পুনর্গঠনের লক্ষ্যে একটি কমিশন গঠন করেন। এই কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী "স্থানীয় সরকার (গ্রাম পরিষদ) আইন ১৯৯৭" প্রণীত হয়। এই আইন অনুযায়ী ওয়ার্ড ভিত্তিতে "গ্রাম পরিষদ" গঠিত হওয়ার কথা। সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য পদাধিকার বলে গ্রাম পরিষদের চেয়ারম্যান হবেন। নয়জন পুরুষ ও তিনজন মহিলা সদস্য থাকবেন। ইউনিয়ন পরিষদের নিকট বিভিন্ন বিষয়ে প্রতিবেদন পেশকেই গ্রাম পরিষদের মূল করণীয় হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ১৯৯৭ সনের এই আইন প্রণীত হলেও তা বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া হয় নি। বরং এই সরকার ১৯৯৮ সনে উপজেলা পরিষদ পুনরুজ্জীবিত করে।

১৬.৯ খালেদা জিয়া সরকার (২০০১-২০০৬)

২০০১ সনে বিএনপি নেতৃত্বাধীন জোট সরকার গঠিত হয়। এই সরকার পূর্বতন সরকার প্রণীত স্থানীয় সরকার (গ্রাম পরিষদ) আইন, ১৯৯৭ বাতিল করে এবং তার স্থলে "গ্রাম সরকার আইন, ২০০৩" প্রণয়ন করে। পূর্বেকার মতো শেষোক্ত আইনেও ওয়ার্ড ভিত্তিক গ্রাম সরকার প্রতিষ্ঠা করার কথা হয়। তবে এবার ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের পরিবর্তে নির্বাচিত ওয়ার্ড কমিশনারকে নিজ নিজ গ্রাম সরকারের প্রধান হিসেবে গণ্য করা হয়। সাধারণভাবে যদিও আইনটির ভূমিকায় প্রতিনিধিত্বমূলক স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য ঘোষিত হয়, কিন্তু গ্রাম সরকার গঠনে নির্বাচনের পরিবর্তে "মনোনয়নে"র বিধান রাখা হয়েছিল। সেকারণে বিভিন্ন মানবাধিকার এবং আইনগত অধিকার বিষয়ক সংস্থা "গ্রাম সরকার আইন, ২০০৩"-এর সাংবিধানিক বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে দেশের উচ্চ আদালতে মামলা রজু করে,

কেননা সংবিধানে স্থানীয় সরকারসমূহ "নির্বাচিত" হওয়ার বিধান আছে। এই মামলার পরিপ্রেক্ষিতে সুপ্রীম কোর্ট ২০০৩ সনের গ্রাম সরকার আইনকে সংবিধান পরিপন্থী বলে রায় দেয়।[৮২]

১৬.১০ এক-এগারো (১/১১) সরকার (২০০৭-২০০৮)

২০০৭ সনে বাংলাদেশে পুনরায় প্রত্যক্ষভাবে সামরিক বাহিনী সমর্থিত সরকার গঠিত হয়। তত্ত্বাবধায়ক সরকার আইনের আওতায় গঠিত এই সরকারের মূল করণীয় ছিল নির্বাচন অনুষ্ঠান। কিন্তু প্রথমাবস্থায় এই সরকার দেশে বড় ধরনের রাজনৈতিক সংস্কার সাধনের উদ্যোগ গ্রহণ করে। সেই সূত্রে এই সরকার স্থানীয় সরকার কাঠামো বিষয়েও উদ্যোগ গ্রহণ করে এবং উপজেলা পরিষদসমূহ বাতিল করে। তবে দ্রুতই স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, কেবল নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রতিই এই সরকারের মনোযোগ নিবদ্ধ হওয়া উচিত। সে অনুযায়ী ২০০৯ সনের শুরুতে নির্বাচন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এই সরকারের অবসান ঘটে।

১৬.১১ শেখ হাসিনার সরকার (২০০৯-বর্তমান)

২০০৯ থেকে পর পর দুই মেয়াদে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন সরকার ক্ষমতায় আছে। এসময়ে স্থানীয় সরকার সংক্রান্ত অনেকগুলো আইন প্রণীত হয়েছে, যেমন "স্থানীয় সরকার (নগর কর্পোরেশন) আইন ২০০৯," "স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯," "ইউনিয়ন পরিষদ আইন, ২০০৯।" ১৯৯৮ সনের "উপজেলা পরিষদ আইন"ও পুনর্বহাল করা হয়েছে। কিন্তু গ্রাম পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়ার যে উদ্যোগ ১৯৯৭ সনের "স্থানীয় সরকার (গ্রাম পরিষদ) আইনে" -র মাধ্যমে গৃহীত হয়েছিল, তার পুনরুজ্জীবন এবং বাস্তবায়নের কোনো পদক্ষেপ এখনো নেয়া হয় নি।

১৬.১২ গ্রাম পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো বিষয়ক বিভিন্ন প্রস্তাবের তুলনা

উপরের আলোচনা থেকে পরিষ্কার, বাংলাদেশে গ্রাম পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো অনেক উত্থান-পতনের সম্মুখীন হয়েছে। বৃটিশ আমলে জমিদারী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের ফলে চিরায়িত গ্রাম-পঞ্চায়েতের ভূমিকা এবং ক্ষমতা খর্বিত হয়েছে। চৌকিদার আইনের মাধ্যমে গ্রাম-পঞ্চায়েত পুনরুজ্জীবিত করার উদ্যোগ নেয়া হলেও তার উদ্দেশ্য ছিল ঔপনিবেশিক কায়েমি স্বার্থ-প্রণোদিত। বরং ইউনিয়ন এবং ওয়ার্ড নামে নতুন সামাজিক-ভৌগলিক এককের সূচনা করা

হয়। পাকিস্তান আমলে ইউনিয়ন পরিষদই বহাল থাকে। তবে তা গঠনের ব্যাপারে বৃটিশ আমলের তুলনায় আরও অগণতান্ত্রিক রীতি চালু হয়। তদুপরি বুনিয়াদী গণতন্ত্র প্রবর্তনের ফলে স্থানীয় সরকারের প্রকৃত উদ্দেশ্য আরও প্রশ্নবিদ্ধ হয়।

স্বাধীনতার পর গ্রাম, ইউনিয়ন, উপজেলা, এবং জেলা পর্যায়ে স্থানীয় সরকার কাঠামো নিয়ে বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা সংঘটিত হয়েছে। বিভিন্ন সরকার ক্ষমতায় এসে পূর্ববর্তী সরকারের উদ্যোগসমূহ বাতিল করার দিকেই যেন বেশি মনোযোগী হয়েছে। প্রবর্তন, বাতিল, পুনর্প্রবর্তন, সংশোধনের এসব দীর্ঘ ইতিহাস সত্ত্বেও জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, এবং ইউনিয়ন পরিষদ বিভিন্ন রূপে চালু আছে। বর্তমান সরকারের অধীনে উপজেলা এবং ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচনও অনুষ্ঠিত হয়েছে, এবং জেলা পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠানের কথা হচ্ছে। কিন্তু গ্রাম পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো এখনও অনুপস্থিত।

তবে বাংলাদেশে গ্রাম পর্যায়ে স্থানীয় সরকার কাঠামো প্রতিষ্ঠার বিষয়ে আশাবাদী হওয়ার যথেষ্ট ভিত্তি আছে। প্রথমত, যে বিষয়টি উপরে ইতিমধ্যেই উল্লিখিত হয়েছে, বাংলাদেশের সংবিধানে স্থানীয় সরকারের বিষয়ে জোরালো সমর্থন ব্যক্ত হয়েছে। যদিও সংবিধানে এই সরকারের কাঠামো সুনির্দিষ্ট করা হয় নাই; কিন্তু এই সরকারের বিষয়ে কতগুলো স্পষ্ট নির্দেশনা তাতে দেয়া আছে। যেমন, এগুলো গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত হতে হবে, এবং এগুলোর এখতিয়ার বেশ সম্প্রসারিত চরিত্রের হবে। সংবিধান সংসদকে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়নের এখতিয়ার দিয়েছে। সংবিধানের এই সমর্থনকে ভিত্তি করে গ্রাম পর্যায়ে গণতান্ত্রিক প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়ে তোলার কাজ সহজেই অগ্রসর হতে পারে।[৮৩]

দ্বিতীয়ত, স্বাধীনতার পর প্রায় সব সরকারই গ্রাম পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়ার কোনো-না-কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। উপরে আমরা তা উল্লেখ করেছি। তবে নীচের সারণী-১ তা এক-নজরে দেখতে সহায়তা করে। এই সারণী থেকে আমরা ধারণা করতে পারি যে, গ্রাম প্রর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়ার বিষয়ে দেশে একটি সাধারণ ঐক্যমত্য আছে। এটাও একটি ইতিবাচক দিক।

সারণী-১: স্বাধীনতার পর গ্রাম পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়ার বিভিন্ন উদ্যোগ

সন	উদ্যোগ গ্রহকারী সরকার	উদ্যোগ
১৯৭৫	বঙ্গবন্ধু	সমবায়ী গ্রাম
১৯৮০	জিয়াউর রহমান	স্বনির্ভর গ্রাম সরকার
১৯৮৯	হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ	পল্লী পরিষদ আইন
১৯৯১	খালেদা জিয়া	গ্রাম সভা গঠনের সুপারিশ
১৯৯৭	শেখ হাসিনা	গ্রাম পরিষদ আইন
২০০৩	খালেদা জিয়া	গ্রাম সরকার আইন

কিন্তু সমস্যা দেখা দেয় যখন "সাধারণ" থেকে "সুনির্দিষ্ট"তে যাওয়ার চেষ্টা করা হয়। প্রচলিত আছে যে, "ডেভিল লাইস ইন ডিটেইলস!" অর্থাৎ, মোটা দাগের প্রস্তাবে নয়, প্রস্তাবের বিস্তারিতকরণেই সমস্যা লুক্কায়িত থাকে। বলা নিষ্প্রয়োজন, বঙ্গবন্ধু তাঁর সমবায়ী গ্রামের বিস্তারিত রূপরেখা প্রণয়নের সুযোগ পান নি। সমবায়ী গ্রাম সম্পর্কে তিনি মোটা দাগে কতগুলো ধারণা দিয়েছিলেন, যা থেকে এবং সাধারণভাবে বঙ্গবন্ধুর সে সময়ের চিন্তাধারা থেকে আমরা কিছু অনুমান করতে পারি। পরবর্তী উদ্যোগগুলোর মধ্যে তিনটির ক্ষেত্রে বিস্তারিত আইন, আদেশ, বা নীতিমালা প্রস্তাবিত বা প্রণীত হয়েছিল। এগুলো হলো জিয়াউর রহমানের "স্বনির্ভর গ্রাম সরকার" বিষয়ক নিয়মাবলী (রুলস), শেখ হাসিনা সরকার প্রণীত ১৯৯৭ সনের "স্থানীয় সরকার (গ্রাম পরিষদ) আইন," এবং খালেদা জিয়া সরকার কর্তৃক প্রণীত ২০০৩ সনের "গ্রাম সরকার আইন"। আমাদের আলোচনার জন্য বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক হওয়ায় এই তিনটি দলিল পরিশিষ্ট আকারে এই পুস্তকে সংযোজিত হলো, যাতে পাঠকেরা নিজেরাই এগুলো পড়তে এবং বিচার-বিশ্লেষণ করতে পারেন। গ্রাম সম্পর্কে এই চারটি প্রস্তাবের একটা তুলনা নীচের সারণী-২ তে পরিবেশিত হয়েছে।

সারণী-২-এর তুলনা থেকে দেখা যায়, প্রস্তাবগুলোর মধ্যে মিল-অমিল দুই-ই আছে। যেমন, গ্রাম পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর নাম নিয়ে ভিন্নতা আছে। এ যাবত বাংলাদেশে গ্রাম পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো যেসব নামে প্রস্তাবিত এবং আংশিক বা পূর্ণভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে সেগুলোর মধ্যে রয়েছে "গ্রাম পঞ্চায়েত," "গ্রাম সরকার," এবং "গ্রাম পরিষদ।" বাংলাদেশের গ্রামের ভবিষ্যত প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর নাম হিসেবে তিনটির যেকোনোটিই গ্রহণ করা যেতে পারে, কেননা নামের চেয়ে ভেতরের সারবত্তা বেশি গুরুত্বপূর্ণ।[৮৪] এই বইতে আমরা "গ্রাম পরিষদ" নামটি ব্যবহার করেছি মূলত স্থানীয় সরকারের অন্যান্য ধাপের নামের সঙ্গে সাযুজ্য রাখার উদ্দেশ্যে। দীর্ঘ বিবর্তনের মধ্য দিয়ে "জেলা পরিষদ", "উপজেলা পরিষদ," এবং "ইউনিয়ন পরিষদ" বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার কাঠামোর মোটামুটিভাবে স্বীকৃত উপাদানে পরিণত হয়েছে। সুতরাং, এর সঙ্গে সংগতি রেখে গ্রাম পর্যায়ের প্রশাসনিক কাঠামোকে "গ্রাম পরিষদ" বলা যেতে পারে। তবে অন্যান্য বিষয়ের মতো নাম নিয়ে আরও আলোচনা হতে পারে।

বাংলাদেশের গ্রামের ভবিষ্যত প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর বিস্তারিত রূপরেখা প্রণয়নে কয়েকটি পরস্পর সম্পর্কিত বিষয় হলোঃ (ক) গ্রাম কর্তৃপক্ষ স্থানীয় সরকার কাঠামোর একটি স্বতন্ত্র ধাপ বলে বিবেচিত হবে কিনা; (খ) গ্রামের সীমা কীভাবে নির্ধারিত হবে; (গ) ইউনিয়ন পরিষদের সঙ্গে গ্রাম কর্তৃপক্ষের সম্পর্ক কী হবে, এবং (ঘ) গ্রাম কর্তৃপক্ষ কীভাবে গঠিত হবে।

লক্ষণীয়, বঙ্গবন্ধুর "সমবায়ী গ্রাম" প্রস্তাব এবং জিয়াউর রহমানের "স্বনির্ভর গ্রাম" প্রস্তাবে গ্রামকে একটি "অর্থনৈতিক একক" হিসেবে দেখার বিষয়টি প্রাধাণ্য পেয়েছিল। স্থানীয় সরকারের প্রাথমিক ধাপের ভূমিকাটি তাঁদের প্রস্তাবে ততোটা গুরুত্ব পায় নি। সে কারণে তাঁদের প্রস্তাবে ইউনিয়ন পরিষদের সঙ্গে গ্রাম কর্তৃপক্ষের আন্ত-সম্পর্কের বিষয়টি ততোটা স্থান পায় নি। জিয়াউর রহমানের "স্বনির্ভর গ্রাম সরকার" বিধিমালায় "ইউনিয়ন পরিষদে"র বিশেষ উল্লেখ নেই। আর বঙ্গবন্ধু "ইউনিয়ন পরিষদের টাউটদের বিদায়" করে দেয়ার কথা বলেছিলেন।

পক্ষান্তরে ১৯৯৭ সনের "স্থানীয় সরকার (গ্রাম পরিষদ) আইন" এবং ২০০৩ সনের "গ্রাম সরকার আইনে" অর্থনৈতিক একক হিসেবে গ্রামের ভূমিকা ততোটা প্রাধাণ্য পায় নি। বরং স্থানীয় সরকারের প্রাথমিক ধাপ হিসেবে গ্রাম কর্তৃপক্ষের স্থান ও ভূমিকার উপর জোর দেয়া হয়েছিল। সেজন্যেই দেখা যায়,

সারণী-২। গ্রাম পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো বিষয়ক বিভিন্ন প্রস্তাবের তুলনা

বিষয়	সমবায়ী গ্রাম ১৯৭৫	স্বনির্ভর গ্রাম সরকার, ১৯৮০	গ্রাম পরিষদ আইন, ১৯৯৭	গ্রাম সরকার আইন, ২০০৩
প্রতিষ্ঠানের নাম	সমবায়ী গ্রাম	স্বনির্ভর গ্রাম সরকার	গ্রাম পরিষদ	গ্রাম সরকার (স্থানীয় সরকারের পৃথক ধাপ নয়, বরং ইউনিয়ন পরিষদের সহায়ক সংগঠন)
গ্রামের সীমানা	আত্ম-পরিচয় ভিত্তিক অনুমান	(সার্কেল অফিসারের অনুমোদনক্রমে)	ইউনিয়ন পরিষদের ওয়ার্ড ভিত্তিক	ইউনিয়ন পরিষদের ওয়ার্ড ভিত্তিক
ভিত্তি প্রতিষ্ঠান	গ্রামের সকল প্রাপ্ত বয়স্কদের নিয়ে গঠিত সভা	গ্রাম সভা (স্থানীয় ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত সকলকে নিয়ে গঠিত)	সাধারণ সভা (ওয়ার্ডের ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত সকলকে নিয়ে)	সাধারণ সভা (ওয়ার্ডের ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত সকলকে নিয়ে)
গঠন	বিধৃত হয় নি	একজন "গ্রাম প্রধান" এবং এগারো জন সদস্য, যাদের মধ্যে কমপক্ষে দু'জন নারী, এবং গ্রামে বসবাসকারী বিভিন্ন পেশা ও গ্রুপের প্রতিনিধির অন্তর্ভুক্তিসম্পন	একজন চেয়ারম্যান, নয়জন পুরুষ এবং তিনজন মহিলা সদস্য	একজন গ্রাম সরকার প্রধান, একজন উপদেষ্টা, এবং তেরজন সদস্য, যাদের মধ্যে থাকবেন একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি, একজন গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদস্যসহ তিনজন মহিলা, একজন গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর পুরুষ সদস্য; দুইজন ভূমিহীন কৃষক, এবং একজন করে কৃষক, সমবায় সমিতির সদস্য, মুক্তিযোদ্ধা, শিক্ষক, ব্যবসায়ী, চিকিৎসক বা পেশাজীবী
গঠনের পদ্ধতি	গ্রামের সকল প্রাপ্তবয়স্কদের সিদ্ধান্তক্রমে (অনুমান)	গ্রাম সভা দ্বারা, সর্বসম্মতিক্রমে	সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য গ্রাম পরিষদের চেয়ারম্যান হবেন; সদস্যরা গ্রামের সাধারণ সভায় পরিচালনাকারীর তত্ত্বাবধানে নির্বাচিত হবেন।	ওয়ার্ডের জন্য ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য গ্রাম প্রধান হবেন; ইউনিয়ন পরিষদের সংরক্ষিত আসনের সদস্য তাঁর আঞ্চলিক নির্বাচনী এলাকাধীন সকল গ্রাম সরকারের উপদেষ্টা হবেন; বাকিরা সাধারণ সভায় "সমঝোতার ভিত্তিতে, পরিচালনা কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে ও সভাপতিত্বে, মনোনীত"
স্থায়ীত্বকাল	বিধৃত হয় নি	প্রথমে তিন বছর, পরে পাঁচ বছর	পাঁচ বছর	পাঁচ বছর
কার্যাবলী	গ্রামের যৌথচাষ পরিচালনা এবং এর সাথে সম্পর্কিত অন্যান্য সকল কাজ সম্পাদন	(ক) খাদ্য উতপাদন বৃদ্ধি; (খ) গণসাক্ষরতা অর্জন (গ) পরিবার পরিকল্পনা ও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ; (ঘ) আইন শৃংখলা রক্ষা ও স্থানীয় বিরোধ নিস্পত্তি; (ঙ) গ্রাম সমবায় ও সমবায় ব্যাংক উৎসাহকরণ	(ক) আর্থসামাজিক বিষয়ক জরীপ; (খ) জনমিতি বিষয়ক তথ্য; (গ) প্রাথমিক ও মাদ্রাসা-মক্তবের শিক্ষা (ঘ) প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশুদের অংশগ্রহণ; (ঙ) পরিবার পরিকল্পনা (চ) পানীয় জল ও পয়ঃনিষ্কাশন; (ছ) নারী নির্যাতন ও অপরাধ প্রতিরোধ; (জ) সার, বীজ ও কীটনাশক ঔষধ; (ঝ) সরকারি, আধাসরকারি ও বেসরকারি কর্মকর্তাদের তৎপরতা; (ঞ) গ্রাম্য বিবাদ-বিসংবাদ; (ট) আইন-শৃঙ্খলা; (ঠ) সমবায় সমিতি, ক্ষুদ্র শিল্প, হাঁস-মুরগির খামার, পশুপালন ও বৃক্ষরোপণ (ড) সার্বিক উন্নয়ন ও কল্যাণ ও (ঢ) অন্যান্য	(ক) অবকাঠামো উন্নয়ন; (খ) অপরাধ দমন; (গ) নিরক্ষরতা দূরীকরণ; (ঘ) প্রাথমিক শিক্ষা; (ঙ) পুষ্টি ও টীকা; (চ) পরিবার পরিকল্পনা; (ছ) পানীয় জল ও পয় নিষ্কাশন; (জ) জন্ম মৃত্যু, বিবাহ ইত্যাদি রেজিস্ট্রেশন; (ঝ) কৃষ উন্নয়ন; (ঞ) আইন শৃংখলা;(ট) ক্রীড়া ও সংস্কৃতি; (ঠ) সমবায় সমিতি; (ড) বৃক্ষরোপন ও পরিবেশ; (ঢ) মহিলা ও শিশু কল্যাণ (ণ) গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী
গ্রাম কর্তৃপক্ষের সভা	বিধৃত হয় নি	পাক্ষিক	প্রতি তিন মাসে অন্যূন একবার	অন্তত পক্ষে দুই মাস অন্তর
গ্রামের সভা	বিধৃত হয় নি	প্রতি তিন মাস অন্তর	বিধৃত হয় নি	অন্তত পক্ষে ছয় মাস অন্তর
সিদ্ধান্ত গ্রহণের পদ্ধতি	সংখ্যাগরিষ্ঠতা (অনুমান)	সংখ্যাগরিষ্ঠতা	পরিচালনাকারীর কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে	সংখ্যাগরিষ্ঠতা
আয়ের উৎস	(ক) যৌথচাষ দ্বারা উৎপাদিত ফসলের এক-তৃতীয়াংশ (খ) জাতীয় সরকার এবং উপরিস্থ অন্যান্য সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত বিভিন্ন অর্থ ও সম্পদ		ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত অর্থ	(ক) ইউনিয়ন পরিষদ থেকে প্রাপ্ত অর্থ, এবং (খ)অন্য কোন উৎস থেকে প্রাপ্ত অর্থ
তদারকী কর্তৃপক্ষ	বিধৃত হয় নি	সরকারী প্রশাসন	ইউনিয়ন পরিষদ	ইউনিয়ন পরিষদ এবং উপজেলা পরিষদ

এই দুই আইনে ইউনিয়ন পরিষদের সঙ্গে গ্রাম কর্তৃপক্ষের সম্পর্ক বিধৃত করার উপরই বেশি মনোযোগ দেয়া হয়েছে। বস্তুত গ্রামগুলোকে তাদের স্ব-পরিচয়ে আত্মপ্রকাশের সুযোগ দেয়ার পরিবর্তে ইউনিয়নের ওয়ার্ড হিসেবে আত্মস্থ করা হয়েছিল, এবং ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান কিংবা মেম্বারকেই গ্রাম কর্তৃপক্ষের প্রধান হিসেবে গণ্য করা হয়েছিল। এটা ঠিক যে, ২০০৩ সনের আইনে গ্রাম সরকারের কার্য তালিকা অনেক দীর্ঘ; কিন্তু এই সরকারের আয়ের উৎসের তালিকা খুবই হ্রস্ব। শুধুমাত্র ইউনিয়ন পরিষদ থেকে রেজিস্ট্রেশন বাবদ প্রাপ্ত আয় দিয়ে এত কাজ গ্রাম সরকার কীভাবে করতে সক্ষম হতো তা বলা কঠিন। আরেকটি যে বিষয়ে ২০০৩ সনের গ্রাম সরকার আইন ১৯৮০ সনের স্বনির্ভর গ্রাম সরকার বিধিমালার চেয়ে পশ্চাদধর্মী, তা হলো পূর্বোল্লিখিত গণতন্ত্রের বিষয়ে। গ্রাম সরকার গঠনে নির্বাচনের পরিবর্তে মনোনয়নের উপর নির্ভর করা হয়েছিল। সে কারণে আশ্চর্যের নয় যে, ২০০৩ সনের গ্রাম সরকার আইন বিভিন্ন মহলের সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছে, এবং এই আইনের অধীনে মনোনয়নের মাধ্যমে গ্রাম সরকার গঠনের অগণতান্ত্রিক পদ্ধতি উচ্চ আদালতের নিকট অসংবিধানিক বলে বিবেচিত হয়েছে।

উপরের আলোচনা থেকে কয়েকটি বিষয় বেড়িয়ে আসে। প্রথমত, গ্রামকে তার স্ব-পরিচয়ে আবির্ভূত হতে দিতে হবে, ওয়ার্ড হিসেবে নয়। গ্রামের সীমা-পরিসীমার বিষয়টি আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। সাধারণভাবে গ্রামের সীমা-পরিসীমা প্রথাগতভাবেই প্রতিষ্ঠিত। যদি এ বিষয়ে কোনো প্রশ্ন থাকে, তবে তা স্ব-পরিচয়ের ভিত্তিতে নিরসিত হতে পারে – সেটাও আমরা উপরে লক্ষ্য করেছি। লক্ষণীয়, ভৌগলিক ও সামাজিক একক হিসেবে গ্রামের আকারের মধ্যে ন্যূণতম সাদৃশ্য থাকা দরকার। সুতরাং, যদি প্রথাগত গ্রাম ভৌগলিকভাবে কিংবা জনসংখাগতভাবে বিসদৃশ হয়, তবে কিছু সামঞ্জস্য বিধানের প্রয়োজন হতে পারে। তবে মনে রাখা দরকার, শেষাবধি গৃহীত ভৌগলিক ও সামাজিক এককটি ওয়ার্ড নয়, গ্রাম।

দ্বিতীয়ত, গ্রাম পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানকে স্থানীয় সরকারের পৃথক ধাপ হিসেবে, বস্তুত সবচেয়ে মৌলিক ধাপ হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। এর সঙ্গে সম্পর্কিত প্রশ্ন হলো, গ্রাম পরিষদ গঠিত হলে আর ইউনিয়ন পরিষদের প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা। আমরা ইতিপূর্বে লক্ষ্য করেছি, বঙ্গবন্ধু "ইউনিয়ন পরিষদের টাউটদের বিদায়" করে দেয়ার কথা বলেছিলেন। তবে সূচনাতেই ইউনিয়ন পরিষদ বাতিল করার প্রয়োজন আছে কিনা তা ভাবার বিষয়। ইউনিয়ন পরিষদ

রেখেই গ্রাম পরিষদ গঠন করে যেতে পারে, এবং গ্রাম পরিষদ এবং ইউনিয়ন পরিষদ পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে কাজ করতে পারে।

তৃতীয়ত, গ্রাম পরিষদের গঠন এবং কার্য সম্পাদনের ধারা অবশ্যই গণতান্ত্রিক হতে হবে। নিঃসন্দেহে, এই গণতন্ত্র চর্চার ক্ষেত্রে অনেক সমস্যা ও বাধার উদ্রেক হবে। গ্রাম পরিষদসমূহ স্থানীয় প্রভাবশালীদের করায়ত্ত (ইংরাজীতে যাকে "এলিট-ক্যাপচার" বলা হয়) হয়ে যেতে পারে। কিন্তু গ্রাম পর্যায়েই সাধারণ মানুষের গণতন্ত্র চর্চার সবচেয়ে সহজলভ্য সুযোগ। তাদেরকে এ সুযোগ ব্যবহারের সুযোগ দিতে হবে। এতে অনেক ভুল ভ্রান্তি হবে; কিন্তু তার মধ্য দিয়েই গণতন্ত্র চর্চা ধীরে ধীরে আরও পরিণত রূপ পাবে।

চতুর্থত, গ্রামকে অর্থনৈতিক একক হিসেবে দেখতে হবে, এবং এই এককের সম্ভাবনা বাস্তবায়নকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ করণীয় হিসেবে গ্রাম কর্তৃপক্ষকে গ্রহণ করতে হবে। উপরে আমরা উল্লেখ করেছি যে, গ্রাম কর্তৃপক্ষের দ্বৈত ভূমিকা থাকবে। স্থানীয় সরকারের প্রাথমিক ধাপের ভূমিকা পালনের পাশাপাশি তা সমবায়ী গ্রামের পরিচালনা পরিষদ হিসেবেও কাজ করবে।

বলাবাহুল্য, এই বিষয়গুলো নিয়ে আরও আলোচনা প্রয়োজন। বিশেষত অর্থনৈতিক একক হিসবে গ্রামের সম্ভাবনা বাস্তবায়নের কাজটি গ্রাম কর্তৃপক্ষ কীভাবে সুচারুভাবে সম্পন্ন করতে পারে, তা আরও স্পষ্ট করা দরকার। এটা উৎসাহজনক যে, ১৯৮০ সনের স্বনির্ভর গ্রাম সরকার বিধিমালা, ১৯৯৭ সনের গ্রাম পরিষদ আইন এবং ২০০৩ সনের গ্রাম সরকার আইন সবকটিতেই গ্রাম সরকারের করণীয়র মধ্যে সমবায় প্রতিষ্ঠা, পরিচালনা, এবং উৎসাহদানকে অন্তর্ভুক্ত করেছে। সুতরাং এ বিষয়েও আপাতদৃষ্টিতে একটি ঐক্যমত্য লক্ষ্য করা যেতে পারে। কিন্তু বঙ্গবন্ধুর সমবায়ী গ্রাম এবং উপর্যুক্ত তিনটি উদ্যোগ – কোনটিই বাংলাদেশে বাস্তবায়িত হওয়ার সুযোগ পায় নি। ফলে, এ বিষয়ে অধুনাকালের কোনো বাস্তব অভিজ্ঞতা বাংলাদেশের নেই। সুতরাং, এ প্রেক্ষিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য পৃথিবীর অন্যান্য কিছু প্রাসঙ্গিক দেশের অভিজ্ঞতা লক্ষ্য করা যেতে পারে। বিশেষত, প্রতিবেশী ভারত এবং চীনের এ বিষয়ক অভিজ্ঞতা আমাদের জন্য বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক। পরবর্তী অনুচ্ছেদে আমরা সেদিকেই নজর দেবো।

১৭. গ্রামের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো সম্পর্কে অন্যান্য দেশের অভিজ্ঞতা

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশেই গ্রাম ভিত্তিক প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো চালু আছে। এসব দেশের অভিজ্ঞতা থেকে নিশ্চয়ই শিক্ষণীয় আছে। তবে এদের মধ্যে কয়েকটি দেশের অভিজ্ঞতা বাংলাদেশের জন্য বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক। তারমধ্যে রয়েছে ভারত এবং চীন। ভারতের অভিজ্ঞতা প্রাসঙ্গিক কারণ বাংলাদেশ এবং ভারত দীর্ঘকাল একই ইতিহাসের ভাগীদার ছিল। বৃটিশ আমলে যে স্থানীয় সরকার কাঠামো প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তার উত্তরাধিকার বাংলাদেশ ও ভারত উভয়ই বহন করছে। সে কারণে গ্রাম পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো সম্পর্কে ভারতের অভিজ্ঞতাটি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। উপমহাদেশের অন্য দুটি দেশ, শ্রীলংকা এবং নেপালের অভিজ্ঞতাও প্রাসঙ্গিক এবং তা ভারতের অনুরূপ।[৮৫] অন্যদিকে চীনের অভিজ্ঞতা বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক কারণ চীনে গ্রাম পর্যায়ে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানকে একই সঙ্গে উৎপাদন সংগঠকের ভূমিকা পালন করতে হতো। অনেক পরিবর্তন সত্ত্বেও সে ভূমিকার কিছু রেশ এখনও বিরাজমান। আগেই উল্লিখিত হয়েছে, গ্রাম সংক্রান্ত বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য গ্রাম পরিষদকে সমবায়ী গ্রামের পরিচালনা পরিষদ হিসেবেও কাজ করতে হবে। এই করণীয়র আলোকে চীনের অভিজ্ঞতা বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক।

১৭.১ ভারতের অভিজ্ঞতা

ভারতের অতীত ঐতিহ্যের ভিত্তিতে মহাত্মা গান্ধী "গ্রাম স্বরাজ"-এর স্বপ্ন দেখেছিলেন। ১৯৫০ সনে গৃহীত ভারতের সংবিধানের ৪০-তম ধারায় উল্লিখিত হয় যে, "রাজ্যসমূহ গ্রাম পঞ্চায়েত গঠন করবে এবং তাদেরকে স্বশাসনের জন্য প্রয়োজনীয় ক্ষমতা এবং কর্তৃত্ব প্রদান করবে।" "গ্রাম সভা"-কে পঞ্চায়েত ব্যবস্থার প্রাণ বলে গণ্য করা হয়। ১৯৫৯ সনে নেহেরু রাজস্থান রাজ্যে তিন ধাপ সম্পন্ন (গ্রাম – অঞ্চল/ব্লক – জেলা) পঞ্চায়েত ব্যবস্থার উদ্বোধন করেন। তিন ধাপ বিশিষ্ট এই পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকে "পঞ্চায়েত রাজ" বলে অভিহিত করা হয়।[৮৬]

এই উদ্যোগ সত্ত্বেও সে পর্যায়ে পঞ্চায়েতসমূহ তেমন ক্ষমতা বা অর্থ কোনটাই পায় না। ফলে পরবর্তীতে এই ব্যবস্থার অবক্ষয় ঘটে। ১৯৭৮ সনের আশোক মেহতা কমিটি পঞ্চায়েত রাজকে সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব করে। রাজীব গান্ধী পঞ্চায়েত ব্যবস্থা সম্পর্কে বিশেষ উৎসাহ দেখান এবং একে

তাঁর "জনগণের নিকট ক্ষমতা" স্বপ্ন বাস্তবায়নের মাধ্যম হিসেবে গণ্য করেন। ১৯৮৯ সনে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ভারতের সংবিধান সংশোধনের উদ্যোগ নেয়া হয়। কিন্তু সরকারের পতন ঘটার কারণে তা সম্ভব হয় না। পরবর্তী নরসীমা রাও সরকারের আমলে ১৯৯৩ সনে সংবিধানের ৭৩ তম সংশোধনী (১৯৯২) গৃহীত হয়। এই সংশোধনী মোতাবেক সংবিধানে "পঞ্চায়েত" শিরোনামে নতুন অধ্যায় যোগ হয়। তবে সাংবিধানিক এই স্বীকৃতি সত্ত্বেও পঞ্চায়েত রাজ্য সরকারের বিষয় থেকে যায়। ফলে রাজ্য সরকারের উদ্যোগের উপর এ বিষয়ক অগ্রগতি নির্ভর করে।

২০০৪ সনে পঞ্চায়েত রাজ বিষয়ক একটি পৃথক কেন্দ্রীয় মন্ত্রণালয় গঠিত হয়, এবং পঞ্চায়েত এজেন্ডা বেশ মনোযোগ আকর্ষণ করে। এই এজেন্ডার তিনটি মূল দিক – ক্ষমতায়ন, সক্ষমায়ন, এবং জবাবদিহি। আর রয়েছে তিন-এফ (ফান্ড, ফাঙ্কশান, এবং ফাঙ্কশানরিজ) এবং নিচ থেকে পরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্যোগ। বিগত বছরগুলো প্রচেষ্টার ফলে এখন ভারতে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা বেশ সুসংহত হয়েছে। ২.৪ লক্ষ পঞ্চায়েত আছে। মোট প্রতিনিধি সংখ্যা ২৮ লক্ষ, যার ৩০ শতাংশের বেশি মহিলা, ১৯ শতাংশ শিডিউল কাস্ট, ১২ শতাংশ শিডিউল ট্রাইব ও অন্যান্য পশ্চাদপদ কাস্ট (বেশিরভাগ রাজ্যে)। ২০০৯ সনে পঞ্চায়েত রাজের পঞ্চাশ বছর পূর্তি পালিত হয়। ইতিমধ্যে ই-*পঞ্চায়েত* প্রকল্প অগ্রসর হয়েছে। প্রায় ৫০,০০০ গ্রাম পঞ্চায়েতের দৈনিক আয়-ব্যয়ের হিসাব এখন ইন্টারনেটে পাওয়া যায়। ২০১১ জুনের মধ্যে সকল গ্রাম পঞ্চায়েতের জন্যই তা প্রযোজ্য হওয়ার কথা। ওমবাডসম্যান, সামাজিক হিসাব-পরীক্ষা, আদর্শ হিসাব ব্যবস্থা, ইত্যাদির প্রবর্তন পঞ্চায়েতের হিসাবরক্ষণকে একটি নতুন পর্যায়ে নিয়ে যাচ্ছে। পঞ্চায়েতের কাজের মূল্যায়নের ইন্টারনেটে প্রচার ভাল কাজকে উৎসাহিত করছে এবং মন্দ কাজকে নিরুৎসাহিত করছে।

ভারতের ত্রয়োদশ অর্থযোজনা কমিশন পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় বড় পরিবর্তন এনেছে। এর আগ পর্যন্ত পঞ্চায়েতগুলো কেবল থোক-বরাদ্দ পেতো। এ কমিশন পঞ্চায়েতসমূহকে আদায়কৃত করের অংশীদারী করে দিয়েছে। এছাড়া ভাল কাজের জন্য "সম্পাদনা" (পারফরমেন্স) বরাদ্দের ব্যবস্থা করেছে। তদুপরি কিছু রাজ্য পঞ্চায়েতসমূহকে পাঁচটি মন্ত্রণালয়র ফান্ড, ফাঙ্কসানস্ এবং ফাঙ্কশানারীর অংশীদারী করে দিয়েছে। এগুলো হলো কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সমাজ-কল্যাণ, মহিলা ও শিশু। "মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ নিয়োজন নিশ্চিত

আইন" এবং "পশ্চাদপদ এলাকার অনুদান তহবিল" বাস্তবায়নে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ভারতের উন্নয়নের জন্য পঞ্চায়েত ব্যবস্থা সহায়ক বলে প্রমাণিত হচ্ছে। লক্ষণীয়, দক্ষিণ এবং পশ্চিম ভারতের অপেক্ষাকৃত উন্নত রাজ্যসমূহে পঞ্চায়েত ব্যবস্থাও অধিকতর শক্তিশালী।

উপরে উল্লিখিত হয়েছে, পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকে রাজ্য সরকারের অন্তর্ভুক্ত করার ফলে রাজ্য ভেদে এ বিষয়ে অগ্রগতির তারতম্য দেখা দেয়। পঞ্চায়েতের প্রতি গুরুত্ব প্রদান এবং এর সম্ভাবনা বাস্তবায়নের প্রয়াসে পশ্চিম বঙ্গ আগে থেকেই এগিয়ে ছিল। ১৯৭৩ সনের "পশ্চিম বঙ্গীয় পঞ্চায়েত আইন" পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় নতুন প্রাণ সঞ্চার করে। তিন ধাপের প্রতিটিতে নিয়মিত সময়ে ব্যতিক্রমহীনভাবে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের বিধান করা হয়। কর এবং কর-বহির্ভূত আয়ের উৎস এবং পঞ্চায়েতের কর্মপরিধি পরিষ্কার করা হয়। এই আইন পঞ্চায়েত ব্যবস্থা বিকশিত হওয়ার নতুন সুযোগ সৃষ্টি করে। আগেই উল্লিখিত হয়েছে, ১৯৭৭ সনে বাম ফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার পর অপারেশন বর্গা ও খাস জমি বিতরণ কর্মসূচি বাস্তবায়নে পঞ্চায়েত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।[৮৭]

ভারতের অভিজ্ঞতা দেখায় যে, গ্রাম ভিত্তিক আনুষ্ঠানিক প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গঠিত হলে স্বতস্ফূর্তভাবে বিভিন্ন শুভ উদ্যোগের সূচনা হতে পারে। সে দেশের স্বনামখ্যাত সমাজকর্মী আন্না হাজারি দেখিয়েছেন, উপযুক্ত নেতৃত্বে গ্রাম ভিত্তিক প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর মাধ্যমে বিপুল পরিবর্তন আনায়ন সম্ভব। আন্না হাজারি "রালেগান সিদ্ধি" নামক তাঁর মহারাষ্ট্র রাজ্যের গ্রামে ফিরে যেয়ে "অর্থদান" ও "শ্রমদান" প্রথার সূচনা করেছেন; গ্রামের তরুণদের নিয়োজিত করার জন্য "তরুন-মন্ডল" গঠন করেছেন। এসব প্রথা ও সংগঠন ব্যবহার করে গ্রামে একের পর এক ইতিবাচক পরিবর্তন নিয়ে এসেছেন। গ্রামে শস্য ব্যাংক স্থাপন করেছেন; গ্রামের পানিসম্পদের উন্নয়ন ও সাশ্রয়ের মাধ্যমে পানি সংকট দূর করেছেন; গ্রামে দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধি করেছেন; গ্রামে সাক্ষরতা ও শিক্ষার প্রভূত উন্নতি সাধন করেছেন; গ্রামে প্রাক-বিদ্যালয় ও উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছেন; গ্রাম থেকে অস্পৃশ্যতা দূর করেছেন; বিবাহের ব্যয়ভার কমানোর উদ্দেশ্যে অনেক দম্পতির একসঙ্গে বিবাহ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন; সর্বোপরি মহারাষ্ট্র রাজ্য কর্তৃক "গ্রাম সভা" আইন পাশ করিয়েছেন। শেষোক্ত আইন অনুযায়ী এখন সরকার কর্তৃক গ্রামে বাস্তবায়িত যে কোন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের সকল ব্যয়ের হিসাব গ্রামের সকল প্রাপ্ত বয়স্কদের উপস্থিতি সম্পন্ন গ্রাম সভা কর্তৃক অনুমোদিত হতে হয়। (অর্থাৎ, শুধুমাত্র নির্বাচিত গ্রাম পঞ্চায়েত

সদস্যদের অনুমোদনই যথেষ্ট নয়।) এই উদাহরণ থেকে স্পষ্ট যে, গ্রাম ভিত্তিক প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো বিপুল সম্ভাবনার অধিকারী।

এই আলোচনা থেকে পরিষ্কার যে, গ্রাম পঞ্চায়েতের অতীত ঐতিহ্যকে ভারত বেশ উদ্যমের সঙ্গে ব্যবহার করেছে। পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকে শুধু যে সাংবিধানিক স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে, তাই নয়; পঞ্চায়েতসমূহকে "কর" সূত্রের আয়েরও অধিকারী করেছে। পঞ্চায়েত ব্যবস্থা তিন ধাপের হলেও গ্রাম পঞ্চায়েতেই মূল। আবার গ্রাম পঞ্চায়েতের কার্য-প্রণালীতে গ্রাম সভা মূল ভূমিকা পালন করে। গ্রাম পর্যায়ে বাস্তবায়িত উন্নয়ন প্রকল্প বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং প্রকল্প ব্যয়ের নিরীক্ষণে গ্রাম পঞ্চায়েতের ভূমিকা নিশ্চিত করা হয়েছে। পঞ্চায়েতের নিজস্ব আয় ব্যয় এবং কার্যাবলীর সততা এবং স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এসবে ইন্টারনেটের ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এর ফলে গ্রাম পঞ্চায়েতের অভিজ্ঞতা দ্রুত বিস্তৃত হতে পারছে। সাংবিধানিক স্বীকৃতি এবং কেন্দ্রীয় সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা গ্রাম পঞ্চায়েতের জন্য বিপুল সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছে। বিভিন্ন রাজ্য, অঞ্চল, এমনকি ব্যক্তি নিজস্ব উদ্যোগের মাধ্যমে এই সম্ভাবনা বাস্তবায়নের অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত রাখছেন। ভারতের গ্রাম পঞ্চায়েতের উৎপাদন সংগঠকের ভূমিকা পালনের কোনো বাধ্যবধাকতা নেই। তা সত্ত্বেও আনা হাজারি গ্রাম পঞ্চায়েতকে সে ভূমিকা গ্রহণ এবং সাফল্যের সঙ্গে পালনের দৃষ্টান্ত রেখেছেন।

১৭.২ চীনের অভিজ্ঞতা

ভারতের তুলনায় চীনে গ্রাম পর্যায়ের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর মূল পার্থক্য হলো, চীনে এসব কাঠামোর উৎপাদন সংগঠকের ভূমিকা পালনের বাধ্যবাধকতা ছিল। আগেই উল্লিখিত হয়েছে, চীনে বিপ্লবের পর পুনর্বিতরণমূলক ভূমি সংস্কার সাধিত হয়, এবং ক্ষুদে কৃষক উৎপাদন ব্যবস্থা কায়েম হয়। সে অবস্থায় গ্রাম পর্যায়ের প্রশাসনিক কাঠামোকে উৎপাদন সংগঠকের ভূমিকা পালন করতে হয় না। কিন্তু ১৯৫৭ সনে মাও জেদং "বৃহৎ উল্লম্ফন" কর্মসূচি গ্রহণ করেন। গ্রামে যৌথচাষ ভিত্তিক কমিউন গড়ে তোলা হয়, এবং গ্রামগুলো ব্রিগেড হিসেবে এসব কমিউনের অন্তর্ভুক্ত হয়। বলাবাহুল্য যে, কমিউনের অধীনে গ্রাম তথা বিগ্রেডকে প্রত্যক্ষভাবে সকল উৎপাদন সংগঠকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হয়। কিন্তু যৌথচাষ ভিত্তিক কমিউন ব্যবস্থা শেষাবধি সফল হয় না, এবং চীন এখন পরিবার-ভিত্তিক কৃষিতে প্রত্যাবর্তন করেছে। ব্রিগেডের পরিবর্তে চীনে গ্রাম

পর্যায়ের প্রশাসনিক কাঠামোকে এখন "গ্রাম সরকার" (ভিলেজ গভর্ণমেন্ট) বলে আখ্যায়িত করা হচ্ছে। বলাবাহুল্য, এসব গ্রাম সরকারকে এখন আর প্রত্যক্ষভাবে উৎপাদন সংগঠকের ভূমিকা পালন করতে হচ্ছে না।[৮৮]

তা সত্ত্বেও চীনে গ্রাম সরকারের ভূমিকা ভারতের গ্রাম পঞ্চায়েতের চেয়ে আরও অগ্রসর চরিত্রের। এর কারণ হলো চীনের উপর্যুক্ত ইতিহাস। যৌথচাষের পরিবর্তে পরিবার-ভিত্তিক কৃষি চালু হলেও জমির উপর যৌথ মালিকানা বাতিল হয়ে যায় নি। কৃষকেরা এখনও জমির দীর্ঘ মেয়াদী লীজ পেয়ে থাকে – মালিকানা নয়। কৃষক পরিবারদের মধ্যে জমির (লীজ) বিতরণের মতো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা এখনও চীনের গ্রাম সরকারকে পালন করতে হয়। কাজেই প্রত্যক্ষ উৎপাদক ভূমিকার অবসান হলেও চীনে গ্রাম সরকারের ভূমিকা (ভারতের তুলনায়) মৌলিকভাবে আরও অগ্রসর পর্যায়ের।

সে কারণেই চীনের সরকার সে দেশের গ্রাম সরকারের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিচ্ছে। গ্রাম সরকারকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে ১৯৯৮ সনের ৪ঠা নভেম্বর চীনের পার্লামেন্ট (ন্যাশনাল পিপলস কংগ্রেস)-এর স্থায়ী (স্ট্যান্ডিং) কমিটির পঞ্চম বৈঠকে "গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের গ্রাম সরকার বিষয়ক সুগ্রথিত আইন" গৃহীত হয় এবং একই দিনে তা এ বিষয়ে চীনের প্রেসিডেন্টের ৯ নং আদেশ হিসেবে জারি হয়। এই আইনের ৩০টি ধারা। এই আইন মোতাবেক গ্রামের আঠারো অথবা তার বেশি বয়সের সকলকে নিয়ে গ্রাম সভা গঠিত হবে এবং সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে গ্রাম সভার সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে। গ্রাম সভা গ্রামের স্বশাসন সম্পর্কিত নিয়ম কানুন নিজেরা প্রণয়ন করতে পারবে। গ্রাম সভায় গ্রাম নির্বাচন কমিটি কর্তৃক পরিচালিত নির্বাচনে প্রত্যক্ষ এবং গোপন ভোটে এবং প্রকাশ্য ভোট গণনার ভিত্তিতে তিন বছর মেয়াদের জন্য গ্রাম সভার সদস্যদের মধ্য থেকে "গ্রাম কমিটি" নির্বাচিত হবে। গ্রাম কমিটিকে স্বশাসনের মূল গণ-সংগঠন হিসেবে বিবেচনা করা হবে, এবং এই কমিটি গ্রাম সভার নিকট দায়বদ্ধ থাকবে এবং প্রতিবেদন পেশ করবে। গ্রাম কমিটি তিন থেকে সাত সদস্য বিশিষ্ট হবে। একজন চেয়ারম্যান, একজন ভাইস-চেয়ারম্যন, বাকীরা সদস্য হবেন। মহিলা এবং সংখ্যালঘু নৃতাত্ত্বিক গ্রুপ থেকে সদস্য রাখার বিধান আছে। চীনের গ্রামবাসীরা শুধু গ্রাম কমিটির সদস্যদের নির্বাচনের অধিকারী নন, তাঁরা এসব সদস্যদের প্রত্যাহার করতে পারবেন। নির্বাচকমন্ডলীর (তথা গ্রাম সভার সদস্যের মধ্যে) এক-পঞ্চমাংশ কাউকে প্রত্যাহারের প্রস্তাব করলে গ্রাম সভায় সঙ্গে সঙ্গে এসব প্রস্তাব ভোটে দেবে। গ্রাম কমিটি বিভিন্ন সুনির্দিষ্ট

উদ্দেশ্যে গ্রাম গ্রুপ গঠন করতে পারবে এবং প্রতি গ্রাম-গ্রুপ নিজেদের নেতা নির্বাচন করবে।

উপরের বিবরণ থেকে স্পষ্ট, ১৯৯৮ সনে গৃহীত চীনের গ্রাম সরকার আইন খুবই গণতান্ত্রিক। তবে বাস্তবে এই আইনের কতটুকু প্রয়োগ হয়েছে তা একটি প্রশ্নবিদ্ধ বিষয়। সাধারণভাবে ধারণা করা হয়, প্রথমাবস্থায় অবাধ নির্বাচনের মাধ্যমে গ্রাম কমিটি গঠনের বিষয়ে উৎসাহ থাকলেও পরবর্তীকালে চীনা নেতৃত্বের এই উৎসাহ হ্রাস পায়। বরং নিয়ন্ত্রিত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে গ্রাম কমিটি গঠনের প্রবণতাই প্রাধান্য পায়।

অবাধ নির্বাচন অথবা নিয়ন্ত্রিত পদ্ধতি, যেভাবেই চীনের গ্রাম কমিটি গঠিত হোক না কেন, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, চীনের গ্রাম সরকারের এখতিয়ার এক ভিন্ন মাত্রার। এর মূল কারণ আগেই উল্লিখিত হয়েছে – গ্রাম সদস্যদের মধ্যে লীজ হিসেবে জমি বিতরণের দায়িত্ব এখনও গ্রাম সরকারের উপর ন্যস্ত। এর মানে এই নয় যে, গ্রাম সরকারের এ সংক্রান্ত দায়িত্ব এবং অধিকার অবারিত। বরং জাতীয় ভিত্তিক নীতিমালা, প্রথাগত নিয়ম, এবং গ্রাম সভার সম্মতিক্রমেই গ্রাম কমিটি এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে।

বলাবাহুল্য, চীনের গ্রাম সরকারের অভিজ্ঞতা বাংলাদেশের জন্য বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক। সমবায়ী গ্রাম সংক্রান্ত বঙ্গবন্ধুর যে স্বপ্ন, তা বাস্তবায়নের জন্য যে গ্রাম পরিষদ গঠন করা দরকার, তার এখতিয়ার কিছুটা বিস্তৃত হওয়া দরকার। আগেই উল্লিখিত হয়েছে, গ্রাম পরিষদকে স্থানীয় সরকারের ভূমিকার পাশাপাশি সমবায়ী গ্রামের পরিচালনা পরিষদ হিসেবে কাজ করতে হবে। যেহেতু এই সমবায়ী গ্রাম যৌথচাষ ভিত্তিক হবে না, সেহেতু গ্রাম পরিষদকে মাইক্রো পর্যায়ে প্রত্যক্ষ উৎপাদন সংগঠকের ভূমিকা ততোটা পালন করতে হবে না। কিন্তু একই সঙ্গে গ্রাম পরিষদকে ম্যাক্রো, তথা গ্রামের পরিধিতে বিভিন্ন ভৌতিক ও সামাজিক অবকাঠামো নির্মাণ, উপযোগ সরবরাহ, এবং উৎপাদন কার্যক্রম সংগঠন এবং পরিচালনার উদ্যোগ নিতে হবে। বাংলাদেশের গ্রাম পরিষদের আইনকে এমন হতে হবে, যাতে তার পক্ষে উপর্যুক্ত উদ্যোগ গ্রহণের সুযোগ থাকে। এ বিষয়ে চীনের গ্রাম সরকার বিষয়ক আইন থেকে বাংলাদেশ উপকৃত হতে পারে। প্রশ্ন হলো, বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে এ ধরনের সমবায়ী গ্রাম এবং তার পরিচালনার মতো প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গঠনের সম্ভাবনা কতটুকু?

চিত্র ৩। চিত্রে ভারতের গ্রাম পঞ্চায়েত



(ক) পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলায় গ্রাম পঞ্চায়েতের অফিস



(খ) দক্ষিণ ভারতে গ্রাম পঞ্চায়েতের অফিস



(গ) পশ্চিম ভারতে গ্রাম সভায় বক্তৃতারত মহিলা



(ঘ) কিলমিনাই গ্রাম সভায় সরকারী কর্মকর্তার প্রতিবেদন পেশ

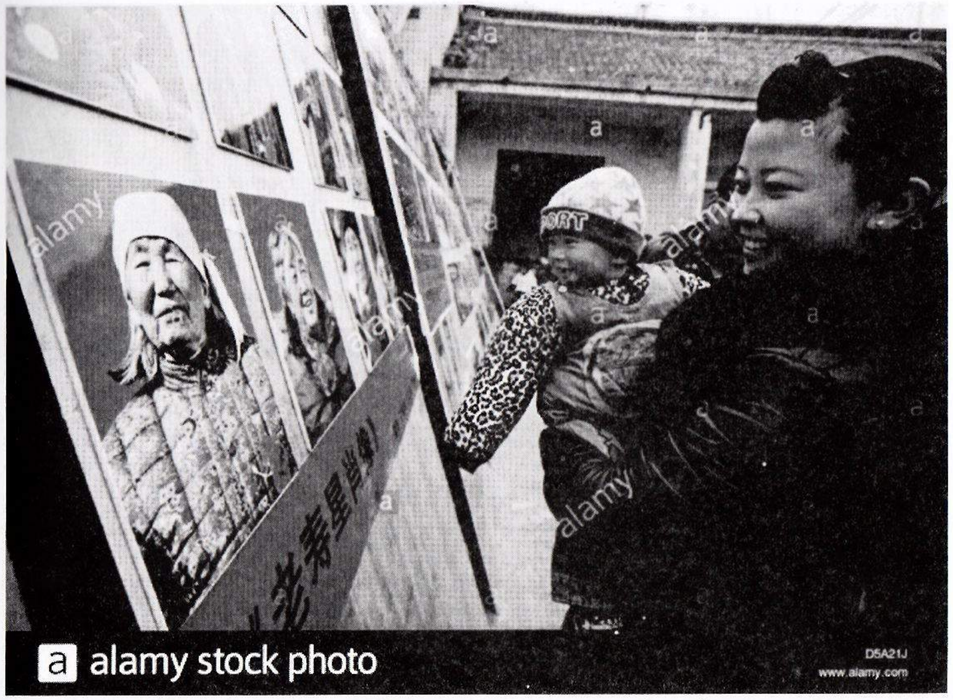
চিত্র ৪। চিত্রে চীনের গ্রাম সরকার



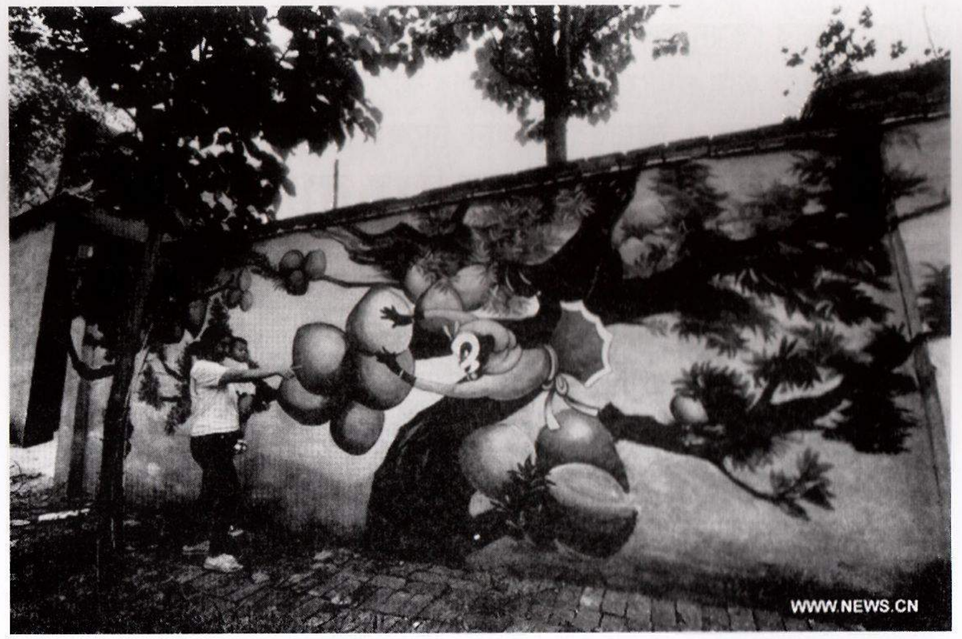
(ক) চীনের একটি গ্রাম সরকারের কার্যালয়



(খ) গুয়াংডংগ প্রদেশের উকান গ্রামে গ্রামবাসীদের ভোটের মাধ্যমে গ্রাম সরকার গঠন



(গ) হেনান প্রদেশের হুয়াশিয়ান গ্রাম সরকার কর্তৃক প্রবীণদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন উৎসবের আয়োজন



(ঘ) হেবেই প্রদেশের চিয়ানানবু গ্রাম সরকার কর্তৃক দেয়াল চিত্রের মাধ্যমে গ্রামের সৌন্দর্য বর্ধনের প্রয়াস

১৮. সমবায়ী গ্রামের রাজনৈতিক সম্ভাব্যতা

সমবায়ী গ্রাম প্রতিষ্ঠার দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলাদেশের বিদ্যমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি এক দিক থেকে অনুকূল এবং অন্যদিক থেকে প্রতিকূল। অনুকূল এ কারণে যে, আপাতদৃষ্টিতে সমবায়ী গ্রাম এবং গ্রাম পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়ে তোলার বিষয়ে বাংলাদেশের প্রায় সকল বড় রাজনৈতিক দলই কোনো-না-কোনো সময় এবং কোনো-না-কোনো ধরনের উদ্যোগ নিয়েছে। সেদিক থেকে এ বিষয়ে একটা ঐক্যমত্য আছে বলে ধারণা অথবা দাবি করা যেতে পারে।

বলা নিষ্প্রয়োজন, সমবায়ী গ্রাম সংক্রান্ত বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত কর্মসূচি সমাপ্ত করার মূল দায়িত্ব আওয়ামী লীগের উপরই বর্তায়। সে লক্ষ্যে গ্রাম পর্যায়ে একটি স্থানীয় সরকার কাঠামো বা ধাপ সৃষ্টির বিষয়ে এই দলেরই বেশি উৎসাহী হওয়ার কথা। এটা ঠিক যে, দীর্ঘ একুশ বছর পর ১৯৯৬ সনে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের সরকার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার স্বল্প সময়ের মধ্যে, ১৯৯৭ সনে "স্থানীয় সরকার (গ্রাম পরিষদ) আইন" প্রণীতও হয়। এই আইনটি গ্রাম বিষয়ক বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য কতোটুকু উপযোগী তা প্রশ্নের বিষয়। কিন্তু আরো কয়েকবার সরকার গঠন করা সত্ত্বেও আওয়ামী লীগ এ বিষয়ে আর তেমন অগ্রসর হয় নি।

অন্যদিকে গ্রাম পর্যায়ে স্থানীয় সরকার কাঠামো সৃষ্টির বিষয়ে বিএনপির-ও সম্মতি থাকার কথা। জিয়াউর রহমান নিজেই ১৯৮০ সনে "স্বনির্ভর গ্রাম সরকার" গঠন করেছিলেন; এবং খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে ১৯৯১ সনে বিএনপি সরকার গঠিত হওয়ার পর "গ্রাম সভা"র সুপারিশ প্রণীত হয়। দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় যাওয়ার পর ২০০৩ সনে "গ্রাম সরকার আইন" প্রণীত হয়।

যদিও এরশাদ ও জাতীয় পার্টির মূল মনোযোগ উপজেলার উপর নিবদ্ধ হয়েছিল, তা সত্ত্বেও এরশাদ নিজেকে পল্লীবন্ধু হিসেবে দাবি করেন, এবং সে কারণে সমবায়ী গ্রাম এবং গ্রাম পরিষদ গঠনের বিষয়ে তাঁর এবং জাতীয় পার্টিরও আগ্রহ থাকার কথা। সুতরাং, গ্রাম পর্যায়ে স্থানীয় সরকার কাঠামো সৃষ্টির বিষয়ে সবকটি বড় রাজনৈতিক দলেরই সমর্থন থাকার কথা।

বামপন্থী দলসমূহেরও সমবায়ী গ্রাম প্রতিষ্ঠা এবং সে লক্ষ্যে নির্বাচিত গ্রাম পরিষদ গঠনের বিষয়ে উৎসাহিত হওয়ার কথা। এটা ঠিক, এসব গ্রাম যৌথচাষ ভিত্তিক হবে না; এবং এসব গ্রামে আপাতত আমূল ভূমি সংস্কার সাধিত হওয়ার

সম্ভাবনাও কম। ফলে জমি মালিকানাগত এবং অন্যান্য বৈষম্য বজায় থাকবে।

কিন্তু তা সত্ত্বেও সমবায়ী গ্রামে জমি, জল, এবং অন্যান্য বস্তুগত সম্পদের সঙ্গে শ্রমজীবীদের সম্পৃক্তি প্রতিষ্ঠিত হবে এবং গ্রাম পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার সম্প্রসারিত হবে। এই দুই পরিবর্তনের ফলে গ্রামের শ্রমজীবী-দরিদ্র পরিবারসমূহের পরিস্থিতির একটি ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটবে, এবং তা ভবিষ্যতে আরও গভীর পরিবর্তনের জন্য অনুকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি করবে। সুতরাং শ্রমজীবীদের স্বার্থের প্রতি যেসব দল বিশেষভাবে অনুরাগী, তাদের সমবায়ী গ্রাম কর্মসূচির প্রতি বিশেষ আগ্রহী হওয়ার কথা।

কিন্তু অন্যদিক থেকে বাংলাদেশের বিদ্যমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি সমবায়ী গ্রাম প্রতিষ্ঠার দৃষ্টিকোণ থেকে প্রতিকূলও বটে। এর মূল কারণ, বিগত সময়কালে বাংলাদেশে ক্ষমতার রাজনীতি অত্যন্ত তিক্ত হয়ে গেছে। ফলে কর্মসূচির গুণাগুণ (মেরিট)-এর চেয়ে সে কর্মসূচি কোন দলের ক্ষমতালাভের জন্য বেশি সহায়ক, সেটাই মূল বিবেচ্য হয়ে পড়ে। যেমন, গ্রাম পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর নাম কী হবে, সেটাই হয়তো অনতিক্রম্য মতদ্বৈততা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে। সারণী-২ দেখায়, এই প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর গঠন (কম্পজিশন), গঠনের পদ্ধতি, করণীয়র পরিধি, ইত্যাদি বিষয়েও প্রচুর মতভেদের সুযোগ আছে। যে কথাটি আগেই উল্লিখিত হয়েছে, "ডেভিল লাইস ইন দি ডিটেইলস!" অর্থাৎ, মোটা দাগে একমত হওয়া তুলনামূলকভাবে সহজ। সমস্যা দেখা দেয় যখন সে বিষয়টি বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে বিস্তারিত করতে হয়। সবচেয়ে অনতিক্রম্য বাঁধা দেখা দেয় যখন "কে বাস্তবায়িত করবে?" অথবা "কার নেতৃত্বে বাস্তবায়িত হবে?" এ ধরনের প্রশ্নই বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

গ্রাম পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো এবং সমবায়ী গ্রাম প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে আরেক ধরনের বাঁধার সম্ভাব্য উৎস হলো ইউনিয়ন পরিষদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট স্বার্থসমূহ। আমরা দেখেছি, দীর্ঘকাল যাবত বাংলাদেশে গ্রাম পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর কোন অস্তিত্ব নেই। কেবলমাত্র জিয়াউর রহমানের আমলে কয়েকমাসের জন্য "স্বনির্ভর গ্রাম সরকার" বিরাজ করেছিল। পক্ষান্তরে, ইউনিয়ন পরিষদসমূহ রাজনৈতিক নানান উত্থান-পতনের মধ্যেও মোটামুটি বহাল থেকেছে। ফলে, ইউনিয়ন পরিষদগুলো ঘিরে একটা কায়েমী স্বার্থের উদ্ভব ঘটেছে। এই স্বার্থের প্রতিভূরা গ্রাম পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো সৃষ্টির প্রস্তাবে শংকিত বোধ করে। তারা ভাবে, গ্রাম পর্যায়ে প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠলে তাদের ক্ষমতা, আধিপত্য, এবং বস্তুগত সুবিধাদি চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন বা খর্ব হবে। ফলে

তাঁরা স্থানীয় সরকার কাঠামোকে গ্রাম পর্যায়ে বিস্তৃতকরণের বিরোধিতা করে। ১৯৯৭ সনের "স্থানীয় সরকার (গ্রাম পরিষদ) আইন" এবং ২০০৩ সনের "গ্রাম সরকার আইন" – উভয়ের মধ্যেই উপর্যুক্ত বিরোধীতার পরিফলন লক্ষ্য করা যায়। উভয় ক্ষেত্রেই ইউনিয়ন পরিষদকে তুষ্ট রাখার প্রয়াস পরিদৃষ্ট হয়। গ্রামগুলোকে ইউনিয়ন পরিষদের ওয়ার্ড হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান কিংবা মেম্বারকেই গ্রাম কর্তৃপক্ষের প্রধান হিসেবে মনোনীত করা, ইত্যাদির মধ্যে ইউনিয়ন পরিষদ সংশ্লিষ্ট স্বার্থের কাছে নতি স্বীকারের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়।

কায়েমী স্বার্থের প্রশ্ন ছাড়াও ইউনিয়ন পরিষদের উপস্থিতিতে স্থানীয় সরকারের আরেকটি ধাপ (তথা গ্রাম প্রর্যায়ে) প্রয়োজন আছে কিনা, সেটি একটি সংগত প্রশ্ন হতে পারে। এই প্রশ্নের উত্তর আমরা আগেই দিয়েছি। সমবায়ী গ্রামের বিভিন্ন সম্ভাবনা ও উপযোগিতার বিষয় নিয়ে উপরে (অনুচ্ছেদ ১২) আলোচনা করেছি। এসব সম্ভাবনা গ্রাম পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ছাড়া বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। আবহমানকাল ধরে এই দেশে গ্রাম মানুষের মৌল একক হিসেবে কাজ করেছে। এই মৌল একককে অসংগঠিত রেখে এবং তাকে ডিঙ্গিয়ে একলাফে ইউনিয়নে পৌঁছে যাওয়া সংগত নয়। গ্রামের এবং দেশের কল্যাণে গ্রামকে আগে সংগঠিত করা প্রয়োজন। গ্রাম কর্তৃপক্ষ মানুষের সবচেয়ে নাগালের মধ্যকার প্রতিষ্ঠান হবে। তাদের প্রাত্যহিক জীবনের সমস্যাবলি নিয়ে আলোচনা ও সমাধান প্রয়াসে এর বিকল্প নেই। তার মানে এই নয় যে, গ্রাম পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো সৃষ্টি করতে হলে ইউনিয়ন পরিষদকে বাতিল করতে হবে। প্রতিযোগী হওয়ার পরিবর্তে এই দুই প্রতিষ্ঠান পরস্পরের পরিপূরক হতে পারে।

অনেকে আশংকা করেন, বর্তমানের অসম মালিকানার পরিস্থিতি বজায় রেখে গ্রাম পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো সৃষ্টি করা হলে তা গ্রামের জীবনের উপর ধনী পরিবারদের প্রভাব-প্রতিপত্তি (প্রভুত্ব) বরং আরও বাড়িয়ে তুলতে পারে। এ ধরনের আশংকা সম্পূর্ণ অমূলক নয়। ভারতেই দেখা যায়, আনুষ্ঠানিকভাবে একই রূপের হলেও বিভিন্ন রাজ্যে এবং বিভিন্ন স্থানে গ্রাম পঞ্চায়েতের ভূমিকা বিভিন্ন ধরনের হয়েছে। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, একই সাংগঠনিক রূপের আধেয় বিভিন্ন রকম হতে পারে। এই আধেয় নির্ভর করে সামাজিক শক্তি ভারসাম্যের উপর, এবং নেতৃত্বের উপর। কিন্তু এসব সীমাবদ্ধতা ও আশংকা সত্ত্বেও তা গ্রাম পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো সৃষ্টির মৌল

যুক্তিকে বাতিল করে না। লক্ষণীয়, গ্রাম কর্তৃপক্ষের অবস্থান গ্রামের মানুষের অত্যন্ত নাগালের মধ্যে হওয়ায় তাতে সাধারণ মানুষের সংখ্যার শক্তির প্রকাশ অপেক্ষাকৃত সহজ হবে। সে শক্তির উপর নির্ভর করে গ্রামের সমবায়ী চরিত্রকে আরও গভীরতার দিকে নিয়ে যাওয়ার পথ সুগম হবে। এই বিবর্তন ও অগ্রগতি যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সংঘটিত হবে, এমনটা আশা করা যায় না। এর জন্য প্রয়োজন হবে উপযোগী প্রয়াস ও নেতৃত্বের – গ্রামের অভ্যন্তরে এবং গ্রামের বাইরে, স্থানীয় এবং জাতীয় পর্যায়ে।

সুতরাং, বিদ্যমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যেও গ্রাম পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো সৃষ্টি এবং তা ব্যবহার করে গ্রামের সমবায়ীকরণ এবং গ্রামের অন্তর্গত সম্ভাবনা বাস্তবায়নের কাজ অগ্রসর হতে পারে। গ্রামের ইস্যুতে বিরাজমান রাজনীতির প্রতিকূল দিকের প্রভাব প্রশমিত করে এর অনুকূল দিকটির প্রভাব বৃদ্ধি করা প্রয়োজন হবে। সবচেয়ে বড় কথা, গ্রাম ভিত্তিক প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর দাবিতে গ্রামবাসীরা নিজেরাই যাতে এগিয়ে আসে সে বিষয়ে সচেষ্ট হতে হবে। সেজন্য কেন এধরনের প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন, তা গ্রামবাসীদের কাছে ব্যাখ্যা করতে হবে। অবশ্যই, বর্তমান বাংলাদেশের শ্রেণি বিভক্ত গ্রামে এই প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো বিষয়ক প্রস্তাবের প্রতি সকলের সাড়া এক রকম হবে না। তবে এই বিভিন্নতা সত্ত্বেও স্থানীয় সরকারের প্রাথমিক ধাপ হিসেবে গ্রামকে গ্রহণের প্রস্তাবের প্রতি গ্রামের সকলেরই উৎসাহিত হওয়ার কথা।

গ্রামের সমবায়ীকরণের প্রস্তাবের বিষয়টি আপাতদৃষ্টিতে অপেক্ষাকৃত অগ্রসর চরিত্রের। কিন্তু আগেই উল্লিখিত হয়েছে, এ বিষয়ে পর্যায়ক্রমতার নীতি গ্রহণ বাঞ্ছনীয় হবে। বস্তুত সূচনায় গ্রামের সমবায়ীকরণকে একটি পৃথক লক্ষ্য হিসেবে উপস্থিত করার প্রয়োজনও নেই। গ্রাম ভিত্তিক স্থানীয় সরকার গঠন, সেই সরকারের তহবিল প্রতিষ্ঠা, এই তহবিলের মাধ্যমে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক এবং কল্যাণধর্মী কর্মকাণ্ডের উদ্যোগ গ্রহণ এবং সম্পাদন, ইত্যাদি কাজই গ্রামকে একটি সমবায়ী চরিত্র দেবে। এই সমবায়ী চরিত্রকে আরও গভীর করা যায় কিনা, সে প্রশ্নের উত্তর সময় এবং পরিস্থিতিই নির্ধারণ করবে।

তবে এটা কোন নিষ্ক্রিয়তার প্রস্তাবনা নয়; সক্রিয় প্রয়াসের মধ্য দিয়েই উপর্যুক্ত পরিস্থিত সৃষ্টি হবে। যদি এরূপ সংযত এবং পরিস্থিতিসাপেক্ষভাবে গ্রাম পর্যায়ে স্থানীয় সরকার গঠন এবং গ্রামের সমবায়ীকরণের কর্মসূচি উপস্থাপন করা যায়, তবে গ্রামবাসীরা ব্যাপকভাবে এই কর্মসূচির পেছনে সমবেত হবেন বলেই আশা করা যায়। গ্রামবাসীদের সেই বিপুল সমর্থনের মুখে রাজনৈতিক

দলসমূহের অযৌক্তিক আচরণ, ইউনিয়ন পরিষদ সংশ্লিষ্ট কায়েমী স্বার্থ, ইত্যাদি সকল বাঁধা দুর্বল প্রমাণিত হবে; এবং গ্রামের বহুদিনের প্রতিক্ষীত এবং বহুবিধ কারণে প্রয়োজনীয় এবং ঈপ্সীত প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তন অর্জিত হতে পারবে।

১৯. উপসংহার

বঙ্গবন্ধু তাঁর মৃত্যুর কিছুকাল আগে বাংলাদেশের গ্রাম সম্পর্কে একটি স্বপ্ন উপহার দিয়ে গেছেন। এই স্বপ্নটি হলো একটি সমতাধর্মী সমবায়ী গ্রামের। দীর্ঘদিনের সংগ্রাম ও অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে তিনি এই স্বপ্নে উপনীত হয়েছিলেন। সেই তিরিশের দশকে শেরেবাংলা আবুল কাশেম ফজলুল হকের কৃষক-প্রজা পার্টি দ্বারা সূচিত একটি সংগ্রামের ধারাবাহিকতা তিনি প্রত্যক্ষ ও ধারণ করেছেন। ১৯৫৪ সনের যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী ইশতেহারে তিনি ভূমি সংস্কারের কর্মসূচি অন্তর্ভুক্ত করেছেন। ১৯৭০ সনে আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহারে তিনি পুনরায় ভূমি সংস্কারের কর্মসূচি অন্তর্ভুক্ত করেছেন। স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সনে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর তিনি ভূমি সংস্কার বাস্তবায়নেরও উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এই দীর্ঘদিনের সঞ্চিত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তিনি ১৯৭৫ সনে প্রতিটি গ্রামে সকলকে অন্তর্ভুক্ত করে সমবায় গঠনের কর্মসূচি ঘোষণা করেন। তাঁর স্বপ্ন ছিল গ্রামের মানুষকে একত্র করা, সংহত করা, এবং সংঘবদ্ধ করা, যাতে তাঁদের নিজেদের সমস্যা সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় সম্মিলিত উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে। তিনি জমি মালিকানা সংরক্ষিত রেখে যৌথচাষের প্রস্তাব করেছিলেন, যাতে একদিকে শ্রমজীবীদের স্বার্থ প্রসারিত হয় এবং অন্যদিকে জমি-মালিকদের স্বার্থ বহুলাংশে রক্ষিত হয়।

এটা ঠিক যে, আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতার আলোকে যৌথচাষের প্রস্তাব এখন প্রশ্নবিদ্ধ। কিন্তু গ্রামবাসীদের একত্র করার যে অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রয়োজনীয়তা বঙ্গবন্ধু উপলব্ধি করেছিলেন, তা এখনও বিদ্যমান। বস্তুত, জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে টিকে থাকার সংগ্রামের প্রেক্ষিতে এই প্রয়োজনীয়তা বর্তমানে আরও বৃদ্ধি পেয়েছে।

এই পটভূমিতে বাংলাদেশে গ্রাম পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর অনুপস্থিতি একটি দুঃখজনক বিষয়। গ্রামবাসীদের সংঘবদ্ধকারী উপযোগী প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর অভাবে বাংলাদেশের গ্রামগুলো আজ যেন এতিমের মতো হয়ে আছে। গ্রামবাসীদের সকলের শক্তি যূথবদ্ধ করে অভিপ্রকাশিত করার উপায় না থাকায় গ্রামগুলো নিঃসাড় এবং বহুলাংশে পরোমুখাপেক্ষী হয়ে আছে।

অথচ এই উপমহাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের, বিশেষত ভারতের মতো বাংলাদেশেরও গ্রাম ভিত্তিক প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর অতীত ঐতিহ্য আছে। যেখানে ভারত "গ্রাম পঞ্চায়েত"কে সে দেশের "পঞ্চায়েত রাজে"র মৌল ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করেছে, এবং গ্রাম পঞ্চায়েতকে সে দেশের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার সুযোগ করে দিয়েছে, সেখানে বাংলাদেশে গ্রাম পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়া এবং বিকশিত করার কর্তব্যটি অবহেলিত হচ্ছে। বিপরীতে ইউনিয়ন পরিষদের দিকে মনোযোগ দেয়া হচ্ছে এবং গ্রামগুলোকে ইউনিয়নের "ওয়ার্ডে" রূপান্তরিত করা হচ্ছে। অথচ "ইউনিয়ন" এবং "ওয়ার্ড" এই দুই বিদেশি শব্দ এবং প্রত্যয় বৃটিশেরা এ দেশের উপর চাপিয়ে দিয়েছে। আবহমানকালের বাংলাদেশের সমাজ, ইতিহাস, ও সংস্কৃতিতে এগুলোর তেমন কোনো স্থান নেই।

সুতরাং, সময় এসেছে গ্রাম সংক্রান্ত বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের কাছে ফিরে যাওয়া এবং ১৯৭৫ সনে তাঁর প্রস্তাবিত সমবায়ী গ্রাম প্রতিষ্ঠার কর্মসূচিকে যুগোপযোগী করে বাস্তবায়ন করার। এ লক্ষ্যে প্রথম পদক্ষেপ হবে গ্রামকে স্থানীয় সরকার কাঠামোর মৌলিক ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা এবং সে কাঠামো গড়ে তোলা। একটি উন্মুক্ত গণ-আলোচনার মাধ্যমে এই কাঠামোর বিস্তারিতকরণ করা প্রয়োজন। সন্দেহ নেই যে, এই কাঠামোকে গণতান্ত্রিক হতে হবে। গ্রামের সকল প্রাপ্তবয়স্কদের নিয়ে গঠিত "গ্রাম-সভা"ই হবে এই কাঠামোর ভিত্তি, এবং তাঁদের প্রত্যক্ষ ভোট দ্বারা গ্রাম কর্তৃপক্ষ নির্বাচিত হবে। জেলা পরিষদ এবং ইউনিয়ন পরিষদ নামের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে এই কর্তৃপক্ষের নাম হতে পারে "গ্রাম পরিষদ।" তবে নামের বিষয়টি মুখ্য নয়। ভারত, নেপাল, এবং শ্রীলংকার মতো অতীতকালের "গ্রাম পঞ্চায়েত" নামও ব্যবহার করা যেতে পারে। এই গ্রাম কর্তৃপক্ষ গ্রামকে একটি সমবায় হিসেবে গড়ে তুলবে এবং সে সমবায়ের পরিচালনা পরিষদ হিসেবে কাজ করবে। গ্রাম পর্যায়ে স্থানীয় সরকারের ভূমিকা পালন আর সমবায়ী গ্রাম পরিচালনা, এই দুই কাজকে পৃথক করে দেখার প্রয়োজন নেই এবং তার জন্য পৃথক পরিচালনা পরিষদেরও প্রয়োজন নেই। একই কর্তৃপক্ষ এই দ্বৈত ভূমিকা পালন করতে পারে।

এভাবে গঠিত সমবায়ী গ্রাম কতোটা সমতাধর্মী হবে, তা নির্ভর করে গ্রাম কর্তৃপক্ষ এবং জাতীয় নেতৃত্ব কতোটা সাফল্যের সঙ্গে এই কাঠামোকে ব্যবহার করতে পারছে। প্রথমত, গ্রাম পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো সংক্রান্ত আইনটিকে এমন হতে হবে যাতে গ্রাম কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিভিন্ন সমতাধর্মী উদ্যোগ গ্রহণের

আইনগত সুযোগ থাকে। দ্বিতীয়ত, আইনগত সুযোগ থাকা আর সে সুযোগের বাস্তবায়ন এক কথা নয়। তদুপরি বিদ্যমান আইনের অধীনেই অনেক উদ্যোগ সম্ভব। যেমন বিদ্যমান জমি মালিকানা আইনের অধীনেই স্বেচ্ছামূলক ভূমি সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে। এর জন্য প্রয়োজন হবে উপযোগী রাজনৈতিক ভারসাম্য এবং নেতৃত্ব। গ্রামের নব-সৃষ্ট প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো যাতে সেরূপ শক্তি ভারসাম্য এবং নেতৃত্ব সৃষ্টিতে সহায়ক হয়, সে ব্যাপারেও সচেষ্ট হতে হবে।

দেশের বিদ্যমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি সমবায়ী গ্রাম গঠনের জন্য একদিকে অনুকূল এবং অন্যদিকে প্রতিকূল। অনুকূল এ কারণে যে, দেশের বড় সকল রাজনৈতিক দল এবং শক্তিই গ্রাম পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেছে এবং সে লক্ষ্যে উদ্যোগও নিয়েছে। বঙ্গবন্ধু ১৯৭৫ সনে সমবায়ী গ্রামের প্রস্তাব করেছেন। জিয়াউর রহমান ১৯৮০ সনে "স্বনির্ভর গ্রাম সরকার" গঠন করেছেন। শেখ হাসিনা ১৯৯৭ সনে "স্থানীয় সরকার (গ্রাম পরিষদ) আইন" প্রণয়ন করেছেন। খালেদা জিয়া ২০০৩ সনে "গ্রাম সরকার আইন" প্রণয়ন করেছেন। এরশাদও নিজেকে "পল্লীবন্ধু" বলে দাবি করেছেন এবং "পল্লী পরিষদ" আইন প্রণয়ন করেছেন। বামপন্থী দলসমূহ আদর্শগতভাবেই সমবায়ী উদ্যোগের পক্ষে। কাজেই এক হিসেবে সমবায়ী গ্রামের বিপক্ষে কে, সেটা খুঁজে পাওয়াই কঠিন হওয়ার কথা!

কিন্তু অন্যদিকে বিদ্যমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি সমবায়ী গ্রাম গঠনের জন্য প্রতিকূল, কারণ বিগত সময়কালে বাংলাদেশে রাজনৈতিক ক্ষমতার সংগ্রাম এত তীব্র হয়ে গেছে যে, এখন কোনো কর্মসূচির গুণাগুণের (মেরিটের) চেয়ে ক্ষমতার দ্বন্দ্বের উপর তার অভিঘাত কী, সেটাই বড় বিবেচ্য বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। সবচেয়ে অনতিক্রম্য বাঁধা দেখা দেয় যখন "কে বাস্তবায়িত করবে?" অথবা "কার নেতৃত্বে বাস্তবায়িত হবে?" এ ধরনের প্রশ্নই বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। যেমন, গ্রাম পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠনিক কাঠামোর নাম "গ্রাম সরকার" নাকি "গ্রাম পরিষদ" হবে, সে প্রশ্নেই হয়তো ঐক্যমত্যের প্রয়াস ভেস্তে যেতে পারে।

এমতাবস্থায় রাজনৈতিক দলসমূহের প্রতি আবেদন-আহ্বান জানানোর পাশাপাশি প্রয়োজন হবে গণ-মানুষের কাছে যাওয়ার। স্থানীয় সরকার কাঠামোকে গ্রাম পর্যায়ে সম্প্রসারিত করা এবং সমবায়ী গ্রাম প্রতিষ্ঠা করার কর্মসূচিতে গ্রামের সকলের স্বার্থ নিহিত। তদুপরি এই কর্মসূচির মধ্যে গোটা

জাতির স্বার্থ নিহিত। সুতরাং, এই কর্মসূচির পেছনে ব্যাপক জনসমর্থন অর্জন কঠিন হওয়ার কথা নয়। যেটা প্রয়োজন, তা হলো গণমানুষের কাছে এই কর্মসূচি তুলে ধরা, এর পেছনের যুক্তিসমূহ ব্যাখ্যা করা, এই কর্মসূচি কীভাবে গ্রামের মানুষের জীবনের গুণগত ইতিবাচক পরিবর্তন সূচনা করতে সক্ষম তা পরিষ্কার করা, এবং জলবায়ু পরিবর্তনের হুমকির মুখে গোটা জাতির টিকে থাকার সংগ্রামে এই কর্মসূচি কীভাবে সহায়ক হবে তা যুক্তিনিষ্ঠভাবে প্রতিষ্ঠিত করা। এই কাজগুলি যদি উদ্যম সহকারে সঠিকভাবে করা যায় তবে সমবায়ী গ্রাম এবং গ্রাম পর্যায়ে স্থানীয় সরকার কাঠামো সৃষ্টির দাবীর পক্ষে ব্যাপক জনমত গড়ে তোলা সম্ভব হবে। তখন রাজনৈতিক দলসমূহ এই জনমতের প্রতি সম্মান দেখাতে প্রবুদ্ধ হবে এবং গ্রাম পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোগত যে শূণ্যতা বিরাজ করছে তা পূরণে এগিয়ে যাবে।

পরিশিষ্ট -১

স্বনির্ভর গ্রাম সরকার বিধিমালা, ১৯৮০

The

Bangladesh Gazette

Extraordinary

Published by Authority

SATURDAY, MAY 24, 1980

GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH

MINISTRY OF LOCAL GOVERNMENT, RURAL DEVELOPMENT AND CO-OPERATIVES

Section VI

NOTIFICATION

Dacca, the 24th May, 1980

No. S.R.O. 139-l/80/S-VI/1A-5/80/283.-In exercise of the powers conferred by section 86 of the Local Government Ordinance, 1976 (XC of 1976),

THE SWANIRVAR GRAM SARKARS (CONSTITUTION AND ADMINISTRATION) RULES, 1980.

1. Short title.- These rules shall be called the Swanirvar Gram Sarkars (Constitution and Administration) Rules, 1980.

2. Definition.- In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context,-

(a) "Circle Officer", in relation to a gram or Swanirvar Gram Sarkar, means the Circle Officer or Circle Officer (Development) within the local limits of whose jurisdiction the gram or Swanirvar gram sarkar is situated.

(b) "gram" means a geographically bounded arca within a union, inhabited by a community of persons and considered by the community as a gram and notified as such under sub-rule (1) of rule 4;

(c) "Gram Shava" means a gram shava constituted under sub-rule (2) of rule 4 which shall consist of all such persons of the gram concerned whose names appear in the electoral roll of the gram which is, for the time being in force, for the purpose of the election of the members of parliament;

(d) "Gram Pradhan" means a person chosen by consensus under sub-rule (2) of rule 5 to be a Gram Pradhan;

(e) "member" means a member of Swanirvar Gram Sarkar and includes the Gram Pradhan;

(f) "Ordinance" means the local Government ordinance, 1976 (XC of 1976);

(g) "Prescribed Authority", in relation to a Swanirvar Gram Sarkar, means the Thana Parishad.

3. Determination of one-half, one-third, etc.-Where any provision of these rules requires the determination of one-half, one-third or any other fraction of a number and that number is not evenly divisible by 2, 3 or any such figure, shall be taken for the original number.

4. Declaration of a gram.- (1) The Circle Officer may, by an order notified in his office and in the offices of the Circle Officer (Revenue) and the Union Parishad within which the gram is situated, declare any rural arca to be a gram for the purposes of these rules; and the order so notified shall state the boundaries and name of the gram.

(2) Upon Declaration under sub-rule (1) of a rural area to be a gram, a Gram Shava shall stand constituted in the manner prescribed by Rule 2 (c).

5. Constitution of a Swanirvar Gram Sarkar.- (1) As soon as may be after the commencement of these rules, there shall be constituted a Swanirvar Gram Sarkar for every gram for carrying out the purposes of these rules.

(2) A Swanirvar Gram Sarkar shall consist of a Gram Pradhan and eleven other members of which not less than two shall be women.

(3) As soon as may be after the constitution of a gram shava under sub-rule (2) of rule 4, the Circle Officer or an Officer authorised by him in this behalf shall convene a meeting of the Gram Shava.

(4) The Gram Pradhan and other members chosen through the consensus of the persons present in the meeting in such a manner as may be agreed upon, shall ensure representation in the Swanirvar Gram Sarkar of people of all walks of life and of different functional/interest groups:

Provided that the Swanirvar Gram Sarkar constituted for the first time may make procedure for choice of members representing different functional/interest groups for the constitution of a Swanirvar Gram Sarkar for the second and subsequent time.

(5) The choice through consensus shall be recorded and signed by the Circle Officer or the person authorised by him in this behalf and a copy thereof shall be supplied to each of the Prescribed Authority, the Chairman of the concerned Union Parishad and the Gram Pradhan chosen in the meeting.

6. Term of Swanirvar Gram Sarkar.-(1) The term of the office of the Swanirvar Gram sarkar shall for the first term be three years and for the subsequent terms five years commencing on the day of its first meeting after its constitution:

Provided that, notwithstanding the expiration of its term, a Swanirvar Gram sarkar shall continue to function until the first meeting of the Swanirvar Gram Sarkar constituted to succeed it.

(2) A Swanirvar Gram Sarkar shall, after its constitution, hold its first meeting on such a date, not being a date later than thirty days from the day on which the results of the choice of the Gram Pradhan and members of the Swanirvar Gram Sarkar are supplied in the manner specified in sub-rule (5) of eule 5.

7. Assumption of office.-(1) As may be, but not later, than thirty days after the choice of the Gram Pradhan and the members are supplied under sub-rule (5) of rule 5, the Circle Officer shall, with clear three days' notice, appoint a day for meeting to be held at such place within the gram as the Circle Officer may decide, and the Swanirvar Gram Sarkar shall assume the charge of the office in the meeting.

2. The Gram Pradhan chosen under sub-rule (3) of rule 5 shall preside over the meeting: but in the absence of the Gram Pradhan, the members present shall elect one of their members to preside over the meeting.

8. Oath of office.-(1) In the first meeting after the constitution of Swanirvar gram sakar, the gram pradhan shall orally take and subscribe to an oath of office in the following form in Bangla and thereafter administer the same oath of office to all members present at the meeting by turn, and require each member to sign the form of oath.

FORM OF OATH

I,.....having been chosen as the Gram Pradhan/Member of the Swanirvar Gram Sarkar of..... gram, do solemnly affirm that I will bear true faith, and allegiance to Bangladesh, and that I will faithfully perform the duties of my office to the best of my ability, knowledge and judgment.

Dated the..... *Gram Pradhan/Member*

(2) When the oath of office has been taken by all members present at the meeting, the Swanirvar gram sarkar shall be decmed to have assumed office.

(3) It any member, for reason of absence, or for any other reason, fails to take the oath of office at the first meeting of the Swanirvar gram sarkar, the Gram Pradharn or any other person presiding at a subscquent meeting of the Swanirvar Gram Sarkar to be held not later than thirty days after the first meeting shall administer the oath of office to such member, and on his taking the oath of office he shall be deemed to have taken his seat on the Swanirvar Gram Sarkar.

9. Qualification etc. of Gram Pradhan and Members of a Swanirvar Gram Sarkar.-

A person shall be qualificd to be chosen as, and to be, a Gram Pradhan or a Member, if-

(a) he is a citizen of Bangladesh;

(b) he has attained the age of twenty-five years;

(c) his name appears on the electoral roll of the concerned village;

(d) he is not a sitting Chairman/member of a Union Parishad; and

(e) he permanently resides in the gram;

and if he does not fulfil these conditions, he shall be disqualified for being chosen as, or for being, a Gram Pradhan or a Member of the Swanirvar Gram Sarkar.

10. Resignation of members etc.-(1) A member of a Swanirvar Gram Sarkar may resign his office by notice in writing with his hand addressed to the Gram Pradhan.

(2) A Gram Pradhan may resign his office by notice in writing under his hand addressed to the Circle Officer.

(3) A resignation under this section shall become efiective, and the office concerned shall become vacant, on the date on which the notice of resignation is received by the addressee.

11. Removal of members etc of Swanirvar Gram Sarkar.- (1) A Gram Pradhan or member of a Swanirvar Gram Sarkar shall render himself liable to removal from his office, if-

(a) he, without reasonable excuse, absents himself from three consecutive meetings of the Swanirvar Gram Sarkar;

(b) he refuses to perform or becomes disabled from performing his functions; or

(c) he is guilty of misconduct or is responsible for any loss or misappropria tion or misapplication of money or property of the Swanirvar Gram Sarkar.

Explanation.-In this sub-rule "misconduct" means misuse of power, corruption, jobbery, favouritism, nepotism and wilful maladministration and includes any attempt at, or abetment of, such misconduct.

(2) A Gram Pradhan or a Member shall not be removed from his office on any ground mentioned in sub-rule (1) unless a requisition in writing is presented by one-third of people comprising the Gram Shava to that effect to the Circle Officer who shall convene a meeting of the Gram Shava within a fortnight, with five days' notice stating the time, date and place of the meeting

(3) A requisitioned meeting under sub-rule (2) shall be presided over by the Circle Officer or by an officer authorised by him who shall preside over and conduct the meeting in the manner specified in sub-rule (9) of rule 20.

(4) In a requisitioned meeting, the concerned Gram Pradhan or the Member against whom removal has been proposed, shall be given a reasonable opportunity of being heard on the charges against him.

(5) After the hearing of the affected Gram Pradhan or member concerned, as the case may be, the Gram Shava shall be physically divided into two lobbies, one in favour of the resolution for the removal of the Gram Pradhan or the Member, and the other opposed to it, and the Circle Officer or the authorised officers as the case may be, shall then count the votes and declare both orally and in writing the result of the counting.

(6) If the motion for the removal of a Gram Pradhan or a member is passed by the votes of not less than two-thirds of the total number of the persons present in the meeting, the Gram Pradhan or the Members concerned shall stand removed.

(7) A person who is removed from the office of Gram Pradhan shall also stand removed from the office of Member of the Swanirvar Gram Sarkar.

(8) Notwithstanding anything contained in any other provision, a person who has been removed from any office under this rule shall not, during the unexpired portion of the term of the Swanirvar Gram Sarkar concerned, be eligible for being a Gram Pradhan or Member of the Swanirvar Gram Sarkar.

12. Vacation of officer of members etc.-The office of a Gram Pradhan or a Mmember shall become vacant, if-

(a) he becomes disqualified for being such Gram Pradhan or Member under rule 9;

(b) he fails to take the oath under rule 8 within the prescribed period, except in a case where the prescribed authority for good cause shown extends the period;

(c) he resigns his office under rule 11; or (e) he dies.

13. Casual vacancy.-Where the office of a Gram Pradhan or a member becomes vacant not later than one hundred and eighty days

before the term of the Swanirvar Gram Sarkar is due to expire, the vacancy shall be filled up within sixty days of the occurrence of the vacancy in the manner laid down in rule 5 and the person so chosen shall hold office for the residue of such term.

14. Leave of absence.-A Swanirvar Gram Sarkar may grant leave of absence to its Gram Pradhan for any period not exceeding three months in any one year.

15. Notification of choice through consensus etc.-A choice through consensus, resignation or removal of, or vacation of office by, a Gram Pradhan or a Member shall be notified by the Circle Officer in his office and also in the office of the concerned Union Parishad and the Swanirvar Gram Sarkar.

16. Panel of Gram Pradhan.-(1) Within one month of the meeting held under rule 7 for assumption of office, a panel of two persons to act as Gram Pradhan during his temporary absence shall be chosen, in order of preference, by the members of the Swanirvar Gram Sarkar from amongst themselves.

(2) Where the office of the Gram Pradhan falls vacant under rule 12 or the Gram Pradhan is on leave or has been suspended under rule 32, the functions of his office shall be performed by the member whose name is the highest on the panel of the Gram Pradhan in order of preference.

17. Functions.- subject to such directions as may be given by the Government, from time to time, the Swanirvar Gram Sarkar may perform and undertake, in general, such functions as it considers necessary for overall development of the village and, in particular, for-

(a) Increasing of food production;

(b) Mass literacy;

(c) Population Control and Family Planning; and

(d) Law and order; holding salish to settle local disputes.

Note: They may also promote Gram Samabaya Banks.

18. Executive powers.-(1) The executive powers of Swanirvar

Gram Sarkar shall extend to the doing of all acts necessary for the due discharge of its functions under these rules,

(2) Save and otherwise provided in these rules or in any direction issued there under, the executive powers of a Swanirvar Gram Sarkar shall vest in and be exercised by its Gram Pradhan.

(3) All actions of a Swanirvar Gram Sarkar shall be expressed to be taken in the name of the Swanirvar Gram Sarkar.

19. Disposal of Business.- All business of a Swanirvar Gram Sarkar shall be disposed of at its meeting or at the meeting of its committees or in such manner as may be determined by the members.

(2) All meetings of a Swanirvar Gram Sarkar, other than a requisitioned meeting under sub-rule (2) of rule 11, shall be presided over by the Gram Pradhan or in his absence by the member whose name is the highest in the panel of the Gram Pradhan chosen in accordance with the provisions in rule 16.

(3) The minutes of the meetings of a Swanirvar Gram Sarkar shall be recorded in a book kept for the purpose.

(4) No act or proceeding of a Swanirvar Gram Sarkar shall be invalid merely on the ground of the existence of any vacancy in it, or any defect in its constitution or sitting or voting or taking part, in its proceedings by a person who was not entitled so to sit, vote or otherwise take part, in its proceedings, or any accidental omission to give notice to any member or non-receipt of the notice of the meeting where such notice is a legal requirement, by any member.

(5) The Swanirvar Gram Sarkar shall have an office of its own within the Gram as determined by the Swanirvar Gram Sarkar.

20. Meetings.-(1) The meeting of a Swanirvar Gram Sarkar shall be held at such places and time as may be determined by it from time to time:

Provided that at least one ordinary meeting of the Swanirvar Gram Sarkar shall be held every fortnight on a day to be fixed by the Gram Pradhan in consultation with the members.

(2) No separate formal notice of an ordinary meeting need be given individually to the members, but a copy of the notice of the meeting along with its agenda shall be hung on the notice board in the meeting place to be determined under sub-rule (1) at least three days before every such meeting.

(3) A special meeting of the Swanirvar Gram Sarkar may be called by the Gram Pradhan either on his own motion or on the requisition by not less than five members on at least three days' notice to the members. stating clearly the agenda of the business to be transacted.

(4) (a) In a meeting of the Swanirvar Gram Sarkar,whether ordinary or special, one-half of the total number of members shall form the quorum.

(b) If within half an hour after the time determined for a meeting of the Swanirvar Gram Sarkar, a quorum is not present the meeting may be adjourned to a future date and time to be determined by the Gram Pradhan. The business of the adjourned meeting may be conducted by the members present, whatever their number may be.

5.The business of an ordinary meeting shall be conducted in the following order, namely:-

(a) the proceedings of the last ordinary meeting and of any special meeting held after that meeting shall be read out and, if approved as correctly recorded, shall be signed by the Gram Pradhan. If any error is pointed out, it shall be corrected;

(b) the rest of the agenda; and

(c) miscellaneous matters, if any, shall be considered.

(6) At a special meeting of the Swanirvar Gram Sarkar the business for which the meeting was called shall alone be considered and at an adjourned meeting of the Swanirvar Gram Sarkar no business save that which was left unfinished at the original meeting shall be considered.

(7) All questions at a meeting of a Swanirvar Gram Sarkar shall

be decided by a majority of votes of the members present and voting, and in the case of equality of votes the Gram Pradhan shall have a second or casting vote.

(8) The Gram Pradhan shall maintain order in the meeting of a Swanirvar Gram Sarkar and shall conduct the proceedings in such a manner as may be conducive to expeditious and satisfactory disposal of the business: and shall decide points of order and his decision on such points of order shall be final.

(9) The Gram Pradhan may direct any member to withdraw from a meeting of the Swanirvar Gram Sarkar for disorderly conduct and the member so ordered, shall immediately withdraw, and unless otherwise directed by the Gram Pradhan shall remain not be entitled to vote without the permission of the Gram Pradhan.

21. Committee.-(1) A Swanirvar Gram Sarkar may appoint such number of Committees as it may consider necessary for the efficient performance of its functions under these rules.

(2) A Committee shall consist of not more than four members of the Swanirvar Gram Sarkar and no member shall be member of more than two Committees simultaneously.

(3) A member of a Committee shall hold office for one year but shall be eligible for re-appointment.

(4) A Swanirvar Gram Sarkar may associate with any Committee, for such period as it may think fit, any person who is not a member of the Committee but who possesses special qualifications for serving on the Committee:

Provided that a person so associated shall not have any right to vote at the meetings of the committee but shall be deemed to be a member of the Committee for all purposes.

(5) A member of a Committee who fails to attend three consecutive meeting of the Committee shall cease to be a member of the Committee and the Swanirvar Gram Sarkar may fill the vacancy thus caused.

(6) Every Committee shall appoint one of its members to be its Convener:

Provided that no person shall at the same time be the Convener of more than one Committee.

(7) Every Committee shall, in the performance of its functions under these rules, be guidcd by such instructions as may, from time, be given to it by Swanirvar Gram Sarkar.

(8) The resolutions passed by a Committee shall be recorded in a book to be kept for this purpose, and shall be signed by the Convener of the committee.

(9) The proceeding of committee shall be subject to confirmation, with or without modification, by the Swanirvar Gram Sarkar.

22. Meetings of a committee.-(1) A Committee may meet as and when it thanks proper.

(2) In a meeting of a Committee one-third of its total number of members but not less than two, shall constitute the quorum.

(3) The Convener shall preside over a meeting of the committee and, in the absence of the Convener, the members of the Committee shall choose one of its members to preside over the meeting.

(4) Every question at a meeting of a Committee shall be determined by a majority of the votes of the members present and voting and, in the event of equality of votes, the Chairman of the meeting shall have a second or casting vote.

23. Meeting of the Gram Shavas.- A gram Shava shall meet for the purpose of-

(a) constitution of the Swanirvar Gram Sarkar in the manner specified in rule 5;

(b) removal of the Gram Pradhan or members of a Swanirvar Gram Sarkar in the manner specified in rule 11;-

(c) filling up of the casual vacancy in the manner specified in rule 13; and

(d) review of the progress of the activities of the Swanirvar Gram Sarkar once in every three months in meeting which shall be called by the Gram Pradhan stating the date, time and place of the meeting and the agenda to be discussed.

24. Fund.-(1) Every Swanirvar Gram Sarkar shall have a fund which shall be known as Swanirvar Gram Sarkar Fund.

(2) To the credit of the Swanirvar Gram Sarkar Fund Shall be placed-

(a) contributions from individuals, Gram Samabay or any institution or local authority;

(b) any other income from any legitimate source.

(3) The moneys credited to a Swanirvar Gram Sarkar fund shall be kept in a scheduled bank or Post Office.

25. Budget.-Every Swanirvar Gram Sarkar shall prepare and sanction before the commencement of each financial year a statement to be called the annual budget, showing its estimated receipts and expenditure for that year, and send a copy thereof to the Chairman of the Union Parishad and also to the prescribed Authority for record.

26. Accounts.-Every Swanirvar Gram Sarkar Shall maintain cash books, receipt books, cheque books and other connected documents in the manner in which they are maintained by the Union Parishads under Account and Audit Rules, 1960, with such modification, alteration and substitution as may be considered necessary.

27. Audit.-(1) The accounts of a Swanirvar Gram Sarkar shall be audited by such person as may be appointed, and in such manner as may be specified, by the Government in this behalf.

(2) A Swanirvar Gram Sarkar itself shall every year carry out internal audit of its accounts for the preceding financial year.

28. Recovery against liabilities.- Every Gram Pradhan, Member and person charged with the administration of the affairs of a Swanirvar Gram Sarkar or acting on behalf of a Swanirvar Gram Sarkar, shall be liable for the loss, waste or misapplication of any money or property belonging to the Swanirvar Gram Sarkar which is a direct consequence of his negligence or misconduct: and the Mobility of such Gram Pradhan, member or person shall be determined by the Prescribed Authority, and the amount for which he is held liable shall be recoverable as a public demand.

29. Supervision over Swanirvar gram sarkar Gram Sarkar.-The Government shall exercise general supervision and control over a Swanirvar Gram Sarkar in order to ensure that its activities conform to the purposes of these rules.

30. Inquiry iato the affairs of Swanirvar Gram Sarkar.-The Government may, either suo motu or an application made to it by any person, cause as enquiry to be made, by such officer as may be authorised by it in this behalf, into the affairs of a Swanirvar Gram Sarkar generally, or into any particular matter concerning a Swanirvar Gram Sarkar and take such remedial measures as may be warranted by the findings of such enquiry.

31. Supersession of Swanirvar Gram Sarkar.-(1) If, after such enquiry as may be necessary, the Prescribed Authority is of opinion that a Swanirvar Gram Sarkar-

(a) is unable to discharge or persistently fails in discharging its duties, or

(b) is unable to administer its affairs or meet its financial obligations; or

(c) Generally acts in a manner contrary to public interest, or

(d) otherwise exceeds or abuses its powers,

the Prescribed Authority may declare the Swanirvar Gram Sarkar to be superseded for such period, not exceeding the residue of the term of the Swanirvar Gram Sarkar, as may be specified.

(2) On the declaration under sub-rule (1),-

(a) persons holding office as Gram Pradhan or members of the Swanirvar Gram Sarkar shall cease to hold the office;

(b) all functions of the Swanirvar Gram Sarkar shall, during the period of supersession, be performed by such person or authority as the Government may appoint in this behalf; and

(c) all fund and property belonging to the Swanirvar Gram Sarkar shall, during the period of supersession, vest in the Government through the Circle Officer.

(3) On the expiry of the period of supersession the Swanirvar Gram Sarkar shall be reconstituted in accordance with the provisions of these rules.

32. Suspension of Gram Pradhan in certain circumstances.-(1) Where any criminal proceeding under any law has been started against a Gram Pradhan and, in the opinion of the prescribed Authority, the exercise by him of any power under these rules is either prejudicial or likely to be prejudicial to the interest of a Swanirvar Gram Sarkar or undesirable from the administrative point of view, the prescribed Authority may, by order in writing suspend the Gram Pradhan.

(2) When an order of suspension has been made under sub-rule (1), the Gram Pradhan shall, not later than three days from the date of communication of the order, make over charge of his office to the first member on the panel of Gram Pradhan who is entitled to perform the functions of the office of the Gram Pradhan and such member shall continue to perform such functions until the proceedings against the Gram Pradhan are germinated.

(3) When a Gram Pradhan has been suspended under sub-rule (1), the prescribed Authority shall immediately communicate order of suspension to the Gram Pradhan thus suspended and also to the Chairman of the Union and necessary action.

(4) If the Gram Pradhan thus suspended does not make over

charge of his office within three days, the member on the panel shall assume the charge under sub-rule (2) of rule 16.

33. Joint Committees.- Any Swanirvar Gram Sarkar may join any other Swanirvar Gram Sarkar or local parishad or any other local authority or authorities, in appointing a Joint Committee for any purpose in which such Swanirvar Gram Sarkars or authorities may have common interest and may delegate to such joint Committee any power which may be exercised by it, including the power to make regulations for the conduct of its business.

34. Disputes between Swanirvar Gram Sarkars and local parishads.- If any dispute arises between two or more Swanirvar Gram Sarkars or between Swanirvar Gram Sarkars and any local parishad the matter shall be referred-

(a) to the Prescribed Authority, if the parties concerned are in the same thana;

(b) to the Subdivisional Officer, if the parties concerned are in the same subdivision;

(c) to the Deputy Commissioner, if the parties concerned are in the same district; and the decision of the authority to which the dispute is so referred shall be final.

35. Standing orders.- The Government may, by standing order, from time to time,-

(a) define and regulate the relations of the Swanirvar Gram Sarkars inter se, and with other local authorities and local parishads;

(b) provide for co-ordinating the activities of Swanirvar Gram Sarkars and the Government authorities;

c) provide for giving financial assistance to Swanirvar Gram Sarkars, including the making of grants for specifled purposes on specifled terms and conditions; and

(d) provide for the general guidance of Swanirvar Gram Sarkars in carrying out the purposes.

36. Reference to local parishads.- Where anything is required to be done or not to be done by any person or any local parishad or

other local authority under the Ordinance or the Rules or By-laws there under or under any other law for the time being in force, the concerned Swanirvar Gram Sarkar may refer the matter to the local parishad or other local authority within the local limits of whose jurisdiction the matter lies; and upon the receipt of the reference, the local parishad or the local authority concerned, as the case may be, may take steps for the time being in force.

37. Exercise of the powers by the Prescribed Authority.-
The prescribed Authority shall exercise all the powers under these rules either suo motu or on the recommendation of the Circle Officer.

38. Appeal.- (1) An appeal against the order of the prescribed Authority shall lie with the Zilla Parishad whose decision on the matter shall be final.

(2) An appeal under sub-rule (1) shall be filed within fifteen days from the date of the order to which the appeal relates.

By order of the President
FAZUL KARIM CHOWDHURY
Deputy secretary.

স্থানীয় সরকার (গ্রাম পরিষদ) আইন, ১৯৯৭

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, সেপ্টেম্বর ৮, ১৯৯৭

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৯৭/২৪শে ভাদ্র, ১৪০৪

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৯৭ (২৪শে ভাদ্র, ১৪০৪) তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে :-

১৯৯৭ সনের ২১ নং আইন

তৃণমূল পর্যায়ে প্রতিনিধিত্বমূলক গ্রাম পরিষদ গঠন করিয়া গ্রামীণ জনগণের সার্বিক উন্নয়ন নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে বিধান করার জন্য প্রণীত আইন

যেহেতু তৃণমূল পর্যায়ে প্রতিনিধিত্বমূলক স্থানীয় সরকার (গ্রাম পরিষদ) গঠন করিয়া গ্রামীণ জনগণের সার্বিক উন্নয়ন নিশ্চিত করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল :–

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম :–** এই আইন স্থানীয় সরকার (গ্রাম পরিষদ) আইন, ১৯৯৭ নামে অভিহিত হইবে।

২। **সংজ্ঞা :–** বিষয় ও প্রসংগের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে–

(ক) 'ইউনিয়ন' অর্থ Local Government (Union Parishads) Ordinance, ১৯৮৩ (Ord. No. LI of 1983) এর section ৩ এর অধীন ঘোষিত কোন ইউনিয়ন;

(খ) 'ওয়ার্ড' বলিতে Local Government (Union Parishads) Ordinance, 1983 (Ord. No. LI of 1983) এর section 18 এর sub-section (১) এ উল্লেখিত ওয়ার্ডসমূহের একটিকে বুঝাইবে;

(গ) 'চেয়ারম্যান' অর্থ গ্রাম পরিষদের চেয়ারম্যান ;

(ঘ) 'সদস্য' অর্থ গ্রাম পরিষদের সদস্য ;

(ঙ) 'পরিচালনাকারী কর্তৃপক্ষ' অর্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সরকার হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি।

৩। **গ্রাম পরিষদ প্রশাসনিক একাংশ :–** প্রত্যেক গ্রাম পরিষদ সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৫৯ নং উদ্দেশ্য পূরণকল্পে একটি প্রশাসনিক একাংশ হইবে।

৪। **গ্রাম পরিষদ স্থাপন :–**(১) এই আইন বলবৎ হইবার পর যতশীঘ্র সম্ভব, এই আইনের বিধান অনুযায়ী প্রত্যেক ওয়ার্ডে একটি গ্রাম পরিষদ গঠিত হইবে।

(২) সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের নামের পর ওয়ার্ড নম্বরের সূচকে গ্রাম পরিষদের নাম হইবে।

(৩) গ্রাম পরিষদ একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হইবে এবং ইহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও একটি সাধারণ সীলমোহর থাকিবে; এবং এই আইন ও বিধি সাপেক্ষে, ইহার স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করার, অধিকারে রাখার ও হস্তান্তর করার ক্ষমতা থাকিবে; এবং ইহার নামে ইহা মামলা দায়ের করিতে পারিবে বা ইহার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা যাইবে।

৫। **গ্রাম পরিষদ গঠন :–** (১) গ্রাম পরিষদ একজন চেয়ারম্যান, নয়জন পুরুষ সদস্য এবং তিনজন মহিলা সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হইবে।

(২) সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের জন্য নির্বাচিত ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য গ্রাম পরিষদের চেয়ারম্যান হইবেন।

(৩) প্রত্যেক ওয়ার্ডের এলাকাভুক্ত গ্রামগুলিতে বসবাসকারী এবং আপাততঃ বলবৎ উক্ত ওয়ার্ডের ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভূক্ত আছে এমন পুরুষ ও মহিলাদের

সাধারণ সভার পরিচালনাকারী কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে, সাদস্যগণ নির্বাচিত হইবেন।

(৪) গ্রাম পরিষদের মেয়াদ পরিষদ গঠনের তারিখ হইতে পাঁচ বৎসর হইবে।

৬। **গ্রাম পরিষদের সদস্যের অযোগ্যতা :–** কোন ব্যক্তি গ্রাম পরিষদের পুরুষ-সদস্য বা মহিলা সদস্য হইবার বা উক্তরূপ সদস্য থাকিবার যোগ্য হইবেন না, যদি–

(ক) কোন আদালত তাহাকে অপ্রকৃতিস্থ বলিয়া ঘোষণা করে ;

(খ) তিনি দেউলিয়া ঘোষিত হইবার পর দায় হইতে অব্যাহতি লাভ না করিয়া থাকেন ;

(গ) তিনি বাংলাদেশের নাগরিকত্ব পরিত্যাগ করেন বা হারান ;

(ঘ) তিনি নৈতিক স্খলনজনিত কোন ফৌজদারী অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইয়া আদালত কর্তৃক অন্যূন দুই বৎসরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন এবং তাহার মুক্তিলাভের পর পাঁচ বৎসরকাল অতিবাহিত না হইয়া থাকে ;

(ঙ) তাঁহার নিকট কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান হইতে গৃহীত কোন ঋণ মেয়াদোত্তীর্ণ অবস্থায় অনাদায়ী থাকে ;

(চ) তিনি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, জেলা পরিষদ বা থানা পরিষদের সদস্য অথবা চেয়ারম্যান অথবা জাতীয় সংসদের সদস্য হন।
ব্যাখ্যা এই ধারার আর্থিক প্রতিষ্ঠান বলিতে কোন নন-ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে বুঝাইবে।

৭। **গ্রাম পরিষদের কার্যালয় :–** গ্রাম পরিষদের আওতাভুক্ত এলাকায়, গ্রাম পরিষদের চেয়ারম্যানের সহিত পরামর্শক্রমে, পরিচালনাকারী কর্তৃপক্ষ গ্রাম পরিষদের কার্যালয় কোথায় স্থাপিত হইবে তাহা নির্ধারণ করিবে।

৮। **গ্রাম পরিষদের সভা :–** (১) গ্রাম পরিষদ, পরিচালনাকারী কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে, এর কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিবে।

(২) গ্রাম পরিষদ প্রতি ৩ মাসে অন্যূন একবার সভায় মিলিত হইবে এবং চেয়ারম্যান যে কোন সময় গ্রাম পরিষদের বিশেষ সভা আহবান করিতে পারিবে।

(৩) চেয়ারম্যান গ্রাম পরিষদের সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন এবং তাহার অনুপস্থিতিতে সভায় উপস্থিত সদস্যগণের সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে নির্বাচিত কোন সদস্য সভাপতিত্ব করিবেন।

(৪) গ্রাম পরিষদের সকল সভা চেয়ারম্যান কর্তৃক নির্ধারিত স্থান ও সময়ে অনুষ্ঠিত হইবে তবে শর্ত থাকে যে, বিশেষ কারণ না থাকিলে গ্রাম পরিষদের কার্যালয়ে সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

(৫) অন্যূন ৫ জন সদস্যের উপস্থিতিতে গ্রাম পরিষদের সভার কোরাম গঠিত হইবে।

৯। চেয়ারম্যান, ইত্যাদির পদত্যাগ :–(১) পরিচালনাকরী কর্তৃপক্ষের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রে চেয়ারম্যান এবং চেয়ারম্যানের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে কোন সদস্য স্বীয় পদ ত্যাগ করিতে পারিবেন।

(২) পদত্যাগপত্র গৃহীত হইবার তারিখ হইতে পদত্যাগ কার্যকর হইবে এবং পদত্যাগকারীর পদ শূন্য হইবে।

১০। সদস্যের অপসারণ :– পরিচালনাকারী কর্তৃপক্ষ, যথাযথ তদন্তের পর, কোন সদস্যকে তাঁহার পদ হইতে অপসারণ করিতে পারিবে, যদি তিনি–

(ক) শারীরিক বা মানসিক অসামর্থের কারণে তাহার দায়িত্ব পালনে অক্ষম হন ;

(খ) অসাদাচরনের অভিযোগে দোষী হন বা ধারা ৬ এর অধীনে সদস্য হইবার অযোগ্য হইয়া পড়েন ;

(গ) ফৌজদারী অভিযোগে দোষী সব্যস্ত হইয়া আদালত কর্তৃক সাজাপ্রাপ্ত হন।
ব্যাখ্যা: অসদাচরন বলিতে ক্ষমতার অপব্যবহার, দুর্ননীতি, স্বজনপ্রীতি বা ইচ্ছাকৃত কুশসন বুঝাইবে।

১১। অস্থায়ী চেয়ারম্যান :– চেয়ারম্যনের পদ শূন্য হইলে কিংবা তাহার অনুপস্থিতি বা অসুস্থতা জন্য কোন কারণে তিনি দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হইলে শূন্য পদে নির্বাচিত চেয়ারম্যান কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত কিংবা চেয়ারম্যান পুনরায় স্বীর দায়িত্ব পালনে সমর্থ না হওয়া পর্যন্ত, পরিচালনাকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মনোনীত কোন ব্যক্তি চেয়ারম্যানরূপে দায়িত্ব পালন করিবেন।

১২। সদস্যের পদ শূন্য হওয়া :– কোন সদস্যের পদ শূন্য হইবে, যদি

(ক) তিনি ধারা ৬ এর অধীনে তাহার পদে থাকার অযোগ্য হন ;

(খ) তিনি ধারা ৯ এর অধীনে স্বীয় পদত্যাগ করেন বা ধারা ১০ এর অধীনে অপসারিত হন ;

(গ) তিনি মৃত্যুবরণ করেন ;

(ঘ) তিনি যুক্তিসংগত কারণ ব্যতিরেকে গ্রাম পরিষদের পর পর ৩টি সভায় অনুপস্থিত থাকেন ;

(ঙ) তিনি নৈতিক স্খলনজনিত কোন ফৌজদারী অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইয়া আদালত কর্তৃক অন্যূন দুই বৎসরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন।

১৩। সদসের শূন্য পদ পূরণ :– কোন সদস্যের পদ শূন্য হইলে, পরিচালনাকারী কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে, ধারা ৫ এর উপ-ধারা (৩) এর অধীনে অনুষ্ঠিত সাধারণ সভায় নির্বাচনের মাধ্যমে উক্ত শূন্য পদ পূরণ করিবেন।

১৪। গ্রাম পরিষদের কার্যাবলী :– গ্রাম পরিষদের কার্যাবলী হইবে নিম্নরূপ, যথা :–

(ক) পরিচালনাকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময় সময় নির্ধারিত আর্থ-সামাজিক বিষয়ে জরিপভিত্তিক প্রতিবেদন তৈরী করা ;

(খ) জন্ম-মৃত্যু, বিবাহ এবং বিবাহ-বিচ্ছেদ সম্পর্কিত প্রাথমিক হিসাব সংগ্রহ ও সংযুক্ত করা এবং ইউনিয়ন পরিষদে প্রেরণ করা ;

(গ) প্রাথমিক বিদ্যালয় মাদ্রাসা ও মক্তবে শিক্ষাদান পাঠক্রমের খোঁজ-খবর রাখা এবং সে সম্পর্কে ইউনিয়ন পরিষদে প্রতিবেদন প্রেরণ করা ;

(ঘ) প্রাথমিক বিদ্যালয়গামী সকল শিশুকে বিদ্যালয়ে প্রেরণের জন্য অভিভাবকের উদ্বুদ্ধ করা এবং কোন শিশুকে বিদ্যালয়ে প্রেরণে অভিভাবককে উদ্বুদ্ধ করিতে ব্যর্থ হইলে তৎসম্পর্কে ইউনিয়ন পরিষদে প্রতিবেদন প্রেরণ করা ;

(ঙ) পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচী বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে সাহায্য সহযোগিতা করা এবং মাঠ পর্যায়ে উক্ত কর্মসূচীতে কর্মরত কর্মচারীদের কাজ সম্পর্কে ইউনিয়ন পরিষদে প্রতিবেদন পেশ করা ;

(চ) পানীয় জল সরবরাহ এবং স্বাস্থ্যসম্মত লেট্রিন কর্মসূচী বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় সহায়তা করা ;

(ছ) নারী নির্যাতন, সন্ত্রাস, চুরি, ডাকাতি ইত্যাদি অপরাধ সংঘটিত হওয়ার বিরুদ্ধে সম্মিলিত প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গড়ে তোলাসহ সুষ্ঠু, আইন-শৃংখলা নিশ্চিত করা এবং এই সম্পর্কে যে কোন পরিস্থিতি ইউনিয়ন পরিষদে রিপোর্ট করা ;

(জ) স্থানীয় পর্যায়ে সার, উন্নতমানের বীজ এবং কীটনাশক সরবরাহ সম্বন্ধে নিয়মিত অবহিত থাকা এবং এই বিষয়ে সংকট দেখা দিলে সঙ্গে সঙ্গে ইউনিয়ন পরিষদ এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা ;

(ঝ) স্বীয় এলাকার সকল সরকারী, আধা-সরকারী বা বেসরকারী সংস্থার কর্মচারীদের তৎপরতা সম্পর্কে ইউনিয়ন পরিষদে প্রতিবেদন প্রেরণ করা ;

(ঞ) গ্রামে শান্তি ও শৃংখলা বজায় রাখার উদ্দেশ্যে গ্রাম্য বিবাদ-বিসংবাদ আপোষ-নিষ্পত্তি করা ;

(ট) আইন-শৃংখলা নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষকে সহায়তা প্রদান করা ;

(ঠ) গ্রামের অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে সমবায় সমিতি গঠন, ক্ষুদ্র শিল্প স্থাপন, হাঁস-মুরগীর খামার প্রতিষ্ঠা, মৎস্য চাষ, পশুপালন ও বৃক্ষরোপণ সম্পর্কে গ্রামের জনগণকে উৎসাহ প্রদান ;

(ড) গ্রামীণ জনগণের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে যে কোন কল্যাণধর্মী কার্যক্রম গ্রহণ করা ;

(ঢ) সরকার কর্তৃক সময় সময় নির্ধারিত অন্যান্য কার্য করা।

১৫। স্থায়ী কমিটি :– গ্রাম পরিষদ প্রয়োজন অনুযায়ী বিষয়ভিত্তিক স্থায়ী কমিটি গঠন করতে পারিবে এবং উক্ত কমিটির সদস্য সংখ্যা নির্ধারণ করিবে এবং উক্ত কমিটির সদস্য সংখ্যা নির্ধারণ করিবে।

১৬। ব্যয়ভার বহন :– অর্থ-সামাজিক জরিপ, জন্ম-মৃত্যু, বিবাহ, বিবাহ-বিচ্ছেদ, ইত্যাদি সম্পর্কিত তথ্যসহ ইউনিয়ন পরিষদের কর্যাবলী অন্তর্ভুক্ত বিষয়ে সহয়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে গ্রাম পরিষদ অন্যান্য যেসব কার্যাবলী সম্পাদন করিবে, সেইসব কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় কাগজ, কলম কালি, রেজিষ্টার ইত্যাদি ক্রয়ের খরচ বাবদ ইউনিয়ন পরিষদ পরিচালনাকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত অর্থ, গ্রাম পরিষদকে প্রদান করিবে।

১৭। বিধি প্রণয়ন :– এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারী গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

১৮। রহিতকরণ :– পল্লী পরিষদ আইন, ১৯৮৯ (১৯৮৯ সনের ৩৩ নং আইন) এতদ্বারা রহিত করা হইল।

খোন্দকার আবদুল হক
ভারপ্রাপ্ত সচিব।

পরিশিষ্ট -৩

গ্রাম সরকার আইন, ২০০৩

যেহেতু তৃণমূল পর্যায়ে গ্রামীণ জনগণকে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করা ও তাঁহাদের সার্বিক উন্নয়ন নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে ইউনিয়ন পরিষদের সহায়ক সংগঠন হিসাবে প্রতিনিধিত্বমূলক গ্রাম সরকার গঠন করিয়া গ্রামীণ জনগণের সার্বিক উন্নয়ন নিশ্চিত করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:-

সংক্ষিপ্ত শিরোনামা

১. এই আইন গ্রাম সরকার আইন, ২০০৩ নামে অভিহিত হইবে।

সংজ্ঞা

২. বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে,-

(ক) "অস্থায়ী গ্রাম সরকার প্রধান" অর্থ ধারা ১৪(৩) এ উল্লিখিত অস্থায়ী গ্রাম সরকার প্রধান;

(খ) "ইউনিয়ন" অর্থ Local Government (Union Parishads) Ordinance, 1983 (Ordinance No. LI of 1983) এর section 3 এর অধীন ঘোষিত কোন ইউনিয়ন;

(গ) "উপদেষ্টা" অর্থ গ্রাম সরকারের উপদেষ্টা;

(ঘ) "ওয়ার্ড" অর্থ Local Government (Union Parishads) Ordinance, 1983 (Ordinance No. LI of 1983) এর section 18 এর sub-section (১) এ উল্লিখিত ওয়ার্ডসমূহের একটি;

(ঙ) "গ্রাম" অর্থ প্রত্যেক ওয়ার্ডের এলাকাভুক্ত মৌজা বা মৌজাসমূহের সমষ্টি;

(চ) "গ্রাম সরকার" অর্থ ধারা ৪ এর অধীন গঠিত গ্রাম সরকার;

(ছ) "গ্রাম সরকার প্রধান" অর্থ গ্রাম সরকারের গ্রাম সরকার প্রধান এবং অস্থায়ী গ্রাম সরকার প্রধানরূপে দায়িত্ব পালনকারী কোন ব্যক্তি;

(জ) "সদস্য" অর্থ গ্রাম সরকারের সদস্য;

(ঝ) "সংরক্ষিত আসন" অর্থ Local Government (Union Parishads)

Ordinance, 1983 (Ordinance No. LI of 1983) এর section 5 এর sub-section (3) তে উল্লিখিত সংরক্ষিত আসন;

(ঞ) "পরিচালনাকারী কর্তৃপক্ষ" অর্থ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বা সার্কেল অফিসার বা তদ্‌কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি

গ্রাম সরকার প্রতিষ্ঠা

৩. (১) এই আইনের বিধান অনুসারে প্রত্যেক ওয়ার্ডে একটি করিয়া গ্রাম সরকার থাকিবে

(২) সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের নামের পর ওয়ার্ড নম্বরের সূচকে গ্রাম সরকারের নাম হইবে

(৩) গ্রাম সরকার একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হইবে এবং ইহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও একটি সাধারণ সীলমোহর থাকিবে এবং, এই আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে, ইহার স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করিবার, অধিকারে রাখিবার এবং হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা থাকিবে এবং ইহার নামে ইহা মামলা দায়ের করিতে পারিবে বা ইহার বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের করা যাইবে

(৪) এই আইনের অধীন গ্রাম সরকার সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৫২ (১) এ সংজ্ঞায়িত প্রশাসনিক একাংশ হিসাবে গণ্য হইবে না; তবে ইহা ইউনিয়ন পরিষদের সহায়ক সংগঠন হইবে

গ্রাম সরকার গঠন

৪. (১) একজন গ্রাম সরকার প্রধান, একজন উপদেষ্টা ও তেরজন সদস্য সমন্বয়ে প্রত্যেক ওয়ার্ডে একটি করিয়া গ্রাম সরকার গঠিত হইবে

(২) সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের জন্য ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য গ্রাম সরকার প্রধান হইবেন এবং ইউনিয়ন পরিষদের সংরক্ষিত আসনের সদস্য সংশ্লিষ্ট গ্রাম সরকারের উপদেষ্টা হইবেন

(৩) ইউনিয়ন পরিষদের সংরক্ষিত আসনের সদস্য তাঁহার আঞ্চলিক নির্বাচনী এলাকাধীন সকল গ্রাম সরকারের উপদেষ্টা হইবেন

(৪) নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিগণ সদস্য হিসাবে মনোনীত হইবেন-

(ক) একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি;

(খ) একজন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর মহিলা সদস্যসহ তিনজন মহিলা;

(গ) একজন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর পুরুষ সদস্য;

(ঘ) একজন কৃষক;

(ঙ) দুইজন ভূমিহীন কৃষক;

(চ) একজন সমবায় সমিতির সদস্য;

(ছ) একজন মুক্তিযোদ্ধা;

(জ) একজন শিক্ষক;

(ঝ) একজন ব্যবসায়ী; এবং

(ঞ) একজন চিকিৎসক বা পেশাজীবী:

তবে শর্ত থাকে যে, এক বা একাধিক অনুচ্ছেদের প্রতিনিধি পাওয়া না গেলে তদ্‌স্থলে অনুচ্ছেদ (ঘ) এর কৃষকের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া তাহা পূরণ করিতে হইবে

(৫) ওয়ার্ডের ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্ত আছে এমন ভোটারদের অন্যূন এক দশমাংশের উপস্থিতিতে সাধারণ সভায় সমঝোতার ভিত্তিতে, পরিচালনাকারী কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে ও সভাপতিত্বে, সদস্যগণ মনোনীত হইবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত মনোনয়নের ক্ষেত্রে কোন মতদ্বৈততা দেখা দিলে পরিচালনাকারী কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে

গ্রাম সরকার গঠনের সময়

৫. নিম্নবর্ণিত সময়ে গ্রাম সরকার গঠন করা হইবে, যথা:-

(ক) প্রথমবার গঠনের ক্ষেত্রে, সরকার সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা যে তারিখ নির্ধারণ করিবে সেই তারিখে;

(খ) মেয়াদ শেষ হইবার ক্ষেত্রে, উক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পূর্ববর্তী একশত আশি দিনের মধ্যে;

(গ) ধারা ২৪ এর অধীন বাতিল হইবার ক্ষেত্রে, বাতিলাদেশ জারির পরবর্তী নব্বই দিনের মধ্যে

গ্রাম সরকারের মেয়াদ

৬. গ্রাম সরকারের মেয়াদ হইবে উহার প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হইবার তারিখ হইতে ৫ (পাঁচ) বৎসর।

সদস্যপদে শূন্যতার কারণে গ্রাম সরকার গঠন বা কার্যধারা অবৈধ না হওয়া

৭. শুধুমাত্র কোন সদস্যপদে শূন্যতা বা গ্রাম সরকার গঠনে ত্রুটি থাকার কারণে কোন গ্রাম সরকার বা উহার কার্যধারা অবৈধ হইবে না বা তৎসম্পর্কে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না

শপথ গ্রহণ

৮. (১) গ্রাম সরকার প্রধান, উপদেষ্টা ও প্রত্যেক সদস্য দায়িত্বভার গ্রহণের পূর্বে পরিচালনাকারী কর্তৃপক্ষের সম্মুখে তফসিলে উল্লেখিত ফরমে শপথ গ্রহণ করিবেন এবং শপথ পত্রে স্বাক্ষর দান করিবেন।

(২) ধারা ৪ এর অধীন গ্রাম সরকার গঠনের ত্রিশ দিনের মধ্যে শপথ গ্রহণের জন্য পরিচালনাকারী কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

সদস্যের অযোগ্যতা

৯. কোন ব্যক্তি গ্রাম সরকারের সদস্য হইবার বা থাকিবার যোগ্য হইবেন না, যদি-

(ক) তিনি বাংলাদেশের নাগরিকত্ব পরিত্যাগ করেন বা হারান;

(খ) কোন আদালত তাঁহাকে অপ্রকৃতিস্থ বলিয়া ঘোষণা করে;

(গ) তিনি সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের আঞ্চলিক এলাকার বাহিরে স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য স্বীয় গ্রাম ত্যাগ করেন;

(ঘ) তিনি নৈতিক স্খলনজনিত কোন ফৌজদারী অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইয়া আদালত কর্তৃক অন্যূন এক বৎসরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন এবং তাঁহার মুক্তিলাভের পর পাঁচ বৎসর কাল অতিবাহিত না হইয়া থাকে;

(ঙ) সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের ভোটার তালিকায় তাঁহার নাম অন্তর্ভুক্ত না থাকে;

(চ) তিনি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান হন বা থাকেন; অথবা

(ছ) তাঁহার নিকট কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান হইতে গৃহীত কোন ঋণ মেয়াদোত্তীর্ণ অবস্থায় অনাদায়ী থাকে;

ব্যাখ্যা- এই ধারায় আর্থিক প্রতিষ্ঠান বলিতে আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সনের ২৭ নং আইন) এর ধারা ২(খ)-তে সংজ্ঞায়িত আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে বুঝাইবে

সদস্যের পদত্যাগ

১০. (১) গ্রাম সরকার প্রধানের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে কোন সদস্য স্বীয় পদ ত্যাগ করিতে পারিবেন

(২) গ্রাম সরকার প্রধান যে তারিখে পত্র পাইবেন সেই তারিখ হইতে পদত্যাগ কার্যকর হইবে এবং পদত্যাগকারীর পদ শূন্য হইবে

সদস্যের অপসারণ

১১. পরিচালনাকারী কর্তৃপক্ষ, যথাযথ তদন্তের পর, কোন সদস্যকে তাঁহার পদ হইতে অপসারণ করিবেন, যদি তিনি-

(ক) যথোপযুক্ত কারণ ব্যতিরেকে গ্রাম সরকারের পর পর তিনটি সভায় অনুপস্থিত থাকেন;

(খ) শারীরিক বা মানসিক অসামর্থের কারণে দায়িত্ব পালনে অক্ষম হন বা দায়িত্ব পালনে অস্বীকৃতি জানান; বা

(গ) অসদাচরণের দায়ে দোষী হন বা ধারা ৯ এর অধীন সদস্য হইবার অযোগ্য হইয়া পড়েন

ব্যাখ্যা- এই ধারার অধীন "অসদাচরণ" বলিতে ক্ষমতার অপব্যবহার, দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি বা নৈতিক স্খলনকে বুঝাইবে

পদ শূন্য হওয়া

১২. (১) কোন সদস্যের পদ শূন্য হইবে, যদি তিনি-

(ক) ধারা ৮ এর অধীন নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শপথ গ্রহণে ব্যর্থ হন;

(খ) পরিচালনাকারী কর্তৃপক্ষের তদন্তে, ধারা ৯ এর অধীন, সদস্য হইবার অযোগ্য হইয়া থাকেন;

(গ) ধারা ১০ এর অধীন স্বীয় পদ ত্যাগ করেন;

(ঘ) ধারা ১১ এর অধীন তাঁহার পদ হইতে অপসারিত হন;

(ঙ) মৃত্যুবরণ করেন

(২) কোন গ্রাম সরকার প্রধান বা উপদেষ্টার পদ শূন্য হইবে যদি Local Government (Union Parishads) Ordinance, ১৯৮৩ (Ordinance No. LI of 1983) এর section 13 এর বিধান মোতাবেক তাঁহার ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য পদ শূন্য হয়

(৩) গ্রাম সরকার প্রধান, উপদেষ্টা বা কোন সদস্যের পদ শূন্য হইলে পরিচালনাকারী কর্তৃপক্ষ অবিলম্বে উক্ত পদ শূন্য ঘোষণা করিয়া বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিবেন

সদস্যের শূন্য পদ পূরণ

১৩. কোন সদস্যের পদ শূন্য হইলে, পরিচালনাকারী কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে, ধারা ৪ এর উপ-ধারা (৫) এর বিধান অনুসরণক্রমে উক্ত পদ পূরণ করা হইবে

প্যানেল ও অস্থায়ী গ্রাম সরকার প্রধান

১৪. (১) গ্রাম সরকার উহার প্রথম সভায় তিন জন সদস্য সমন্বয়ে একটি প্যানেল গঠন করিবে

(২) প্যানেলে অন্যূন একজন মহিলা সদস্য থাকিবেন

(৩) গ্রাম সরকার প্রধানের পদ শূন্য হইলে কিংবা তাঁহার অনুপস্থিতিতে বা অসুস্থতা বা অন্য কোন কারণে তিনি দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হইলে, শূন্য পদে গ্রাম সরকার প্রধান কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত কিংবা গ্রাম সরকার প্রধান পুনরায় স্বীয় দায়িত্ব পালনে সমর্থ না হওয়া পর্যন্ত, উপদেষ্টা, বা তাঁহার অনুপস্থিতিতে প্যানেলভুক্ত সদস্যদের মধ্যে যাহার নাম শীর্ষে থাকে, বা তাহার অনুপস্থিতিতে ক্রমানুসারে পরবর্তী সদস্য গ্রাম সরকার প্রধান হিসাবে দায়িত্ব পালন করিবেন এবং উক্ত দায়িত্ব পালনকারী ব্যক্তি উক্ত সময়ে অস্থায়ী গ্রাম সরকার প্রধান বলিয়া গণ্য হইবেন

গ্রাম সরকারের কার্যালয়

১৫. গ্রাম সরকারের আওতাভুক্ত এলাকায় পরিচালনাকারী কর্তৃপক্ষ, গ্রাম সরকার প্রধানের সহিত পরামর্শক্রমে, গ্রাম সরকারের কার্যালয়ের স্থান নির্ধারণ করিবে

গ্রাম সরকারের কার্যাবলী

১৬. (১) গ্রাম সরকারের কার্যাবলী হইবে নিম্নরূপ, যথা:-

(ক) গ্রামের রাস্তা-ঘাট, কালভার্ট ইত্যাদি উন্নয়নের জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পরিকল্পনা প্রণয়ন, চলমান প্রকল্পের অগ্রগতি ও আর্থিক বিষয়াদি পর্যালোচনা করা;

(খ) নারী নির্যাতন, সন্ত্রাস, চুরি, ডাকাতি ইত্যাদি অপরাধ সংঘটিত হওয়ার বিরুদ্ধে সম্মিলিত প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গড়ে তোলাসহ সুষ্ঠু আইন-শৃঙ্খলা নিশ্চিত করা এবং এতদ্‌সংক্রান্ত প্রতিবেদন ইউনিয়ন পরিষদে পেশ করা;

(গ) নিরক্ষরতা দূরীকরণার্থে সরকার কর্তৃক গৃহীতব্য কর্মসূচি তদারক করা এবং

প্রাথমিক বিদ্যালয়, মাদ্রাসা ও মক্তবে শিক্ষাদান পাঠক্রমের খোঁজ-খবর রাখা ও সেই সম্পর্কে ইউনিয়ন পরিষদে প্রতিবেদন প্রেরণ করা;

(ঘ) প্রাথমিক বিদ্যালয়গামী সকল শিশুকে বিদ্যালয়ে প্রেরণের জন্য অভিভাবকদের উদ্বুদ্ধ করা এবং কোন শিশুকে বিদ্যালয়ে প্রেরণে অভিভাবককে উদ্বুদ্ধ করিতে ব্যর্থ হইলে তত্‌সম্পর্কে ইউনিয়ন পরিষদে প্রতিবেদন প্রেরণ করা;

(ঙ) পুষ্টি ও টীকাদান কর্মসূচিসহ প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচি বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে সাহায্য-সহযোগিতা করা এবং মাঠ পর্যায়ে উক্ত কর্মসূচিতে কর্মরত কর্মচারীদের কাজ সম্পর্কে ইউনিয়ন পরিষদে প্রতিবেদন পেশ করা;

(চ) পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে সাহায্য-সহযোগিতা করা এবং মাঠ পর্যায়ে উক্ত কর্মসূচিতে কর্মরত কর্মচারীদের কাজ সম্পর্কে ইউনিয়ন পরিষদে প্রতিবেদন পেশ করা;

(ছ) বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ এবং স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন কর্মসূচি বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় সহায়তা করা;

(জ) জন্ম-মৃত্যু, বিবাহ এবং বিবাহ বিচ্ছেদ সম্পর্কিত প্রাথমিক হিসাব সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা এবং ইউনিয়ন পরিষদে প্রেরণ করা;

(ঝ) কৃষি উন্নয়নের লক্ষ্যে স্থানীয় পর্যায়ে সার, উন্নতমানের বীজ এবং কীটনাশক সরবরাহ সম্বন্ধে নিয়মিতভাবে অবহিত থাকা এবং এই বিষয়ে সংকট দেখা দিলে সংগে সংগে ইউনিয়ন পরিষদ এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা;

(ঞ) আইন-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষকে সহায়তা প্রদান করা এবং গ্রামে শান্তি ও শৃংখলা বজায় রাখার উদ্দেশ্যে গ্রাম্য বিবাদ-বিসম্বাদ আপোষে নিষ্পত্তির চেষ্টা করা;

(ট) ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নে কার্যক্রম গ্রহণ করা;

(ঠ) গ্রামের অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে সমবায় সমিতি গঠন, ক্ষুদ্র শিল্প স্থাপন, হাঁস-মুরগীর খামার প্রতিষ্ঠা, মৎস্য চাষ ও পশুপালন সম্পর্কে গ্রামের জনগণকে উৎসাহ প্রদান করা;

(ড) বৃক্ষরোপণ ও পরিবেশ সংরক্ষণ সম্পর্কে গ্রামের জনগণকে উৎসাহ প্রদান করা;

(ঢ) মহিলা ও শিশুসহ গ্রামীণ জনগণের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে যে কোন কল্যাণধর্মী কার্যক্রম গ্রহণ করা;

(ণ) ভিজিএফ ও ভিজিটি কার্যক্রম তদারক করা; এবং

(ত) সরকার কর্তৃক সময় সময় নির্ধারিত অন্যান্য কার্য সম্পাদন করা

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন অনুচ্ছেদ (ক) ও (খ) এ বর্ণিত বিষয়সমূহের দায়িত্বে থাকিবেন যথাক্রমে গ্রাম সরকার প্রধান ও উপদেষ্টা এবং অনুচ্ছেদ (গ) হইতে (ণ) পর্যন্ত বিষয়সমূহের এক একটির দায়িত্বে থাকিবেন একেকজন সদস্য:

তবে শর্ত থাকে যে, উপদেষ্টার পদ শূন্য হইলে বা থাকিলে শূন্য পদ পূরণ না হওয়া পর্যন্ত গ্রাম সরকার প্রধান তাঁহার দায়িত্বে থাকিবেন এবং কোন সদস্যপদ শূন্য হইলে বা থাকিলে শূন্য পদ পূরণ না হওয়া পর্যন্ত গ্রাম সরকার অন্য কোন সদস্যের উপর উক্ত দায়িত্ব অর্পণ করিতে পারিবে

গ্রাম সরকারের সভা

১৭. (১) গ্রাম সরকার, পরিচালনাকারী কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে, সভার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিবে

(২) গ্রাম সরকার প্রতি দুইমাসে অন্যূন একবার সভায় মিলিত হইবে এবং গ্রাম সরকার প্রধান স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া অথবা অন্যূন আট জন সদস্যের আবেদনক্রমে যে কোন সময় বিশেষ সভা আহ্বান করিতে পারিবেন

(৩) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত সভার ক্ষেত্রে সদস্যদেরকে অন্ততঃ তিন দিন পূর্বে নোটিশ দিতে হইবে এবং নোটিশে সভার বিষয়সূচি উল্লেখ থাকিতে হইবে

(৪) গ্রাম সরকার প্রধান গ্রাম সরকারের সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন এবং তাঁহার অনুপস্থিতিতে উপদেষ্টা অথবা উপদেষ্টার অনুপস্থিতিতে সভায় উপস্থিত ধারা ১৪(১) এর অধীন প্যানেলভুক্ত কোন সদস্য সভার সভাপতিত্ব করিবেন

(৫) গ্রাম সরকারের সকল সভা গ্রাম সরকার প্রধান কর্তৃক নির্ধারিত স্থান ও সময়ে অনুষ্ঠিত হইবে

(৬) মোট সদস্য সংখ্যার অন্যূন এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতিতে গ্রাম সরকারের সভার কোরাম হইবে

(৭) গ্রাম সরকারের সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণে গ্রাম সরকার প্রধান, উপদেষ্টা ও সদস্যের একটি করিয়া ভোট থাকিবে এবং সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, ভোটের সমতার ক্ষেত্রে সভাপতি দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট প্রদান করিবেন

(৮) গ্রাম সরকার কর্তৃক আমন্ত্রিত হইলে প্রত্যেক ওয়ার্ডের আঞ্চলিক এলাকায় কর্মরত সরকারী দপ্তর, বিভাগ এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণ গ্রাম সরকারের সভায় উপস্থিত থাকিতে ও আলোচনায় অংশগ্রহণ করিতে পারিবেন; তবে তাঁহাদের ভোটাধিকার থাকিবে না

(৯) সভাপতি কর্তৃক সভার কার্যবিবরণী স্বাক্ষরিত হইবে

সাধারণ সভা

১৮. (১) ওয়ার্ডের ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্ত আছে এমন ভোটারদের অন্যূন এক দশমাংশের উপস্থিতিতে প্রতি ছয় মাসে অন্যূন একবার সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হইবে

(২) সাধারণ সভা অনুষ্ঠানের তারিখ, সময় এবং স্থান সম্পর্কে নোটিশ দিতে হইবে

(৩) সভায় সংশ্লিষ্ট এলাকার চলমান উন্নয়ন কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা এবং ধারা ১৯ এর বিধান মোতাবেক কমিটি গঠনসহ ধারা ১৬ এ বর্ণিত যে কোন বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইবে

(৪) সভায় ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানকে আমন্ত্রণ জানাইতে হইবে

কমিটি গঠন

১৯. (১) গ্রাম সরকার ধারা ১৬ এ উল্লিখিত প্রতিটি বিষয়ে একটি করিয়া কমিটি ও প্রয়োজনে সাব-কমিটি গঠন করিবে

(২) কমিটির সভাপতি হইবেন গ্রাম সরকার প্রধান বা উপদেষ্টা বা সদস্য এবং কমিটির সদস্য হইবেন, গ্রাম সরকারের সদস্য নহেন অথচ বিশেষ যোগ্যতা আছে, ওয়ার্ডের ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্ত আছে এমন ভোটার

(৩) সভাপতি সহ কমিটির সদস্য সংখ্যা হইবে পাঁচ জন

(৪) কমিটি যখন প্রয়োজন মনে করিবে তখন উহার সভা আহ্বান করিতে পারিবে

(৫) সভাপতি সহ অন্যূন তিন জনের উপস্থিতিতে কমিটির কোরাম হইবে এবং সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে:
তবে শর্ত থাকে যে, ভোটের সমতার ক্ষেত্রে সভাপতি নির্ণায়ক ভোট প্রদান করিবেন

(৬) সভাপতি কমিটির সভায় সভাপতিত্ব করিবেন এবং তাহার অনুপস্থিতিতে সদস্যগণ তাহাদের নিজেদের মধ্য হইতে একজনকে সভাপতি নিযুক্ত করিবেন

(৭) সভাপতি কার্যবিবরণীতে স্বাক্ষর করিবেন এবং ৭ দিনের মধ্যে উহার অনুলিপি গ্রাম সরকারের নিকট প্রেরণ করিবেন

ব্যয়ভার

২০. জন্ম-মৃত্যু, বিবাহ, বিবাহ-বিচ্ছেদ ইত্যাদি সম্পর্কিত তথ্যসহ ইউনিয়ন পরিষদের কার্যাবলীর অন্তর্ভুক্ত বিষয়ে সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে গ্রাম সরকার যে সব কার্যাবলী সম্পাদন করিবে সেইসব কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় কাগজ, কলম, কালি, রেজিস্টার ইত্যাদি ক্রয়ের খরচ বাবদ ইউনিয়ন পরিষদ নিজ আয়ের একটি অংশ প্রতি বৎসর গ্রাম সরকারকে প্রদান করিবে

তহবিল

২১. প্রত্যেক গ্রাম সরকারের গ্রাম সরকার তহবিল নামে একটি তহবিল থাকিবে এবং তাহাতে নিম্নবর্ণিত অর্থ জমা হইবে, যথা:-

(ক) ইউনিয়ন পরিষদ হইতে প্রাপ্ত অর্থ; এবং

(খ) অন্য কোন উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ

পরিদর্শন

২২. উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান, পরিচালনাকারী কর্তৃপক্ষ ও ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান গ্রাম সরকারের কাজ-কর্ম পরিদর্শন করিতে পারিবেন

গ্রাম সরকারের কার্যাবলী সম্পর্কে তদন্ত

২৩. জেলা প্রশাসক স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া অথবা ধারা ২২ এর বিধান মোতাবেক পরিদর্শন শেষে পরিদর্শনকারী অথবা কোন ব্যক্তির আবেদনের ভিত্তিতে, গ্রাম সরকারের কার্যাবলী সাধারণভাবে অথবা তৎসংক্রান্ত কোন বিশেষ বিষয়ে তদন্ত করিবার জন্য কোন কর্মকর্তাকে ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন এবং উক্ত তদন্ত রিপোর্টের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন

গ্রাম সরকার বাতিলকরণ

২৪. (১) যদি প্রয়োজনীয় তদন্তের পর জেলা প্রশাসক এইরূপ অভিমত পোষণ করেন যে, কোন গ্রাম সরকার-

(ক) উহার দায়িত্ব পালনে অসমর্থ অথবা ক্রমাগতভাবে উহার দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হইতেছে;

(খ) উহার প্রশাসনিক ও আর্থিক দায়িত্ব পালনে অসমর্থ;

(গ) সাধারণতঃ এইরূপ কাজ করে যাহা জনস্বার্থ বিরোধী; অথবা

(ঘ) অন্য কোনভাবে উহার ক্ষমতার সীমা লংঘন বা ক্ষমতার অপব্যবহার করিয়াছে বা করিতেছে;

তাহা হইলে জেলা প্রশাসক, উক্ত গ্রাম সরকার বাতিল ঘোষণা করিয়া বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত আদেশ প্রদানের পূর্বে গ্রাম সরকারকে উহার বিরুদ্ধে কারণ দর্শানোর সুযোগ প্রদান করিতে হইবে

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন গ্রাম সরকার বাতিল হইলে পরিচালনাকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গঠিত এডহক কমিটি গ্রাম সরকারের দায়িত্ব পালন করিবে

(৩) ওয়ার্ডের ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্ত আছে এমন ভোটারদের সমন্বয়ে এডহক কমিটি গঠিত হইবে

বিধি প্রণয়ন

২৫. এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে

অসুবিধা দূরীকরণ

২৬. এই আইনের বিধানাবলী কার্যকর করিবার ক্ষেত্রে উক্ত বিধানে কোন অস্পষ্টতার কারণে অসুবিধা দেখা দিলে সরকার উক্ত অসুবিধা দূরীকরণার্থে সরকারী গেজেটে প্রকাশিত আদেশ দ্বারা প্রয়োজনীয় যে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে

রহিতকরণ

২৭. স্থানীয় সরকার (গ্রাম পরিষদ) আইন, ১৯৯৭ (১৯৯৭ সনের ২১ নং আইন) এতদ্বারা রহিত করা হইল

টীকা

[১] এ প্রশ্নটি আরও ধাঁধাময় কেননা মাত্র কিছুকাল আগেই বঙ্গবন্ধুর মন্ত্রীসভা থেকে আওয়ামী লীগের মধ্যে অপেক্ষাকৃত বামধারার সমর্থক বলে পরিচিত তাজউদ্দীন আহমদকে পদত্যাগ করতে হয়েছিল।

[২] দ্রষ্টব্য Islam (2016a)।

[৩] বলাবাহুল্য যে, এ দুই দিক পরস্পর সম্পর্কিত।

[৪] বঙ্গবন্ধুর *অসমাপ্ত আত্মজীবনী* থেকে উদ্ধৃত নিম্নের উক্তিগুলো থেকে এই মনোভাবটির পরিচয় পাওয়া যায়ঃ

> "হিন্দু মহাজন ও জমিদারদের অত্যাচারেও বাংলার মুসলমানেরা অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল (রহমান ২০১২, পৃ. ২৩)।"
> "কেমন করে ব্রিটিশরাজ মুসলমানদের কাছ থেকে ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছিল, কি করে রাতারাতি মুসলমানদের সর্বস্বান্ত করে হিন্দুদের সাহায্য করেছিল, মুসলমানেরা ব্যবসা-বাণিজ্য, জমিদারী, সিপাহী চাকরি থেকে কিভাবে বিতাড়িত হলো – মুসলমানদের স্থান হিন্দুদের দ্বারা পুরণ করতে শুরু করেছিল ইংরেজরা (ঐ, পৃ. ২২-২৩)।"
> "আমি যখন কোনো হিন্দু বন্ধুর বাড়িতে বেড়াতে যেতাম, আমাকে অনেক সময় তাদের ঘরের মধ্যে নিতে সাহস করতো না আমার সহপাঠীরা (ঐ, পৃ. ২৩)।"

[৫] বঙ্গবন্ধুর নিজের ভাষায়, "এই সময় (১৯৪৩) থেকে মুসলিম লীগের মধ্যে দুইটা দল মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। একটা প্রগতিবাদী দল, আর একটা প্রতিক্রিয়াশীল। শহীদ সাহেবের নেতৃত্বে আমরা বাংলার মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরা মুসলিম লীগকে জনগণের লীগে পরিণত করতে চাই। মুসলিম লীগ তখন পর্যন্ত জনগণের প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয় নাই। জমিদার, জোতদার, ও খান বাহাদুর নবাবদের প্রতিষ্ঠান ছিল। কাউকে লীগে আসতে দিত না। জেলায় জেলায় খান বাহাদুরের দলেরাই লীগকে পকেটে করে রেখেছিল (রহমান ২০১২, পৃ. ১৭)।" অন্যত্র তিনি জানান, "মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠান পূর্বে ছিল খান সাহেব, খান বাহাদুর, ও বৃটিশ খেতাবধারীদের হাতে, আর এদের সাথে ছিলে জমিদার, জোতদার শ্রেণীর লোকেরা। এদের দ্বারা কোনদিন পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা হতো না। শহীদ সাহেব এবং হাশিম সাহেব যদি বাংলার যুবক ও ছাত্রদের মধ্যে মুসলিম লীগকে জনপ্রিয় না করতে পারতেন এবং বুদ্ধিজীবি শ্রেণীকে টেনে আনতে না পারতেন, তাহলে কোনদিন পাকিস্তান আন্দোলন বাংলার কৃষকদের মধ্যে জনপ্রিয়তা লাভ করতে পারতো না (ঐ, পৃ. ৩৫)।"

একই প্রচেষ্টার ধারায় মুসলিম লীগের কর্মসূচির মধ্যে জমিদারী প্রথা বিলোপের দাবী অন্তর্ভুক্ত করার উদ্যোগ নেয়া হয়। তিনি জানান, "এই সময় (১৯৪৩ সনে) একটা আলোড়নের সৃষ্টি হলো। হাশিম সাহেব শহীদ সাহেবের সাথে পরামর্শ করে মুসলিম লীগের একটা ড্রাফট ম্যানিফেস্টো বের করলেন। মুসলিম লীগ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান এবং এর রাজনৈতিক দাবীও থাকবে, ভবিষ্যতে পাকিস্তান পেলে অর্থনৈতিক কাঠামো কী হবে তাও থাকতে হবে। জমিদারি প্রথা বিলোপসহ আরও অনেক কিছু এতে ছিল। ভীষণ হৈচৈ পড়ে গেল। আমরা যুবক, ছাত্র, প্রগতিবাদীরা এটা নিয়ে ভীষণভাবে প্রপাগান্ডা শুরু করলাম (ঐ, পৃ. ৩১)।"

[৬] মুসিলিম লীগের অভ্যন্তরে শ্রেণীসংগ্রামের ধারাতেই বঙ্গবন্ধু মুসলিম জাতীয়তাবাদ থেকে বাংগালী জাতীয়তাবাদ এবং মুসলিম লীগ থেকে আওয়ামী লীগে উপনীত হন। তিনি (এবং তার সহকর্মীরা) দেখেন যে, মূলত বাংলার কৃষকের ভোটে (১৯৪৬ সনের নির্বাচনে) পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হলেও স্বাধীন পাকিস্তানে শাসক মুসলিম লীগ থেকে এই মধ্যবিত্ত-কৃষকদের প্রতিনিধিদের কার্যত বহিষ্কার করা হলো। সোহরাওয়ার্দীর পরিবর্তে খাজা নাজিমুদ্দীনকে ক্ষমতা দেয়া হলো। যে আশা-আকাংখা নিয়ে বাংলার কৃষক

পাকিস্তানের পক্ষে দাঁড়িয়েছিল তা ধুলিস্যাত করা হলো। বঙ্গবন্ধু পঞ্চাশের দশকেই স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখেন। ১৯৬১ সনে কমিউনিস্ট পার্টির নেতা মণি সিংহ এবং খোকা রায়ের সাথে বঙ্গবন্ধু যখন আলোচনায় বসেন তখনই তিনি স্বাধীনতার প্রস্তাব করেন। কমিউনিস্ট নেতৃবৃন্দ তখন বঙ্গবন্ধুকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করেন এই বলে যে, স্বাধীনতার দাবি তোলার সময় এখন আসেনি। উত্তরে বঙ্গবন্ধু সেই ঐতিহাসিক উক্তি করেন, "আপনাদের কথা মেনে নিলাম; কিন্তু একমত হলাম না।" বঙ্গবন্ধুর পক্ষে দ্রুতই স্বাধীনতার প্রস্তাবে উপনীত হওয়া সম্ভব হয়েছিল আরেকটা যে কারণে তা হলো তিনি জানতেন, ১৯৪০ সনের মুসলিম লীগের লাহোর অধিবেশনে শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হকের মাধ্যমে জিন্নাহ যে পাকিস্তান প্রস্তাব উত্থাপন করিয়েছিলেন তাতে একাধিক মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কথা ছিল। ১৯৪৬ সনের নির্বাচনে বিভিন্ন প্রদেশে মুসলিম লীগের নির্বাচিত সদস্যদের বৈঠক দিল্লিতে অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় জিন্নাহ বাংলার নির্বাচিত নেতা সোহরাওয়ার্দীর মাধ্যমে ১৯৪০ সনের লাহোর প্রস্তাবের সংশোধনী উত্থাপন এবং পাশ করান। এই সংশোধনী মোতাবেক একাধিক রাষ্ট্রের স্থলে একটি রাষ্ট্রের লক্ষ্য ঘোষিত হয়। ১৯৪৬ সনের এই বৈঠকে বঙ্গবন্ধু নিজে উপস্থিত ছিলেন। জিন্নাহর এই তাচ্যুর্য তিনি কাছে থেকে দেখেন। বিষয়টি নিয়ে তিনি তখনই গভীরভাবে ভেবেছেন। যেমন তিনি প্রশ্ন অনুভব করেছেন যে, মূল মুসলিম লীগের অধিবেশনে গৃহীত একটি প্রস্তাব মুসলিম লীগের সংসদীয় দলের সভা বদলে দেয়ার এখতিয়ার রাখে কিনা।

সুতরাং "স্টেট" (state) থেকে "স্টেটস" (states)-এ প্রত্যাবর্তনের জন্য বঙ্গবন্ধু মানসিকভাবে অনেক আগে থেকেই প্রস্তুত হয়ে ওঠেন। কমিউনিস্ট নেতৃবৃন্দের সাথে ১৯৬১ সনের বৈঠকে তারই প্রতিফলন দেখা যায়। স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্ন তাঁর কাছে মুসলিম লীগের লাহোর প্রস্তাব (তথা মূল পাকিস্তান প্রস্তাব)-এর বাস্তবায়ন বলেই প্রতিভাত হয়েছে।

[৭] বন্ধুবন্ধু জানান, "আমি কাউন্সিল সভায় বৈদেশিক নীতির উপর প্রস্তাব আনলাম। আওয়ামী লীগের বৈদেশিক নীতি হবে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ। আবদুস সালাম খান এ প্রস্তাবের বিরোধিতা করে বক্তৃতা করলেন এবং অতি প্রগতিবাদী বলে আমাকে আক্রমণ করলেন। আমি তাঁকে অতি প্রতিক্রিয়াশীল বলে যথোপযুক্ত জবাব দিলাম। প্রস্তাব পাশ হয়ে গেল, অবস্থা দেখে তিনি আর ভোটাভুটি চাইলেন না (রহমান ২০১২, পৃ ২৪৮)।" বৈদেশিক নীতির প্রশ্নে বংগবন্ধু আরও জানান,

> "মোহাম্মদ আলী (বগুড়া) প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর থেকে পাকিস্তানকে একটা ব্লকের দিকে নিয়ে গেলেন। দুনিয়া তখন দুইটা ভাগে ভাগ হয়ে পড়েছে। একটা হলো রাশিয়ান ব্লক বা সমাজতান্ত্রিক ব্লক, আর আরেকটা হলো আমেরিকান ব্লক যাকে ডেমোক্র্যাটিক বক বা ধনতন্ত্রবাদী ব্লক বলা যেতে পারে – যদিও মরহুম লিয়াকত আলী খানের সময় থেকেই পাকিস্তান আমেরিকার দিকে ঝুঁকে পড়েছিল। ১৯৫৪ সালের মে মাসে পাকিস্তান-আমেরিকা মিলিটারী চুক্তি সাক্ষরিত হয় এবং পরে পাকিস্তান সিয়াটো ও সেন্টো, বা বাগদাদ চুক্তিতে যোগদান করে পুরোপুরি আমেরিকার হাতের মুঠোয় চলে যায়। এই দুইটা চুক্তিই রাশিয়া ও চীনের বিরোধী বলে তারা ধরে নিল। চুক্তির মধ্যে যা আছে তা পরিষ্কারভাবে কমিউনিস্ট-বিরোধী চুক্তি বলা যেতে পারে। নয়া রাষ্ট্র পাকিস্তানের উচিত ছিল নিরপেক্ষ ও স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করা। আমাদের পক্ষে কারও সাথে শত্রুতা করা উচিত না। সকল রাষ্ট্রের সাথে বন্ধুভাবে বাস করা আমাদের কর্তব্য। কোনো যুদ্ধজোটে যোগদান করার কথা আমাদের চিন্তা করাও পাপ। কারণ, আমাদের বিশ্বশান্তি রক্ষার জন্য সাহায্য করা দরকার; দেশের জনগণের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্যও তা জরুরী (ঐ, পৃ. ২৭৯)।"

অন্যত্র বংগবন্ধু জানান, "আমাকে গ্রেফতারের পূর্বেই পাক-আমেরিকান মিলিটারী প্যাক্টের বিরুদ্ধে এক যুক্ত বিবৃতি দেই। আওয়ামী লীগের বৈদেশিক নীতি ছিল স্বাধীন, নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি। আমাদের বিবৃতি খবরের কাগজে বের হবার পর আমেরিকানরা আমাদের উপর চটে গেল। হক সাহেবের সাথে এক আমেরিকান সাংবাদিক দেখা করেন এবং তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করে এক রিপোর্ট আমেরিকান কাগজে ছাপিয়ে দেন। সেই রিপোর্টার্টাও মোহাম্মদ আলী তাঁর বিবৃতির মধ্যে উলেখ করেন। বিদেশী একজন সাংবাদিকের

রিপোর্টের এত দাম মোহাম্মদ আলীর দেওয়ার কারণ, সেই সাংবাদিক ও তিনি দুজনেই আমেরিকান (পৃ ২৮০)।"

[৮] এ বিষয়ে *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*- তে উল্লেখিত গভর্নর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদের সাথে ১৯৫৪ সনের নির্বাচন পরবর্তীকালের নিম্নরূপ সাক্ষাৎকারের বিবরণটি চিত্তাকর্ষক।

> "আমি আদাব দিলাম। তিনি আমাকে কাছে ডেকে নিয়ে বসালেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন, 'লোকে বলে, আপনি কমিউনিস্ট, একথা সত্য কি না?' আমি তাঁকে অললাম, 'যদি শহীদ সাহেব কমিউনিস্ট হন, তাহলে আমিও কমিউনিস্ট। আর যদি তিনি অন্য কিছু হন, তবে আমিও তাই।' তিনি হেসে আমার মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করে বললেন, 'আপনি এখনও যুবক, দেশের কাজ করতে পারবেন। আমি আপনাকে দোয়া করছি। আপনাকে দেখে আমি খুশি হলাম।' (রহমান ২০১২, পৃ. ২৬৮)।"

[৯] স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটেছিল সমাজতন্ত্রকে অন্যতম লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করে। ১৯৭২ সনে প্রণীত সংবিধানে তা আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃত হয়, এবং চার মূল রাষ্ট্রীয় নীতির একটি হিসেবে সমাজতন্ত্র গৃহীত হয়। ১৯৭২ সনের সংবিধানের প্রস্তাবনার দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, "আমরা অংগীকার করিতেছি যে, যে সকল মহান আদর্শ আমাদের বীর শহীদগণকে প্রাণোৎসর্গ করিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল – জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র, ও ধর্মনিরপেক্ষতার সেই সকল আদর্শ এই সংবিধানের মূলনীতি হইবে।" সংবিধানের ১০ নম্বর অনুচ্ছেদে স্পষ্ট বলা হয়েছিল, "মানুষের উপর মানুষের শোষণ হইতে মুক্ত ন্যায়ানুগ ও সাম্যবাদী সমাজ লাভ নিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হইবে" (বারকাত ২০১৫, পৃ. ৩৪)। অনেকে মনে করেন, বামপন্থী অর্থনীতিবিদগণ, তাজউদ্দীন আহমেদ, এবং আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরের বামপন্থীদের চাপে পড়ে বঙ্গবন্ধু সমাজতন্ত্রকে সংবিধানের অন্যতম মূল লক্ষ্য হিসেবে মেনে নেন এবং জাতীয়করণের পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। কিন্তু তাঁর *অসমাপ্ত আত্মজীবনী* প্রমাণ করে যে, বঙ্গবন্ধু নিজেই সমাজতন্ত্রের পক্ষে ছিলেন।

[১০] সুবিদিত, জাতীয়করণের আওতায় পড়েছিল পাটকল, বস্ত্র ও সূতাকল; চিনিকল; অভ্যন্তরীণ ও উপকূলীয় নৌযানের বৃহদাংশ; ১৫ লাখ টাকা ও তদূর্দ্ধ মূল্যের সকল পরিত্যাক্ত ও অনুপস্থিত মালিকানাভুক্ত সম্পত্তি; বাংলাদেশ বিমান ও বাংলাদেশ শিপিং করপোরেশন, বহির্বাণিজ্যের সিংহভাগ।

[১১] এই ভাষণে বঙ্গবন্ধু বলেন,

> "অতীতে কতিপয় সুবিধাভোগী দেশের সমুদয় সম্পদের সিংহভাগ ভোগ করতো। বর্তমান ব্যবস্থার চূড়ান্ত পর্যায়ে কৃষক, শ্রমিক, দরিদ্র, ও বঞ্চিত লোকেরা উপকৃত হবেন। এজন্যই সরকারের উপর অত্যন্ত গুরুভার সত্ত্বেও আমরা চলতি বছরের ছাব্বিশে মার্চ আমাদের অর্থনীতির কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ অংশ, যেমন ব্যাংক-বীমা, সমগ্র পাট, বস্ত্র, ও চিনি শিল্প, অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন, বৈদেশিক বাণিজ্যসহ শিল্প-কারখানার একটা বিরাট অংশ জাতীয়করণ করেছি। পুরাতন পুঁজিবাদী পদ্ধতির স্থলে সমাজতান্ত্রিক পদ্ধতি কায়েমের পথে এটা একটা সুস্পষ্ট দুঃসাহসিক পদক্ষেপ। নির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে আমরা এগিয়ে চলেছি। সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি পুরোপুরিভাবে গড়ে তোলার কাজ আমাদের সামনে পড়ে রয়েছে। সমাজতন্ত্রের শত্রুরা এই লক্ষ্য অর্জনে বাধা এবং জাতীয়করণ কর্মসূচীর সাফল্যের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করতে চায়। শ্রমিকরা সরকারের সংগে একযোগে কাজ করে সমাজতন্ত্রের শত্রুদের ধ্বংস করতে পারেন। কিন্তু এটা করতে হলে পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় শ্রমিকেরা যে ভূমিকা পালন করেছেন, সে দৃষ্টিভঙ্গীর ও আচরণের আমূল পরিবর্তন আনতে হবে। তাঁদের অবশ্যি উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হবে এবং সম্পদকে রক্ষা করতে হবে (সেলিম ২০১৬)।"

[১২] এই ভাষণে বংগবন্ধু বলেন,

> "সমাজতন্ত্র ছাড়া বাংলার মানুষ বাঁচতে পারবে না। সেইজন্য সমাজতন্ত্র কায়েম করার প্রথম পদক্ষেপ নিয়েছি। আপনারা নিশ্চয়ই জানেন, বড় বড় ব্যাংক ছিল। ভুঁড়িওয়ালাদের ব্যাংক। আলাহর মর্জি ঐ ব্যাংক এখন সাড়ে সাত কোটি মানুষের ব্যাংক। বীমা কোম্পানী আর ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয় – সাড়ে সাত কোটি মানুষের কোম্পানী। সেই আইন আমি পাশ করে দিয়েছি। বড় বড় কাপড়ের কল। বড় বড় চটকল। আমি জাতীয়করণ করে সাড়ে সাত কোটি মানুষের সম্পত্তি করে দিয়েছি। আপনাদের এর সুফল ভোগ করতে একটু সময় লাগবে। কিন্তু এ সম্পত্তি এখন আর ২/৬ জনের নয়। এই সম্পত্তি আমার বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি লোকের সম্পত্তি (সেলিম ২০১৬)।"

[১৩] বঙ্গবন্ধুর ভাষণের এই অংশটি আর পূর্ণাঙ্গভাবে নিম্নরূপ

> "আমরা শাসনতন্ত্র দিয়েছি। এর মধ্যে কোনো ঘোরানো ফেরানো কথার সুযোগ নেই। শাসনতন্ত্রে আমরা চারটা নীতিকে মেনে নিয়েছি – জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র, ও ধর্ম-নিরপেক্ষতা। আমি যা মনে করি, আলজিয়ার্স কনফারেন্সে যেটা আমি বলেছিলাম, দুনিয়া আজ দুইভাগে ভাগ হয়ে যাচ্ছে। একট শোষক, আরেকটি শোষিত। শোষিতের পক্ষে যারা থাকে, আর শোষকের পক্ষে যারা থাকে – তারা কে, তারা কারা, সে কথা দুনিয়ার মানুষ জানে। সমাজতন্ত্র আমাদের প্রয়োজন। সমাজতন্ত্র না হলে এ দেশের দুঃখী মানুষের বাঁচবার উপায় নাই। আমরা শোষণহীন সমাজতন্ত্র চাই। সমাজতন্ত্রের রাস্তা সোজা নয়। সমাজতন্ত্র করতে হলে যে ক্যাডারের দরকার, তা আমরা করতে পেরেছি কিনা এ নিয়ে আলোচনার দরকার আছে। সমাজতন্ত্রের রাস্তায় আমরা যে পদক্ষেপ নিয়েছি, তা থেকে আমরা পিছু হটতে পারি না, পারবো না – যত বড় ষড়যন্ত্রই চলুক না কেন (সেলিম ২০১৬)।"

[১৪] শোষিতের পক্ষে যাঁর আজীবন সংগ্রাম, তিনি যে সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী হয় উঠবেন এটাই ছিল স্বাভাবিক।

[১৫] দ্রষ্টব্য Lenin (1923)।

[১৬] স্তালিন কর্তৃক নেপের অবসান এবং তার প্রতিফল সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য Cohen (1971)।

[১৭] চীনের এসব নীতি পরিবর্তন এবং তার ফলাফল সম্পর্কে আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য Bramall (2008)।

[১৮] কেবলমাত্র পোল্যান্ডে কৃষিতে ক্ষুদে কৃষক ব্যবস্থা চালু ছিল।

[১৯] চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এবং তার ফলশ্রুতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য Islam, Sirajul (1979), Guha (1996) এবং ইসলাম (২০১২)।

[২০] ভারতের সামন্তবাদ সম্পর্কে আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য Sharma (1965)।

[২১] ইংরাজী "ফার্মার" শব্দটির সঠিক বাংলা প্রতিশব্দ খুঁজে পাওয়া কঠিন। "কৃষি উদ্যোক্তা" কথাটি ব্যবহার করা যেতে পারে, যদিও "উদ্যোক্তা" শব্দটি ইংরাজী "এনট্রেপ্রিনেউর" শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ হিসেবে গণ্য করা হয়।

[২২] দ্রষ্টব্য Abdullah (1980) এবং Islam, Sirajul (1988)।

[২৩] এ সময়কার রাজনীতি ও তার পরিণাম সম্পর্কে আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য Chatterji (1994)।

[২৪] সরাসরিভাবে কৃষকের স্বার্থানুকূল উপর্যুক্ত বিভিন্ন পদক্ষেপের পাশাপাশি ফজলুল হক বাংলার মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষা প্রসারের লক্ষ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। শিক্ষা দপ্তরটিকে তিনি নিজের

অধিকারে রাখেন। তিনি "প্রাথমিক শিক্ষা আইন" পাশ করেন যার অধীনে বিনাবেতন এবং বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু হয়। তিনি "মাধ্যমিক শিক্ষা বিল"ও উত্থাপন করেন। এছাড়া তিনি বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলায় সরাসরি ভূমিকা পালন করেন। এরমধ্যে রয়েছে ইসলামিয়া কলেজ, লেডী ব্রাবোর্ণ কলেজ, ওয়াজেদ মেমোরিয়াল গার্লস হাই স্কুল, এবং চাখার কলেজ। সরকারি চাকুরীতে মুসলমান এবং নিম্নবর্গীয়দের প্রতিনিনিধিত্বের উপর তিনি জোর দেন। বঙ্গীয় সরকারের সকল দপ্তরে তিনি পঞ্চাশ শতাংশ চাকুরী মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত করার আদেশ জারী করেন। একইভাবে তিনি যোগ্য প্রার্থী পাওয়া সাপেক্ষে সরকারী চাকুরীর সর্বোচ্চ ১৫ শতাংশ নিম্নবর্ণের (শিডিউল কাস্ট) প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষিত করার আদেশ দেন।

এসব পদক্ষেপের ফলেই শেরে-বাংলা ফজলুল হক বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের হৃদয়ে একটি বিশেষ স্থান করে নেন। পাকিস্তান আন্দোলনের জনপ্রিয়তা তাঁকে এই স্থানচ্যুত করতে পারেনি। এটা আশ্চর্যের নয় যে, বঙ্গবন্ধুর পিতা তাঁকে উপদেশ দিয়েছিলেন, "বাবা, হক সাহেবের বিরুদ্ধে কিছু বলিও না"। অসমাপ্ত আত্মজীবনীতে বঙ্গবন্ধু বিবরণ দেন কীভাবে ফজলুল হকের বিরুদ্ধে বলতে গেলে তাঁকে সাধারণ মানুষের প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে হয়েছে।

[২৫] জমিদারী উচ্ছেদ আইন এবং তার ফলাফল সম্পর্কে আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য Abdullah (1976)।

[২৬] ইংরাজীতে, "Such person and his wife, son, unmarried daughter, son's wife, son's son, and son's unmarried daughter."

[২৭] এসব অনুচ্ছেদের আলোচনার আরও বিস্তারিত পরিবেশনার জন্য দ্রষ্টব্য লেখকের পূর্ব প্রকাশিত গ্রন্থ ইসলাম (১৯৮৭) এবং ইসলাম (২০১২)।

[২৮] ভূমি সংস্কার এবং সাধারণভাবে গ্রামীণ অর্থনীতি সম্পর্কে সত্তুর এবং আশীর দশকে রচিত ও প্রকাশিত রচনাবলীর তালিকা বিশাল। তার মধ্যে উল্লেখ্য হলো Abdullah (1976a, 1976b, 1978, 1981, 1986), Alamgir (1981), Faaland and Parkinson (1976a, 1976b), Mahabub Hossain (1974, 1977a, 1977b, 1978, 1979, 1980, 1981), ইসলাম (1983K, 1983L, 1984, 1987), Nurul Islam (1977, 1978), Jannuzi and Peach (1978), Jabbar (1975, 1977), Khan (1976), Lvb (1980), Mahmud (1981), Muqtada (1975), Osmani and Quasem (1985), Quibria (1976), Anisur Rahman (1975), Atiq Rahman (1979, 1980), Atiur Rahman (1982), Roquibuzzaman (1973), সিদ্দিকী (১৯৮১)। ভূমি সংস্কার এবং গ্রামীণ অর্থনীতি সম্পর্কে সাম্প্রতিক আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য বায়েস এবং হোসেন (২০০৭)।

[২৯] তাঁদের এসব আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য Abdullah (1976a, 1978a), আব্দুল্লাহ (১৯৮১), Faaland and Parkinson (1976a, 1976b), Nurul Islam (1977, 1978), Stepanek (1979)।

[৩০] সংকুচিত পরিধির পুনর্বিতরণমূলক ভূমি সংস্কার সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য ইসলাম (১৯৮৭, পৃ. ১৯৩-১৯৬)।

[৩১] সংকুচিত পরিধির যৌথতা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য ইসলাম (১৯৮৭, পৃ. ১৯৬-২০১)।

[৩২] মূল ইংরেজীতে, "Thus it may seem that if the problems of income distribution and access to work are to be solved, communal cultivation systems will have to be introduced. … All this is of course straight socialism for which Bangladesh may not be socially and politically ready. But the analysis stems not from any doctrinaire view but from the difficulty of seeing how, given the scarcity of land, incomes can be assured for those without it (Faaland and Parkinson 1976a, pp. 87- 88)."

[৩৩] মূল ইংরেজীতে, "As population increases, the landless labourers increase in number and the smallholdings get further subdivided, there is likely to be an increasing pressure as well as a rationale for some kind of communal ownership or management of land, which can keep down the number of the visible unemployment and prevent it from reaching intolerable levels. In the context of such a prespective for the future of the rural economy of Bangladesh, some kind of common ownership or management of land would provide an effective means of sharing employment and income (Nurul Islam 1978, p. 40)."

[৩৪] মূল ইংরেজীতে, "It may in a way be conceived as a method of generalizing family system prevalent in rural Bangladesh to the entire village (Islam 1978, p. 45)"

[৩৫] মূল ইংরেজীতে, "A radical redistribution of land on the basis of private peasant property cannot by itself solve the problems of development and in some cases it can aggravate them. Thus, it is to some form of communization that we must look for a solution to our agrarian problem (Abdullah 1978, pp. 379-380)."

[৩৬] এক্ষেত্রে বিশেষ ব্যতিক্রম ছিলেন আবু আব্দুলাহ, যিনি ভূমি সংস্কারের রাজনৈতিক সমস্যার দিকেও কিছুটা দৃষ্টি দিয়েছিলেন। দ্রষ্টব্য Abdullan (1978) এবং আবদুলাহ (১৯৮১)।

[৩৭] ভূমি সংস্কারের আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা বিষয়ক আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য Sobhan (1993)।

[৩৮] গ্রামের আনুভূমিক বিভক্তি সম্পর্কে আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য Abdullah (1976), আবদুলাহ (১৯৮০), Mahabub Hossain (1977a), ইসলাম (১৯৮৭, পৃ. ২০১-২০৪), Jannuzi and Peach (1977, 1978),জাহাংগীর (১৯৭৮), Jahangir (1979), Atiur Rahman (1982)। এ বিষয়ক সাম্প্রতিক আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য বায়েস এবং হোসেন (২০০৭)।

[৩৯] বাংলাদেশের গ্রামের উলাম্বিক সম্পর্কে আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য Adnan (1980a, 1980b, 1980c, 1980d), Arefeen (1986), Arens and Beurden (1977), Bertocci (1970, 1975, 1979), Chowdhury (1978), Eaton (1993), Hartmann and Boyce (1979, 1983), ইসলাম (১৯৮৭, পৃ. ২০১-২০৫), Nazrul Islam (1980)।

[৪০] অনেক সময় এই পার্থক্যকে 'বিষয়গতভাবে শ্রেণী' (class-in-itself) এবং 'বিষয়ীগতভাবে শ্রেণী'র (class-for-itself) বলেও অভিহিত করা হয়।

[৪১] তেভাগা আন্দোলনের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য Majumdar (2011)।

[৪২] এ সময়ের রাজনীতির বিশেষণমূলক আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য Kamal (2009)।

[৪৩] আশীর দশকে ভূমিহীন কৃষকদের পৃথকভাবে সংগঠিত করার জন্য কৃষক সমিতির পাশাপাশি ক্ষেতমজুর সমিতি গঠিত হয়। কৃষকদের এবং ক্ষেতমজুরদের সংগঠিত করার এই প্রয়াস অব্যাহত আছে। কিন্তু বহু দশকব্যাপী এই প্রয়াস সত্ত্বেও বাংলাদেশের গ্রামে এখনও ভূমি স্বার্থ বিরোধী রাজনৈতিক শক্তি তেমনভাবে বিকশিত হতে পারে নি। সে কারণেই ভূমি সংস্কারের প্রশ্নে বাংলাদেশে রাজনৈতিক সূত্রের অচলাবস্থা পরিদৃষ্ট হচ্ছে। বস্তুত, এখানে যেন সৃষ্টি হয়েছে নিম্নরূপ একটি দুষ্ট চক্রের। গ্রামের গরীবদের জমি নেই বলে ভূমি সংস্কার প্রয়োজন। কিন্তু জমি নেই বলে গরীবেরা অবস্থাপন্নদের উপর নির্ভরশীল; আর তাদের এই নির্ভরশীলতার কারণেই অবস্থাপন্নরা ভূমি সংস্কারের উদ্যোগ প্রতিহত করতে পারছে। যেমন, বাংলাদেশে ভূমিহীন কৃষকেরা (ক্ষেতমজুরেরা) এখনো বহুলাংশে "বিষয়গতভাবে শ্রেণী"তে সীমাবদ্ধ হয়ে আছেন। গ্রামের অন্যান্য জমি-স্বল্প এবং গরীব কৃষকদের জন্যও এ বিষয়টি স্ব স্ব ভাবে প্রযোজ্য। শ্রেণী

সচেতনতা এবং সংগঠনগত এ পরিস্থিতির কারণেই দেখা যায় যে, গরীবদের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকা সত্ত্বেও গ্রামের জীবনের উপর অবস্থাপন্ন পরিবারসমূহ আধিপত্য বিস্তার করে থাকে। ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক শক্তিসমূহকে গ্রামীণ সমর্থনের জন্য এই অবস্থাপন্ন স্তরের উপর নির্ভর করতে হয়। ফলে নীতিগত অংগীকার অথবা স্বীকৃতি থাকলেও এসব সরকারের পক্ষে কার্যকর ভূমি সংস্কারের পদক্ষেপ নেয়া সম্ভব হয় না।

[৪৪] গ্রামের রূপান্তরের লক্ষ্যে জমিস্বার্থের সাথে এই আপোষের প্রয়োজনীয়তা এবং গ্রামের জমিস্বার্থের সাথে বিরোধের "অধীনস্থ চরিত্র" সম্পর্কে আরও বিস্তৃত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য ইসলাম (১৯৮৭, পৃ ২০৭-২৩২)।

[৪৫] বঙ্গবন্ধু কর্তৃক ১৯৭৫ সনে সমবায়ী গ্রাম প্রস্তাব করার পেছনে আরেকটি যে বিষয় প্রভাব ফেলতে পারে তা নিম্নরূপ। ১৯৭২-৭৩ সনে বঙ্গবন্ধুর দৃষ্টি মূলত সংসদীয় গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার দিকে নিবদ্ধ ছিল; ফলে দেশের আর্থ-সামাজিক রূপান্তরের কাজসমূহ তাঁর কাছে ততোটা গুরুত্ব পায় নি। সে কারণে সে পর্যায়ে ১০০ বিঘা জমি সিলিংয়ের বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগের সাংসদদের বিরোধীতার কাছে তিনি নতি স্বীকার করেছিলেন। কিন্তু সময়ে তিনি আর্থ-সামাজিক করণীয়সমূহের গুরুত্ব আরও তীব্রভাবে বুঝতে সক্ষম হন। তখন তিনি সংসদীয় গণতন্ত্রকে অপরিহার্য মনে করেন না, এবং আওয়ামী লীগের সাংসদদের বিরোধীতাকেও অতো মূল্য দিতে রাজী ছিলেন না। সে কারণেই তিনি ১৯৭৫ সনে গ্রামের সমবায়ী রূপান্তরের কর্মসূচী প্রস্তাবে সাহসী হয়েছিলেন।

[৪৬] দ্রষ্টব্য Islam (2016b)।

[৪৭] চীনের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য Bramall (2008)।

[৪৮] ভিয়েতনামের সাম্প্রতিককালের কৃষিখাতের সংস্কার ও বিবর্তন সম্পর্কে তথ্য ও আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য Global Learning (2014) এবং Tuan (n.d.)।

[৪৯] প্রাক্তণ সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রসমূহ এবং পূর্ব ইউরোপীয় দেশসমূহের কৃষিখাতের সাম্প্রতিক সংস্কার ও বিবর্তন সম্পর্কে তথ্য ও আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য Block (2002), Csaki (2000), Deininger (2002), Giovarellu and Bledsoe (2001), Hartvigsen (2013), Macours and Swinnen (2002), Spoor (2012), Spoor and Visser (2010), and Swinnen (n.d.)।

[৫০] বাংলাদেশের সাম্প্রতিককালের অর্থনৈতিক বিবর্তন সম্পর্কে তথ্য ও আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য Khan, Azizur (2015)।

[৫১] বর্গার কারণ, প্রকৃতি, ও প্রকারভেদ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য ইসলাম (১৯৮৩ক)। কেন বড় ও মাঝারি জোতের মালিকেরা নিজেরা চাষ করার পরিবর্তে জমি ছোট জোতের কৃষকদের নিকট বর্গায় দিয়ে দিচ্ছে, তার কারণ হিসেবে বায়েস ও হোসেন যেসব বিষয়ের উল্লেখ করেন তা হলো, তুলনামূলকভাবে শ্রমশক্তির অভাব, প্রয়োজনীয় তদারকীতে অপারগতা, এবং অ-কৃষিজ কর্মকান্ডে আকৃষ্ট হওয়া (বায়েস এবং হোসেন ২০০৭, ঐ, পৃ, ৫৪)।

[৫২] বিগত কয়েক দশকে বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিবর্তন সম্পর্কে আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য Islam (2016a)।

[৫৩] বাংলাদেশের "স্বতস্ফূর্ত বর্গা সংস্কার" (ভাগচাষ থেকে চুক্তিপ্রথায় বিবর্তন)-এর সাথে পশ্চিমবঙ্গের "অপারেশন বর্গা"র অধীনে সম্পাদিত বর্গা সংস্কারের তুলনা একটি মূল্যবান গবেষণা হতে পারে। পশ্চিমবঙ্গের বর্গা সংস্কার ও ভূমি সংস্কারের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে তথ্য ও আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য Anonymous (n.d.), Bardhan and Mookherjee (2007), Chaudhury (2002), Dasgupta (n.d.), Hardnews (2016), এবং NCAP (n.d.)।

[৫৪] যৌথতাভিত্তিক রূপান্তরিত গ্রামের বিপুল সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য ইসলাম (১৯৮৭, পরিচ্ছেদ-৫)।

[৫৫] মূল ইংরেজীতে, "will also give an opportunity to employ them in other activities within the rural community in which they live, using the increase in the yields of the land to provide the finance needed (Faaland and Parkinson 1976a, p. 88).

[৫৬] মূল ইংরেজীতে, "Now and for many years in the future, manpower would remain the greatest and most important resource of Bangladesh, and therefore, the question of how to mobilize the productive work in the most labor-intensive way and with a minimum increase in the supply of wage goods would continue to plague the policy makers in Bangladesh (Islam 1978, p. 211)."

[৫৭] বদ্বীপ পরিস্থিতর সাথে অপরিচিত বিদেশী পরামর্শকদের পক্ষে নদীখাত এবং পাবনভূমির মধ্যকার এই বহুমুখী অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক বোঝা সহজ ছিল না। ফলে মাস্টার প্যান প্রণয়নকারীরা অবরোধ পন্থা অবলম্বন করে, এবং এভাবেই বংলাদেশ অবরোধ পন্থার শিকার হয়।

[৫৮] দ্রষ্টব্য Islam (2016d)।

[৫৯] নদ-নদীর প্রতি বিভিন্ন পন্থা এবং তার ফলাফল সম্পর্কে আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য Islam (2006a, 2006b, 2004, 2001a, 1999, 1990)। প্রাসঙ্গিক আলোচনার জন্য আরও দ্রষ্টব্য Hughes et al. (1994), Khalequzzaman (2000) ।

[৬০] জলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের করণীয় এবং সেক্ষেত্রে নদ-নদীর বিশেষ ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য Islam (2009)।

[৬১] জলবায়ু পরিবর্তনের মুখে বাংলাদেশের টিকে থাকার জন্য পলিমাটিভরণের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য Bhattacharya (2009)।

[৬২] গ্রামের রূপান্তর কিভাবে বৃহত্তর গ্রামীণ অর্থনীতির জন্য উপকারী হতে পারে, সে বিষয়ে আরও বিস্তৃত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য ইসলাম (১৯৮৭, পৃ. ১৪৬-১৪৭)।

[৬৩] গ্রামের রূপান্তর কিভাবে আন্তঃগ্রাম সহযোগীতা বিকাশে সহায়ক হতে পারে, সে বিষয়ে আরও বিস্তৃত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য ইসলাম (১৯৮৭, পৃ. ১৫৬-১৫৯)।

[৬৪] গ্রামের রূপান্তর কিভাবে জনসংখ্যা উত্তরণ অর্জনে সহায়ক হতে পারে, সে বিষয়ে আরও বিস্তৃত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য ইসলাম (১৯৮৭, পৃ. ১৩৬-১৪৬)।

[৬৫] "স্বস্থানে নগরায়ন" (urbanization in-situ) প্রস্তাব সম্পর্কে আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য বাপা এবং বেন (২০১১)।

[৬৬] "ঘনবদ্ধ শহর" (Compact Township) শীর্ষক প্রস্তাবের জন্য দ্রষ্টব্য Rashid and Quayes (2000)।

[৬৭] সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং বাস্তবায়নের সুযোগ দেয়া হলে গ্রামসমূহ বহু সৃষ্টিশীলতার পরিচয় দিতে পারে। বহু অভিনব উদ্যোগের উদয় ঘটতে পারে। ভাল উদ্যোগসমূহকে প্রচারিত ও উৎসাহিত করা যেতে পারে। ঘনবসতির কারণে কোন গ্রামের প্রগতিশীল উদ্যোগের কথা আশেপাশের গ্রামে প্রচারিত হতে এবং অনুকৃত হতে বেশী সময়ের প্রয়োজন হবে না।

[৬৮] মেলা, পার্বণ, নৌকা বাইচ, যাত্রা, পালাগান, ইত্যাদি বহু যেসব গ্রামের মানুষের আনন্দের খোরাক ছিল, তা ফিরে আসতে পারে এবং উন্নতমাত্রায় এবং বহুগুণিত হতে পারে।

[৬৯] এ সম্পর্কিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য United Nations (2008, 2010)।

[৭০] জমি স্থানান্তর কর, বেসরকারী স্কুল, হাসপাতাল, ডিস্পেন্সারী স্থাপনের রেজিস্ট্রেশন ফি, হাট-বাজারের ফী, সম্পত্তি থেকে আহরিত আয়, ইত্যাদি গ্রাম সরকারের আয় হতে পারে। স্থানীয় সরকার সম্পর্কে সংবিধানে যেসব বিধান আছে, তার সাথে সংগতিপূর্ণ উপায়ে গ্রাম সরকার সংক্রান্ত বিভিন্ন বিধান প্রণীত হতে পারে, যাতে তা সংবিধানের সাথে সাংঘর্ষিক না হয়। এ বিষয়ে আরও আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য Hasina and Hasan (2015)।

[৭১] লক্ষ্য করা যেতে পারে যে, বর্তমানে বর্গার অধীনে চাষ করতে যেয়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রে চাষীকে অর্ধেক ফসল জমি মালিককে দিতে হচ্ছে। কাজেই পুনর্বিতরণের শর্ত হিসেবে যদি বংগবন্ধুর ফর্মুলা অনুযায়ী ফসলের এক-তৃতীয়াংশও চাঁদা হিসেবে নির্ধারিত হয়, সেটি আকর্ষণীয় বলেই বিবেচিত হওয়ার কথা। লক্ষ্যণীয় যে, প্রাপ্ত-জমির উপর এ ধরণের চাঁদা নির্ধারণ উপরিল্লিখিত সংকুচিত পরিধির পুনর্বিতরণমূলক সংস্কার কর্মসূচী বাস্তবায়নে সহায়ক হবে। কারণ, যেসব ভূমিহীন ও প্রায় ভূমিহীন পরিবার এই কর্মূচীর বাইরে থেকে যাবে তাদের পক্ষে চাঁদা-বিহীন পুনর্বিতরণের চেয়ে চাঁদা-সম্পন্ন পুনর্বিতরণ মেনে নেওয়া অপেক্ষাকৃত সহজ হবে। তবে লক্ষ্যণীয় যে, এই চাঁদা পুনর্বিতরিতব্য জমির মূল্য নির্ধারণকে প্রভাবিত করবে। সাধারণভাবে, জমির বাজার মূল্য পরিশোধের বিনিময়ে ক্রেতা জমির পূর্ণস্বত্ব লাভ করে। বিপরীতে উপরোক্ত স্বেচ্ছামূলক ভূমি সংস্কারের আওতায় যারা জমি পাবেন (অথবা ক্রয় করবেন), তাদের উপর উপরোক্ত চাঁদা আরোপিত হবে; সুতরাং তাদের কাছ থেকে জমির বাজার মূল্য দাবী করা যুক্তিসংগত নয়।

[৭২] তবে লক্ষ্যণীয়, যেহেতু প্রাপ্ত-জমির উপরও চাঁদা আরোপিত হবে, সেহেতু এক অর্থে ভূমি সংস্কার সত্ত্বেও উদ্বৃত্ত জমি মালিকদের জমির উপর অধিকার সমবায়ী গ্রামে সম্পূর্ণ লুপ্ত হচ্ছে না; অন্যভাষায়, জমি পুরোপুরি "হারিয়ে" যাচ্ছে না।

[৭৩] এ বিষয়ে আমরা অন্যত্র বিস্তারিত আলোচনা করেছি। দ্রষ্টব্য ইসলাম (২০১১)।

[৭৪] যেমন পিটার বার্তোচি বাংলাদেশের গ্রামকে "মায়াবী" (ইল্যুসিভ) বলে আখ্যায়িত করেছেন। দ্রষ্টব্য Bertocci (1970). বাংলাদেশের গ্রামের গঠন ও চরিত্রের উপর এ অঞ্চলের ভূপ্রাকৃতিক বৈশিষ্টের প্রভাব সম্পর্কে আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য Eaton (1993)।

[৭৫] এ বিষয়ে আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য Sen (2006)

[৭৬] বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার সংক্রান্ত বিভিন্ন উদ্যোগ এবং অভিজ্ঞতা সম্পর্কে তথ্য ও আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য Fox and Menon (2008), Hasina and Hasan (2015), Hye (1985), ISAS (2016), Mollah (2007), Nadiruzzaman (2008), Nasrin (2013), এবং Siddiqui (2000)। বিশেষত Hasina and Hasan (2015) ভাল কাজ উপহার দিয়েছেন।

[৭৭] এ বিষয়ে আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য Kosambi (1956, 1965)।

[৭৮] দ্রষ্টব্য British Parliament (1812)।

[৭৯] এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য, Dutt (1902, 1904).

[৮০] দ্রষ্টব্য Government of Bangladesh (1980)।

[৮১] জিয়াউর রহমান প্রবর্তিত "স্বনির্ভর গ্রাম সরকার" বিধিমালার জন্য দ্রষ্টব্য Government of Bangladesh (1980), এবং এ সম্পর্কে আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য Yunus, Chowdhury, Rahman, Alamgir, and Ali (1980)।

[৮২] এ সম্পর্কে তথ্য এবং আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য Bdnews24.com (2005), BLAST (2010), Majumdar (2005) এবং Nath (2008)।

[৮৩] ভবিষ্যতে গ্রাম সরকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যেসব উচ্চ আদালতের রায় লক্ষ্য করতে হবে, তা হলো কুদরত-এ-এলাহী পনির বনাম বাংলাদেশ ৪৪ ডিএলআর (এডি) (৩১৯) ১৯৯২ এবং বাস্ট বনাম বাংলাদেশ এবং অন্যান্য ৬০ ডি-এল-আর (২০৮) ২৩৪। এ বিষয়ে দ্রষ্টব্য Hasina and Hasan (2015)।

[৮৪] উইলিয়াম শেক্সপীয়ারের "রোমিও-জুলিয়েট" কাব্যের একটি বিখ্যাত পংক্তি নিম্নরূপঃ "What is in a name? That which we call rose by any other name would smell as sweet!" অর্থাৎ "নামে কীবা আসে যায়? যে ফুলকে আমরা গোলাপ বলি, তার নাম যদি অন্য কিছু হতো, তবুও তার সুরভী তো একই হতো!" কিন্তু শেক্সপীয়ারের এই যুক্তি যেমন ভেনিসের মন্তেগু আর ক্যাপুলেট পরিবারের মধ্যে সংঘর্ষ এড়াতে পারেনি, তেমনি বাংলাদেশেও গ্রাম পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর নাম নিয়ে বিরোধ হয়তো এই প্রতিষ্ঠান সৃষ্টির পথে একটা বড় বাঁধা হয়ে দাঁড়াবে!

[৮৫] স্থানাভাবে নেপাল ও শ্রীলংকার অভিজ্ঞতার আলোচনা থেকে আমরা বিরত থাকছি। তবে উৎসাহী পাঠকদের জন্য দ্রষ্টব্য Fernando (n.d), Government of Nepal (1999) এবং Khadga (1998)।

[৮৬] ভারতের "পঞ্চায়েত রাজ" সম্পর্কে তথ্য ও আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য Government of India (2011), Islam and Fujita (2012) এবং Siddiqqui (1992)।

[৮৭] কৃষকদের সংগঠন, কিষাণ সভাও এ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

[৮৮] চীনের গ্রাম সরকার সংক্রান্ত সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতা বিষয়ে তথ্য ও আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য Government of China (1998), Hays (2016), Ho (2016), Jacka and Wu (2016), Kelliher (1997), Ges Li (1997)।

তথ্যসূত্র

Abdullah, Abu (1976a), "Land Reform and Agrarian Change in Bangladesh," *Bangladesh Development Studies*, Vol. IV, No. 1 (January)

Abdullah, Abu (1976b), "Farm Size and Efficiency, and the Socio-economics of Land Distribution: A Comment," *Bangladesh Development Studies*, Vol. IV, No. 1 (January)

Abdullah, Abu (1978), "Formulating a Viable Land Policy: What Do We Need to Know?" *Bangladesh Development Studies*, Vol. VI, No. 3 (Autumn)

Abdullan, Abu (1980), "The Peasant Economy and Agrarian Change in Bangladesh," *Bangladesh Development Studies*, Vol. VIII, No. 4 (Winter)

আব্দুল্লাহ, আবু আহমেদ (১৯৮১), "ভূমি সংস্কার, উন্নয়ন, ও রাজনীতি–কয়েকটি মন্তব্য," *প্রাক্সিস জার্নাল*, সংখ্যা ৭-৮

Abdullah, Abu A. (1986), Necessary Land Reforms in Bangladesh and Their Implementation, Paper presented at the seminar on "Evaluation of Agrarian Reform Measures in Bangladesh," organized by Centre for Integrated Rural Development in Asia and the Pacific (CIRDAP), Dhaka, July 29-30

Adnan, Shapan (1980a), Preliminary Findings of a Social and Economic Study of Four Villages, Working Paper No. 1, Village Study Group, *Bangladesh Institute of Development Studies*, Dhaka (mimeo)

Adnan, Shapan (1980b), Social Structure and Implications for Resource Allocation in a Chittagong Village, Working Paper No. 3, Village Study Group, *Bangladesh Institute of Development Studies*, Dhaka (mimeo)

Adnan, Shapan (1980c), Differentiation and Class Structure in Char Shyamraj, Working Paper No. 8, Village Study Group, *Bangladesh Institute of Development Studies*, Dhaka (mimeo)

Adnan, Shapan (1980d), Peasant, Classes, and Land Mobility: Structural Reproduction and Change in Rural Bengal, Working Paper No. 9, Village Study Group, *Bangladesh Institute of Development Studies*, Dhaka (mimeo)

Alamgir, Mohiuddin Khan (ed.) (1981), *Land Reform in Bangladesh*, Centre for Social Studies, Dhaka

Anonymous (n.d.), The Impact of Land Reform in West Bengal: The View Point of the Critics

Arefeen, Hilaluddin Khan (1986), *Changing Agrarian Structure in Bangladesh. Shimulia – A Study of a Peri-Urban Village*, Centre for Social Studies, Dhaka

Arens, J. and J. V. Beurden (1977), *Jhagrapur: Poor Peasants and Women in a Village in Bangladesh*, Amsterdam

Bardhan, Pranab and Dilip Mookherjee (2007), *Land Reform and Farm Productivity in West Bengal*, Department of Economics, University of California, Berkeley

BAPA and BEN (2011), *Urbanization, Traffic Jam, and Bangladesh Environment*, Papers and Proccedings of the Special Conference on Urbanization, Traffic Jam, and Bangladesh Environment, organized by Bangladesh Poribesh Andolon (BAPA) and Bangladesh Environment Network (BEN), in association with other pro-environment organizations of Bangladesh, and held on January 8, 2011 in Dhaka, Bangladesh

বারকাত, আবুল (২০১৫), *বঙ্গবন্ধু-সমতা-সাম্রাজ্যবাদ*। বঙ্গবন্ধু 'বেঁচে থাকলে' কোথায় পৌঁছতো বাংলাদেশ? সাম্রাজ্যবাদী বিশ্ব-প্রভূত্বের যুগে সমতাবাদী সমাজ বিনির্মাণের সম্ভাব্যতা প্রসংগে। মুক্তবুদ্ধি প্রকাশনা, ঢাকা।

বায়েস, আবদুল ও মাহবুব হোসেন (২০০৭), *গ্রামের মানুষ, গ্রামীণ অর্থনীতি : জীবন জীবিকার পরিবর্তন পর্যালোচনা*, রাইটার্স ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, স্বরাজ, ঢাকা

Bertocci, Peter (1970), *Elusive Villages: Social Structure and Community Organization in Rural East Pakistan*, Unpublished Ph. D. Dissertation, Michigan State University

Bertocci, Peter (1975), "Micro-region, Marker Area, and Muslim Community in Rural Bangladesh," *Bangladesh Development Studies*, Vol. VIII, No. 3 (July)

Bertocci, Peter (1979), "Structural Formation and Peasant Classes in Bangladesh," *Journal of Social Studies*, No. 5 (July)

Bdnews24.com (2005), HC Declares Gram Sarkar Act Illegal, http://bdnews24.com/bangladesh/2005/08/01/hc-declares-gram-sarkar-act-illegal-updated

Bhattacharya, Dipen, Feroze Ahmed, Nazrul Islam, and Mohd. Abdul Matin (editors) (2009), *Climate Change and the Tasks for Bangladesh*, Bangladesh Poribesh Andolon (BAPA) and Bangladesh Environment Network (BEN), Dhaka

BLAST (2010), BLAST vs. Bangladesh and Others ['Gram Sarkar (Village Government) Act, 2003' Case] Writ Petition No. 4502 pf 2003. Judgment reported in 60 *DLR* (2008) 234

Bloch, Peter C. (2002), Agrarian Reform in Uzbekistan and Other Central Asian Countries, Working Paper No. 49, Land Tenure Center, University of Wisconsin, Madison

Bramall, Chris (2008), *Chinese Economic Development*, London: Routledge

British Parliament (1812), *Fifth Report of the Select Committee*, House of Commons, London

Chatterji, Joya (1994), *Bengal Divided: Hindu Communalism and Partition, 1982-1947*, Cambridge: Cambridge University Press

Chaudhary, Pranava K. (2002), "Operation Borga Ends in a Whimper," *Times of India*, September 14

Chaudhuri, Dipanjan Rai (2009), "Panchayat System, Rural Classes, and Agriculture in West Bengal," *Sanhati*, December 15 http://sanhati.com/excerpted/2015/

Cheema, Ali, Asim Ijaz Khwaja, and Adnan Qadir (n. d.), *Local Government Reforms in Pakistan: Context*, Content, and Causes, JFK School of Government, Harvard University

Chowdhury, Anwarullah (1978), *A Bangladesh Village: A Study of Social Stratafication*, Centre for Social Studies, Dhaka

Cohen, Stephen F. (1971), *Bukharin and the Bolshevik Revolution: A Political Biography*, 1888-1938, Oxford: Oxford University Press

Csaki, C. (2000), "Agricultural Reforms in Central and Eastern Europe and the Former Soviet Union: Status and Perspective," *Agricultural Economics*, Vol. 22, pp. 37-54

Dasgupta, Anirban (n. d.), Land Acquisition to Consolidate Land Reforms? The West Bengal Experience, Institute of Social Studies

Deininger, Klaus (2002), "Agrarian Reforms in Eastern European Countries: Lessons from International Experience," *Journal of International Development*, Vo. 14, pp. 987-1003

Dutt, Romesh Chunder (1902), *Economic History of India under Early British Rule*, London: Routledge Kegan Paul

Dutt, Romesh Chunder (1904), *Economic History of India in the Victorian Age*, London: Routledge Kegan Paul

Eaton, Richard (1993), *The Rise of Islam and the Bengal Frontier, 1204-1760*, Berkeley: University of California Press

El-Ghonemy, Riad M. (1999), The Political Economy of Market-Based Land Reform, Discussion Paper No. 104, June, United Nations Research Institute for Social Development (UNRISD), Geneva

Faaland, Just and J. R. Parkinson (1976), *Bangladesh : The Test Case for Development*, Dhaka: University Press Limited

Fernando, Laksiri (n. d.) An Introduction to the Local Government System in Sri Lanka: Changes and Key Issues, University of Colombo

Fox, William F. and Balakrishna Menon (2008), Decentralization in Bangladesh: Change has been Illusive, International Studies Program Working Paper 08-29, October, Andrew Young School of Policy Studies, Georgia State University, Atlanta

Giovarelli, Renee and David Bledsoe (2001), *Land Reform in Eastern Europe*, Rural Development Institute (RDI), Seattle, Washington

Global Learning (2014), Agrarian Reform in Vietnam, http://www.globallearning-cuba.com/blog-umlthe-view-from-the-southuml/agrarian-reform-in-vietnam

Gonzalez, Maria A. and Rigoberto A. Lopez (2003), Market-based Land Reform and Farm Efficiency in Colombia: A DEA Approach, Paper presented at American Agricultural Economics Association Annual Meeting, Montreal, July 27-30

Government of Bangladesh (1980), The Swanirvar Gram Sarkars (Constitution and Administration) Rules, 1980, The Bangladesh Gazette, May 24 (Saturday), 1980

Government of China (1998), Organic Law of the Villagers Committees of the Peoples Republic of China, http://www.china.org.en/english/government/207279.htm

Government of India (2011), Roadmap for the Panchayati Raj (2011-17): An All India Perspective, Ministry of Panchayat Raj, www.panchayat.gov.in

Government of Nepal (1999), Local Self-Governance Act 2055 (1999), Published by His Majesty's Government of Nepal, Ministry of Law and Justice, Law Books Management Board

Guha, Ranajit (1996), *The Rule of Property for Bengal: An Essay on the Idea of Permanent Settlement*, Bombay: Orient Longman Ltd

Hardnews (2016), Barga Blues, http://www.hardnewsmedia.com/2008/10/2383

Hare, Denise and Jalal Akbar Mumtaz (2003), Property Rights in Land: What are the Key Attributes?

Hartmann, Betsy and James Boyce (1979), *Needless Hunger: Voices from a Bangladesh Village*, Foodfirst Books for International Food Policy Research Institute (IFPRI), Washington DC

Hartmann, Betsy and James Boyce (1983), *A Quiet Violence: View from a Bangladesh Village,* London: Zed Books

Hartvigsen, Morten (2013), Land Reform in Central and Eastern Europe after 1989 and Its Outcome in the Form of Structures and Land Fragmentation, Land Tenure Working Paper 24, Rome: Food and Agriculture Organization (FAO), United Nations

Hasina, Nusrat and Gazi Saiful Hasan (2015), "Reconsideration of Local Government at Village Level: A Legal Study," *Global Disclosure of Economics and Business*, Vo. 4, No. 2, pp. 91-99

Hays, Jeffrey (2016), Chinese Villages, Facts and Details, http://factsanddetails.com/china/cat11/sub72/item 1088.html

Hindess, Barry and Paul Hirst (1975), *Pre Capitalist Modes of Production*, London: Routledge and Kegan Paul

Ho, Bryan (2016), "Village Democracy Shrugs in Rural China," *East Asia Forum – Economics, Politics, and Public Policy in East Asia and the Pacific*, May 13, pp. 1-6

Hossain, Mahabub (1974), "Farm Size and Productivity – The Case of Phulpur Farms," *Bangladesh Economic Review*, Vol. II, No. 1 (January)

Hossain, Mahabub (1977a), *Agrarian Structure and Land Productivity – An Analysis of Farm Level Data in Bangladesh Agriculture*, Unpublished Ph. D. Dissertation, University of Cambridge, Cambridge

Hossain, Mahabub (1977b) "Farm Size, Tenancy, and Land Productivity – An Analysis of Farm Level Data in Bangladesh Agriculture," *Bangladesh Development Studies*, Vol. V. No. 3 (July)

Hossain, Mahabub (1978), "Factors Affecting Tenancy – The Case of Bangladesh Agriculture," *Bangladesh Development Studies*, Vol. VI, No. 2 (Summer)

Hossain, Mahabub (1979), "Nature of Tenancy Markets in Bangladesh Agriculture," *Journal of Social Studies*, No. 3 (January)

Hossain, Mahabub (1980), "Desirability and Feasibility of Land Reform in Bangladesh," *Journal of Social Studies*, No. 8 (April).

Hossain, Mahabub (1981), "Land Tenure and Agricultural Development in Bangladesh," Research Monograph No. 85, Institute of Developing Economies, Tokyo

Hughes, R., Shapan Adnan, and B. Dalal-Clayton (1994), *Floodplains or Flood Plans? A Review of Approaches to Water Management in Bangladesh*, IIED, UK: Russel Press

Hye, Hasnat Abdul (editor) (1985), *Decentralization, Local Government Institutions, and Resource Mobilization*, Bangladesh Academy for Rural Development, Comilla, Bangladesh

ISAS (2016), Challenges and Trends in Decentralized Local Governance in Bangladesh, Working Paper No. 222 (January), Institute of South Asian Studies, National University of Singapore

Islam, Nazrul (1980), Book Review, Needless Hunger – Voices from a Bangladesh Village, by Betsy Hartman and James Boyce, *Journal of Social Studies*, No. 12 (December)

ইসলাম, নজরুল (১৯৮৩ক), "ভূমি সংস্কারের আরও একটি উদ্যোগ এবং তার সম্ভাব্য ফলশ্রুতি," *সমাজ নিরীক্ষণ*, সংখ্যা ৯ (অক্টোবর)

ইসলাম, নজরুল (১৯৮৩খ), "ভূমি সংস্কার প্রসংগে সর্বশেষ পরিস্থিতি," *Political Economy*, Vol. 6, No. 1, Dhaka : Bangladesh Economic Association

ইসলাম, নজরুল (১৯৮৪), *বাংলাদেশের উন্নয়ন কৌশল প্রসংগ, সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র*, ঢাকা

Islam, Nazrul (1984), "Karl Marx and His Analysis of Capitalism – Some A-Posteriori Reflectons," *Journal of Social Studies*, No. 25 (July)

ইসলাম, নজরুল (১৯৮৭), *বাংলাদেশের উন্নয়ন সমস্যা : বর্তমান উন্নয়ন ধারার সংকট এবং বিকল্প পথের প্রশ্ন*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা

Islam, Nazrul (1990), "Let the Delta be a Delta! An Essay in Dissent on the Flood Problem of Bangladesh," *Journal of Social Studies*, No. 48, April, 1990, pp. 18-41

Islam, Nazrul (1999), "Flood Control in Bangladesh: Which Way Now?" *Journal of Social Studies*, No. 83, January-March, 1999, pp. 1-31

Islam, Nazrul (2001), "The Open Approach to Flood Control: The Way to the Future in Bangladesh," *Futures*, Vol. 33, 2001, pp. 783-802

Islam, Nazrul (2004), "Towards a New Philosophy regarding Rivers," in M. F. Ahmed, Q. K. Ahmad, and M. Khalequzzaman (eds.), Regional Cooperation on Transboundary Rivers: Impact of the Indian River-Linking Project (volume containing papers presented at the International Conference on Regional Cooperation on Transboundary Rivers), Dhaka: BAPA, BEN, and other organizations, 2004, pp. 525-540

Islam, Nazrul (2006a), "The Commercial Approach vs. the Ecological Approach to Rivers: An Essay in Response to the Indian River Linking Project (IRLP)," *Futures*, Vol. 38, 2006, pp. 586-605

Islam, Nazrul (2006b), "IRLP, or the Ecological Approach to Rivers?" *Economic and Political Weekly*, April 29, 2006, pp. 1693-1702

Islam, Nazrul (2009a), "Climate Change and the Tasks for Bangladesh," in Dipen Bhattacharya, M. Feroze Ahmed, Nazrul Islam, and Mohd. Abdul Matin (eds), Climate Change and the Tasks for Bangladesh, (volume containing papers presented at the BAPA-BEN special conference on climate change) Dhaka: BAPA and BEN, 2009, pp. 13-35

Islam, Nazrul (editor) (2009b), *Resurgent China: Issues for the Future*, Palgrave-Macmillan, New York

ইসলাম, নজরুল (২০১১), *বাংলাদেশের গ্রাম : অতীত ও ভবিষ্যৎ*, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা

ইসলাম, নজরুল (২০১২), *আগামী দিনের বাংলাদেশ*, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা

ইসলাম, নজরুল (২০১৬ক), *পুঁজিবাদের পর কী?* সমাজ গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা

Islam, Nazrul (2016a), *Governance for Development: Political and Administrative Reforms for Bangladesh*, New York: Palgrave-Macmillan,

Islam, Nazrul (2016b), *Economies in Transition: China Russia Vietnam*, Dhaka: Eastern Academic

Islam, Nazrul (2016c), *Let the Delta Be Delta! The Way to Protect Bangladesh Rivers,* Dhaka: Eastern Academic

Islam, Nazrul and Mustafizur Rahman (2014), "Realizing the Potential of Bangladesh Villages: Looking Back at Mosharaff Hossain's 'Assault that Failed', in M. K. Mujeri (editor), *Development: Constraints and Realisations*, pp.99-129, Dhaka: University Press Limited

Islam, Nurul (1977), *Development Planning in Bangladesh*, Dhaka: University Press Ltd.

Islam, Nurul (1978), *Development Strategy of Bangladesh*, Oxford: Pergamon Press

Islam, Sirajul (1979), *The Permanent Settlement in Bengal: A Study of Its Operation*, 1790-1819, Dhaka: Bangla Academy

Islam, Sirajul (1988), *Bengal Land Tenure: The Origin and Growth of Intermediate Interests in the 19th Century*, Calcutta: K. P. Bagchi and Company

Islam, Taufiqul Md. and Koichi Fujita (2012), *Dimension of Decentralization Process and Rural Local Government in India: A Comparison with Bangladesh*, Kyoto Working Papers on Area Studies No. 130, Kyoto University, October

Jabbar, Abdul M. (1975), "Sharecropping and Economic Efficieny – A Comment," *Bangladesh Development Studies*, Vol. III, No. 2 (April)

Jabbar, Abdul M. (1977), "Relative Productive Efficiency of Different Tenure Classes in Selected Areas of Bangladesh," *Bangladesh Development Studies,* Vol. V, No. 1 (January)

Jacka, Tamara and Chengrui Wu (2016), Village Self-Government and Representation in Southwest China, *Journal of Contemporary Asia*, Vol. 46, No. 1, pp. 71-94

জাহাঙ্গীর, বোরহানউদ্দিন খান (১৯৭৮), *গ্রামাঞ্চলে ধনতন্ত্রের বিকাশ*, সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা

Jahangir, Borhanuddin K. (1979), *Differentiation, Polarization, and Confontration in Rural Bangladesh*, Centre for Social Studies, Dhaka Jannuzi, F. T. and J. T. Peach (1977), *Report on the Hierarchy of Interests in Land in Bangladesh*, USAID, Dhaka

Jannuzi, F. T. and J. T. Peach (1978), *Efficacy and Distributive Land Reform in Bangladesh*, USAID, Dhaka (mimeo)

Kamal, Ahmed (2009), *State against Nation: The Decline of Muslim League in Pre-Independence Bangladesh*, 1947-1954, Dhaka: University Press Ltd.

Kelliher, Daniel (1997), "The Chinese Debate Over Self-Government," *The China Journal*, No. 37 (January), pp. 63-86

Khalequzzaman, Mohamed (1994), "Recent Floods in Bangladesh: Possible Causes and Solutions," *Natural Hazards*, Vol. 9, pp. 65-80

Khan, Azizur Rahman (2015), *The Economy of Bangladesh: A Quarter Century of Development*, New York: Palgrave-Macmillan

Khan, Mahmud (1976), "Farm Size, Efficiency, and Socio-economics of Land Redistribution – A Comment," *Bangladesh Development Studies*, Vol. IV, No. 3 (July)

খান, মাহমুদ (১৯৮০), "বাংলাদেশে ভোগ-দখলী স্বত্বের গতি-প্রকৃতি ও সংস্কার," *সমাজ নিরীক্ষণ*, সংখ্যা ৩, ঢাকা

Kosambi, Damodar D. (1956), *An Introduction to the Study of Indian History*, Popular Book Depot, Bombay

Kosambi, Damodar D. (1965), *Culture and Civilization in India in a Historical Outline*, London: Routledge and Kegan Paul

Lenin, Vladimir Ilych (1923), On Cooperation, in Robert Tucker (ed.), *The Lenin Anthology*, New York: W. W. Norton & Company, pp. 707-713

Li, Lianjiang (1997), "Popular Demands for Village Elections in Rural China," *Human Rights Dialogue* 1.9 (Summer) on Innovative Human Rights Strategies in East Asia.

Khadga, K. C. (1998), *Local Self Government in Nepal: Evolving Practices*, POLSAN/FES

Macours, Karen and Johan F. M. Swinnen (2002), "Patterns of Agrarian Transition," *Economic Development and Cultural Change*, pp. 365-394

Mahmud, Wahiduddin (ed.) (1981), *Development Issues in an Agrarian Economy – Bangladesh*, Centre for Administrative Studies, Dhaka

Majumdar, Asok (2011), *The Tebhaga Movement: Politics of Protest in Bengal*, 1946-1950, Aakar Books

Majumdar, Badiul Alam (2005), "Gram Sarkar: A Problematic Initiative," *The Daily Star*, May 10 (Tuesday), 2005

Marx, Karl (1979), *Pre-Capitalist Socio-economic Formations*, Progress Publishers, Moscow

Mollah, Awal Hossain Mollah Md. (2007), "Administrative Decentralization in Bangladesh" Theory and Practice," *International Journal of Organization Theory and Behavior*, Vol. 10, No. 1, pp. 1-34

Mukherji, I. N. (1976), "Agrarian Reforms in Bangladesh," *Asian Survey*, Vol. 16, No. 5 (May), pp. 452-464

Muqtada, M. (1975), "The Seed Fertilizer Technology and Surplus

Labor in Bangladesh Agriculture," *Bangladesh Development Studies*, Vol. III, No. 4 (October)

Nadiruzzaman, Md. (2008), *Rural Local Government and State Politics in Bangladesh*, Durham Theses, Durham University. Available at Durham E-Theses Online: http://etheses.dur.ac.uk/2238/

Nasrin, Farzana (2013), "Reforms in Local Government: Experiences from Bangladesh," *Journal of Asia Pacific Studies*, Vol. 3, No. 1, pp. 37-56

Nath, Dhiraj Kumar (2008), "Gram Sarkar and Local Government Election," *The Daily Star*, April 24, 2008

NCAP (n.d.) Impact of Tenancy Reforms on Production and Income Distribution – A Case Study of Operation Borga in West Bengal http://www.ncap.res.in/upload_files/annual_report/1995-96/chap3.htm

Osmani, Siddiqur R. and M. Abul Quasem (1985), Pricing and Subsidy Policies for Bangladesh Agriculture, *Bangladesh Institute of Development Studies*, Dhaka

Quibria, Golam M. (1976), "A Note on Farm-Size, Efficiency, and Socio-economics of Land Distribution," *Bangladesh Development Studies*, Vol. IV, No. 1 (Janauary)

Rahman, Anisur (1975), "Farm Size Efficiency and the Socio-economics of Land Distribution," *Bangladesh Development Studies*, Vol. III, No. 3 (July)

Rahman, Atiq (1979b), "Usury Capital and Credit Relations in Bangladesh Agriculture," *Bangladesh Development Studies*, Vol. VII, No. 2, Summer

Rahman, Atiq (1980), "Surplus Utilization and Capital Formation in Bangladesh Agriculture," *Bangladesh Development Studies*, Vol VIII, No. 4 (Autumn)

Rahman, Atiur (1982), "Land Concentration and Dispossession in Two Villages of Bangladesh," *Bangladesh Development Studies*, Vol. X, No. 2 (Spring)

রহমান, শেখ মুজিবুর (২০১২), *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা

Roquibuzzaman, M. (1973), "Sharecropping and Economic Efficiency in Bangladesh," *Bangladesh Economic Review*, Vol. 1, No. 2 (April)

সেলিম, মুজাহিদুল ইসলাম (২০১৬), "বঙ্গবন্ধুকে জানতে হলে," *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৩শে মার্চ

Sen, Amartya (2006), *Identity and Violence: The Illusion of Destiny*, New York: W. W. Norton

Sharma, Ram S. (1965), *Indian Feudalism*, Calcutta: K. P. Bagchi

সিদ্দিকী, কামাল (১৯৮১), *বাংলাদেশে ভূমি সংস্কারের রাজনৈতিক অর্থনীতি*, বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান, ঢাকা

Siddiqui, Kamal (editor) (1992), *Local Government in South Asia: A Comparative Study*, Dhaka: University Press Limited

Siddiqui, Kamal (2000), *Local Governance in Bangladesh: Leading Issues and Major Challenges*, Dhaka: University Press Limited

Sobhan, Rehman (1993), *Agrarian Reform and Social Transformation: Preconditions for Development*, London: Zed Books

Spoor, Max (2012), "Agrarian Reform and Transition: What Can We Learn from the East?" *The Journal of Peasant Studies*, Vol. 39, No. 1 (January), pp. 175-194

Spoor, Max and Oane Visser (2010), "The State of Agrarian Reform in the Former Soviet Union," *Europe-Asia Studies*, Vol. 53, No. 6, pp. 885-901

Stepanek, Joseph (1979), *Bangladesh – Equitable Growth*? Washington D.C.: Pergamon Press

Swinnen, Johan F. M. (n.d.), An Explanation of Land Reform Choices in Central and Eastern Europe, Working Paper No. 5, Policy Research Group, Department of Agricultural Economics, K. U. Leuven, Leuven, Belgium

Taslim, M. A. (1993) "Redistributive Land and Tenancy Reform in Bangladesh Agriculture," *Journal of Developing Areas*, Vol. 27, No. 3 (April), pp. 341-376

Tuan, Nguyen Do Anh (n. d.), Vietnam's Agrarian Reform, Rural Livelihood, and Policy Issues, Institute of Policy and Strategy for Agriculture and Rural Development (IPSARD), Hanoi

United Nations (2008), *World Economic and Social Survey 2008: Overcoming Economic Insecurity*, Sales No. E.8.II.C.1

United Nations (2010), *World Economic and Social Survey 2010: Retooling Global Development*, Sales No. E.10.II.C.1

Wegerif, Marc (2004), A Critical Appraisal of South Africa's Market-Based Land Reform Policy: The Case of Land Redistribution for Agricultutral Development (LRAD) Programme in Limpopo, Research Report No. 19, Programme for Land and Agrarian Studies, December 2004

Yunus, M., S. D. Chowdhury, Z. Rahman, A. F. M. Alamgir, and S. M. Ali (1980), "Gram Sarkar: The Village Institution; A Model for Rural Development and Institutional Structure; The Sense and Nonsense of Swanirvar Gram-Sarkar Format for Rural Development," *Farm Economy*, Vol. 2, No.1, pp. 29-34

Northern University * Bangladesh * NUB Library